শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

সাহিত্যম্‌। ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
মঞ্জুষা বসু
বোস প্রিণ্টার্স সিণ্ডিকেট
৩২, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

ভক্ত-ভৈরব মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে—

ভূমিকা

আমাদের এই অবিশ্বাস-সংক্ষুব্ধ শতাব্দীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব বর্তমান বিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও তিনি বাংলাদেশে বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অপূর্ব জীবন ও অপরূপ জীবন-সাধনার সঙ্গে বিশ্বের জীবন-ধারারই সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছে। আজ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদের আশ্বাসে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রতি পদে আমরা অস্তিত্ব অনুভব করি জীবনের এমন সব নিগূঢ় অন্ধকার গহ্বরের, যেখানে বিজ্ঞানের নবরশ্মিও প্রবেশ করতে পারে না। বিজ্ঞান যেখানে মূক আর পঙ্গু, সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে ভারত-সাধনার। এতোদিন সেই ভারত-সাধনার ধারা জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে দূরে অবজ্ঞার প্রস্তরস্তরে ঢাকা পড়েছিলো, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে সেই অমর ধারাকে আবার সজীব করে তুললেন। মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোয় জীবন আর জীবনাতীত আবার দিব্যমূর্তিতে প্রকট হয়ে উঠলো। ঠাকুর মানব-জীবনকে, মানব-কর্মকে, এই ইহকালের ক্ষণ-অস্তিত্বকে, আবার মৃত্যুহীন অমরত্বে সুমণ্ডিত করে দিয়ে গেলেন। পথহারা পথিককে আবার দিয়ে গেলেন পথের সন্ধান।

বিশ্ব-মানবের জীবন-ক্ষেত্রে তিনি যে কি সুমহান্ দান রেখে গেলেন, তা আজও আমরা যথার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। কিন্তু যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাচ্ছি যে, আর্ত-পীড়িত অসহায় মানবতাকে নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই মহা-উৎসের কাছে আসতেই হবে। তাই আজ আমরা দেখছি, বিজ্ঞানের সমস্ত

আশ্বাসকে পিছনে ফেলে রেখে দিক্‌ভ্রান্ত পাশ্চাত্য দেশও এই মহা-মানবের জীবনের দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

তাঁর অপরূপ জীবনের মধ্যে তিনি প্রতি দিনের সংসারের অতি সাধারণ মানুষের জন্যই অমৃত সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন। তাই সর্বত্যাগী আজন্ম ব্রহ্মচারী ঠাকুরের পুণ্যকথা, তাঁর পুণ্যস্মৃতিচারণ সঞ্চয় করে এই "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি" গ্রন্থটি সাজানো হ'লো।

এই গ্রন্থের কোনো রচনাই ইতিপূর্বে আর গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। ঠাকুরের শুভ জন্মশতবর্ষপূর্তির পুণ্যলগ্নে যে সব পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো, সেগুলি থেকেই "শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতির" লেখাগুলি সংকলিত হয়েছে।

ঠাকুরের নাম যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানেই জন্মগ্রহণ করে স্বর্গ। সেই স্বর্গের যদি ক্ষীণতম আভাসও এই গ্রন্থের কোনো পাঠকের চিত্তে জেগে ওঠে, তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করবো, অনুভব করবো স্বর্গীয় তৃপ্তি।

—বিশ্বনাথ দে

সূচীক্রম

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সকল-মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার !
নির্বিকার, হর্ষ-শোক-বাসনা-বর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার !
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্মল—অনিল স্পর্শে যাঁর ;
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা-ভার,
শরণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার ।

শুভাশুভ এ সংসারে সম প্রবাহিত,
মিশ্রিত ধারায়,
সুখে-দুঃখে মানব-জীবন আন্দোলিত,
তুষ্ট রুষ্ট কহে দেবতায় ;
গৃহ দগ্ধ অনল-প্রভায়,
পূতবারি—প্রাণনাশ তায় ;
জীবন জগৎ-প্রাণ, ধ্বংসকারী বেগবান,
রবিতাপে জীবন হারায়,
অন্ন—বিষ, শস্য ক্ষয় কভু বরষায় ।

কভু রোষান্বিত হন জনক-জননী,
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহ—সর্পের বিবর ;

প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র-প্রাণহর ;
স্নেহমায়া পাসরিয়া, দুষ্টা কন্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর,
অবিশ্বাসী—পুত্র-সম-পালিত কিঙ্কর।

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়,
হে দীনশরণ !
মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়
বরিষার বারি বরিষণ ;
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রী-গমন ;
ত্যজি কন্যা পুত্র নারী, পানাসক্ত অত্যাচারী,
লোকত্যজ্য ঘৃণিতজীবন—
তব দ্বার মুক্ত তার পতিতপাবন !

ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান আঁধারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর,
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে—
সন্দেহ উদয় বারে বারে ;
দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্য-জ্ঞান প্রচার সংসারে,
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুরে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।

কর্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু-মাঝে,
নহে নিবারণ,

দিয়ে স্থান ভগবান শ্রীচরণ রাজে
তারো নরে কপালমোচন !
নিরন্তর ত্রিতাপ-দহন ;
দণ্ড করে পশ্চাতে শমন ;
কর্মফল নিজ দেহে, সহিয়া অপার স্নেহে,
কর দূর শমন-শাসন,
বার ত্রাস, হর পাশ, ত্রিতাপহরণ !

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণ জ্ঞান,
প্রেম ভ্রমে কাম-রসে আর নাহি রসে,
দুঃখ সুখ নেহারে সমান ;
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ ;
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয়-বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অনুমান।

কে তোমা পূজিতে পারে, পূজা জানে কে।
অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ-সেবা,
তব ধ্যান পরম উৎসব ;
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব,
দুষ্ট ষড়রিপু পরাভব !
ভুলায় যন্ত্রণা-জ্বালা, তব নাম জপমালা,
অহঙ্কার দমিত দানব,
অর্চনার অধিকার—অতুল বৈভব।

নিরৈশ্বর্য আসিয়াছ মাধুর্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য অধরে ;
পাছে নর নাহি আসে ডরে ;
দীনবেশে ডাক সকাতরে ;
হরিবারে মন প্রাণ, কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।

চিনালে চিনিতে পারে নহে অসম্ভব,
পুরুষ-প্রধান।
মত্তচিত্ত মহা ঘোর বিষয়-আহব—
হৃদয়ে না রহে তব স্থান ;
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান
জ্ঞানাঞ্জনে কর দৃষ্টি দান ;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ,
ইন্দ্রিয়-তাড়না বলবান !
হৃদ্-পদ্ম বিকাশিয়া হও অধিষ্ঠান !!

শ্রীরামকৃষ্ণ

রসরাজ অমৃতলাল বসু

জয় জয় রামকৃষ্ণ অতিশয় শুভাদৃষ্ট
করি দৃষ্টি নর-দেহে হরি-নারায়ণ।
কলির কলুষ-রাজ্য এ কথা না করি গ্রাহ্য
কোন যুগে বার বার আকার ধারণ॥

প্রথমে সাজিয়া বুদ্ধ শাস্ত্র-অর্থ লয়ে যুদ্ধ
বিশুদ্ধ জ্ঞানের দীক্ষা দয়াধর্ম শিক্ষা।
জন্মে রাজপুত্র হয়ে কৈশোরে সন্ন্যাস লয়ে
নির্বাণ করিলে দান লয়ে অন্নভিক্ষা॥

মীমাংসা কে করে এই তুমি কি না পুনঃ সেই
শঙ্কররূপেতে সেই আইল ধরায়।
ঘুচায়ে বুদ্ধির ভ্রান্তি বিগ্রহে দানিল শান্তি
শিব শিব শিব রব উঠে পুনরায়॥

ওদিকে ইহুদীগণ পাপপঙ্কে নিমগন
বর্বর পাশ্চাত্য জাতি হইল স্মরণ।
করুণা করে অকৃষ্ট নাম ধরে যীশুখৃষ্ট
কুমারী মেরীরে মাতা বল নিরঞ্জন॥

ক্রুশে দিয়ে আত্মবলি রক্ত রেখে গেলে চলি
সেই রক্তে হলো মুক্ত ধরা-পাপভার।
মৎস্যজীবী শিষ্যদল লঙ্ঘি সিন্ধু-চলাচল
য়ুরোপে খ্রীষ্টানধর্ম করিল প্রচার॥

হেথা পঞ্চনদ-তীরে স্বধর্ম জাগাতে বীরে
নানক গুরুর রূপে মন্ত্র কর দান।
ধর্মভ্রাতা শিখ জাতি মর্মতেজে ওঠে মাতি
স্বেচ্ছাচার অনাচার হল অন্তর্ধান॥

পরে হের পুনরায় বঙ্গভূমে নদীয়ায়
গৌরাঙ্গ-লীলায় রঙ্গ লয়ে ভক্তদল।
আলো করে শচী-কোল হরি বলে হরিবোল
প্রেমেতে মাতিল জীব ধরা টলমল॥

চণ্ডাল, পাষণ্ড, হীন, বাঙ্গালী ভিখারী হীন
দুঃখীর দুয়ারে প্রভু প্রেম ভিক্ষা করে।
রাজ্য ত্যজি সিংহাসন নষ্টভ্রষ্ট দুষ্টজন
প্রেমদায় প্রভু-পায় লুটায় কাতরে॥

জীবভাবে হৃষীকেশ দেখালেন কৃপাশেষ
কাঙালের বেশে আসি তাপীতে তারিতে।
এত প্রেম পেয়ে নরে যদি ভোলে নটবরে
উপায় হবে না তার সন্তাপ বারিতে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

॥ ১ ॥

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং, ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

* * *

ওঁ হ্রীং-ঋতং ত্বমচলো গুণিজিৎ গুণেড্যো
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণা
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!
কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ!
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

—স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ২ ॥

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব-ধর্ম-স্বরূপিণে,
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥
ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ
ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ
ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ৩ ॥

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপ-ধর, নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন, অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর, চির-উন্মদ-প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগল-চরণ, তারণ-ভব-পার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত-মন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন, করুণাঘন, কর্ম-কঠোর।
প্রাণার্পণ, জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর ॥
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর! দেহ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়-মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতি-কুল-মান ॥
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥
নমো নমো প্রভু! বাক্য-মনাতীত, মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল-হৃদিকন্দর তুমি তমো-ভঞ্জন-হার

ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥
(জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার,
শিব শিব আরতি তোমার।)

—স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ৪ ॥

দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে ॥
ভূতলে অতুল-মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে ॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী, সাধ ধরি হৃদি পরে ॥

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

॥ ৫ ॥

ভব-ভয়-ভঞ্জন, পুরুষ নিরঞ্জন,
রতি-পতি-গঞ্জন-কারী।
যতি-জন-রঞ্জন, মনোমদ-খণ্ডন,
জয় ভব-বন্ধন-হারী ॥
জয় জন-পালক, সুরদল-নায়ক,
জয় জয় বিশ্ব-বিধাতা।
চির-শুভ-সাধক, মতি-মল-পাবক,
জয় চিত-সংশয়-ত্রাতা ॥

সুর-নর-বন্দন বিজয় বিবন্ধন,
চিত-মন-নন্দন-কারী।
রিপু-চয়-মন্থন জয় ভব-তারণ,
স্থল-জল-ভূধর-ধারী॥
শম-দম-মণ্ডন, অভয় নিকেতন,
জয় জয় মঙ্গল-দাতা।
জয় সুখ-সাগর, নটবর নাগর,
জয় শরণাগত-পাতা॥
ভ্রম-তম-ভাস্কর, জয় পরমেশ্বর,
সুখকর-সুন্দর-ভাষী।
অচল সনাতন, জয় ভব-পাবন,
জয় বিজয়ী অবিনাশী॥
ভকত-বিমোহন, বর-তনু-ধারণ,
জয় হরিকীর্তন-ভোলা।
গদ-গদ-ভাষণ, চিত-মন-তোষণ,
ঢল-ঢল-নর্তনলীলা॥
মতি-গতি-বর্ধন, কলি-বল-মর্দন,
বিষয়-বিরাগ-প্রসারী।
জড়-চিত-চেতক, ভল-জল ভেলক,
জয় নর-মানস-চারী॥
জয় পুরুষোত্তম, অনুপম-সংযম,
জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর-সাধন, নর-দুখ-বারণ,
জয় রামকৃষ্ণ নমামি॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ৬ ॥

অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়,
আদি অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়।
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি কিরণ বরষি, উজলে সেথাও চারু বিভায়॥
প্রেমের এ তনু অতনু-গঞ্জন, কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনু-প্রাণ-মন, চরণে অর্পণ করিতে চায় ;
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার, সঁপিনু জীবন তব সেবায়॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৭ ॥

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে করুণা-গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব, শুষ্ক-কণ্ঠ পিপাসায়॥
ব্যর্থ-বাসনা-অনল-দহন, সহিলে কত না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে, শ্রমজ-সলিল-সিক্ত-কায় ;
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে, সকল জ্বালা জুড়াবে তায়॥
জাহ্নবী-তীরে তৃষ্ণা-কাতর, অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ-পূত-গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায় ;
হ'ক অবসান ব্যর্থ-প্রয়াণ, এস ছুটে এস ধরি গো পায়॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৮ ॥

মলয় সমীরে ভেসে আসে, কি মধুর গীতি-লহরী।
চল দেখে আসি উজলিছে দিশি, কোটী-শশী-রূপ মাধুরী॥
তপ-ক্ষীণকায়, ক্ষুদিরাম হায়, সাধনা করি কঠোর,
কোন দেবতায় আনিলা ধরায় নন্দন-বন-বিহারী॥

পাপ তাপ ভরা, এ মলিন ধরা স্বার্থ কলুষময়,
এই মরুভূমে বুঝি এলে নেমে সিঞ্চিতে প্রেম-বারি ॥
কে আছ অলস, হৃদয় নীরস, স্বার্থ-মোহেতে ভুলিয়া,
(আজি) প্রেমের দীক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, লহ আপনা পাসরি ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৯ ॥

আজি কোকিল-কূজনে, মলয় পবনে, শিহরি উঠিছে প্রাণ।
যেন বিস্মৃত কত স্বপনেতে শ্রুত, মনে জাগে শত তান ॥
দেববালা যত হাত ধরাধরি, নাচিছে গাহিছে ধরা আলো করি,
ঘেরিয়া শিশুরে ক্ষুদিরাম-ঘরে নিরখি চাঁদ বয়ান ॥
চাঁদে গড়া তনু প্রেমেরি নয়ন, চন্দ্রমণি কোলে কে শিশু রতন,
বারেকের তরে এস হৃদি পরে, জুড়াই তাপিত প্রাণ ॥
হেরি হাসিরাশি ব্যাকুল হৃদয়, বুক চিরে রাখি মনে সাধ হয়,
(পাছে) মর-জগতের মলা-মাটি লাগি ও হাসি হইবে ম্লান ॥
কোটী জনমের যত অশ্রুপাত, সফল করিতে এসেছ কি নাথ,
ভেদ ভুলাইতে প্রেম বিলাইতে জগতে করিতে ত্রাণ,
(যত) দ্বেষ দ্বন্দ্ব মোহ বন্ধ হোক চির-অবসান ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ১০ ॥

ভারত গগনে কোন্ রবি আজ উদিল বিশ্ব উজলি।
কিরণ কাহার হৃদয় সবার, ভরিয়া পড়িছে উছলি ॥
দিশি দিশি শুনি মঙ্গল গান, ভেদ বিবাদের বুঝি অবসান।
লালসা-অনলে কোন্ সে দেবতা, দিলা প্রেমবারি ঢালি ॥
মোহের তিমির ঢেকেছে ভুবন, পাপ তাপে জীব করিছে রোদন ;
হেরি বুঝি পুনঃ নরনারায়ণ, এসেছেন প্রেমে গলি ॥

খোল তবে আজি হৃদয়-দুয়ার, আসন রচনা কররে তাঁহার ;
'জয় গুরু' বলি করিয়া হুঙ্কার, উঠ আজি শির তুলি ॥

—স্বামী চণ্ডীকানন্দ

॥ ১১ ॥

তুমি অনাদি অনন্ত পুরুষ প্রশান্ত, রামকৃষ্ণ প্রাণকান্ত হে।
সদা ব্যাকুল প্রাণে তব মহিমা-গানে, বেদ-বেদান্ত শ্রান্ত হে ॥
কিংবা তপত কাঞ্চন আভা সুশোভন, ঢল ঢল খেলে অঙ্গে হে।
ঐ তব চরণ প্রভু অজয়-শাসন, যাহে ডরে প্রাণান্ত কৃতান্ত হে ॥
কিবা সুন্দর মৃদু হাসি বিলাসে, হরে মোহধ্বান্ত হে।
বিগত-শোক-সন্তাপ-পাপ, রহে মন শান্ত হে ॥
তুমি যোগেশ-জীবন ভকত-শরণ, ত্রিলোক-পাবন একান্ত হে।
তব কৃপা কেমনে পাইব নাথ, আমি নিতান্ত ভ্রান্ত হে ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ১২ ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল,
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল,
প্রভু মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল ॥
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর,
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্য নিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গততনুমন ॥
সেবাপর যোগিবর, অদ্ভুত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহবন্ধ ॥

যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত,

শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ ॥

বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,

নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল।

কথামৃত-বরিষণ গৌণ জলধর,

গিরীশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকর ॥

রামকৃষ্ণ-দাস জয় সবাকার,

রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান জয় বার বার।

রামকৃষ্ণ নাম জয় শ্রবণ-মঙ্গল,

ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

১৩ ॥

কে তুমি তমোনাশন নাথ, জগত-তারণ,

রাজিত রামকৃষ্ণ নামে, সুধাময়।

যুগে যুগে তব শুভ আগমন, বিদিত আগম পুরাণে,

তুরিত-দলন ভকত-পালন, উদ্ধরণ জন মায়া ঘোরে ॥

নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, স্বরূপ তোমারি সনাতন,

ভকত-প্রাণ-তপ-হরণ, দেহ ধারণ লীলা তরে ॥

জ্যোতি-বিমল বিকাশ-কারণ, চির-মোহ-ঘন-বারণ,

চকিত ভুবন তব দরশনে, প্রণত জগজন করজোড়ে ॥

সর্ব-ধরম-সমান-কারণ, নানা-মত-যোগ-সাধন,

কাম-কাঞ্চন-লেশ-বিহীন, নিরঞ্জন! নমি ভকতি ভরে ॥

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ১৪ ॥

মায়ার মরত ধামে নর রূপ ধরে এলে,
অতুল রাতুল তনু ভ্রূভঙ্গে ভুবন ভুলে ॥
নেহারি জীবে তাপিত কে তুমি ব্যথিত চিত,
ভকত সনে মিলিত তারিত তনয়-কুলে ॥
কাম-কাঞ্চন-মোহিত মানবে হেরি তৃষিত,
শিখালে এ মহীতলে ত্যাগে শুধু শান্তি মিলে ॥
সাধন করিয়া ছলে ভেদ-বাদ ঘুচাইলে,
'যত মত তত পথ' সত্য তত্ত্ব বিকাশিলে ॥
যেই রাম সেই কৃষ্ণ একতনু রামকৃষ্ণ,
অখিল-জগত ইষ্ট ভেদ নহে কোন কালে ॥
অন্তরে আছে হে সাধ লভিয়ে তব শ্রীপদ,
অকূল ভব গোষ্পদ বিচারি তরিব হেলে ॥

—অজ্ঞাত

॥ ১৫ ॥

যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি, করিলে প্রেমের লীলা।
জীব-মঙ্গলে ভূতলে এসে, সহিলে দুঃখ জ্বালা ॥
স্বরূপ লুকায়ে কাঙ্গাল বেশ, ছলিতে মানবে ধরেছ বেশ।
সরল বালক মুখে 'মা' 'মা' বুলি, খেলিলে নূতন খেলা ॥
কে পারে চিনিতে তুমি না চিনালে, জানিবে কেমন তুমি না জানালে।
শরণ নিয়েছি চরণ-কমলে, ঘুচাও ত্রিতাপ জ্বালা ॥
দূর কর প্রভো মায়া আবরণ, স্বরূপ তোমার হোক প্রকটন।
'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ', নব অবতার-লীলা ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ১৬ ॥

কে এসে মোহন বেশে মজালে হে মন,
মন-ভুলান রূপটি তোমার যোগীজন-উচাটন।
তুমি বুঝি বৃন্দাবনে, খেলেছিলে রাখাল সনে,
সেই যমুনা-পুলিনে, ব্রজগোপীর প্রাণধন,
যমুনা বইত উজান বাঁশীর তানে মোহন ;
মাতালে নদে এসে গৌর-বেশে,
(তোমার) দু' নয়নে প্রেমধারা মজে কার রসে,
(আবার) জগাই মাধাই তরিয়ে দু' ভাই
রাখলে নাম পতিতপাবন
(আমার মন মজালে রামকৃষ্ণ হে) ॥
রামকৃষ্ণ রূপ ধরে এসেছ জগতের তরে,
(বুঝি) জীবের দশা মলিন হেরে গলেছে তোমারি মন ;
এসেছ বেশ করেছ করুণা করে,
আমার মত কাঙ্গাল কত আছে হে পড়ে,
(সবে) টেনে নিয়ে কোল দিয়ে জানাও নাম জগত-তারণ ॥

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ১৭ ॥

ভয় কি রে ভাই, ডাক রে সবাই, প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ বলে,
সে যে দুর্বলের বল টলায় অটল, পাষাণ প্রাণে প্রেম উথলে ॥
(রামকৃষ্ণ নামে)
কি কব তার দয়ার কথা, পতিত জনে বড়ই ব্যথা,
যেথায় পতিত সে যায় তথা, প্রাণ জুড়ায় রে করে কোলে ॥
(রামকৃষ্ণ আমার)

বাছে না সে সুজন কুজন, চায় না ভজন চায় না পূজন,
ব্যাকুল হয়ে ডাকে যে জন, কূলে যায় সে অবহেলে ॥
(রামকৃষ্ণ বলে)
আকাশে রামধনুর মেলা, ভঙ্গুর এ জীবনের খেলা,
এই বেলা ডাক থাকতে বেলা, যাবে চলে ভবের খেলা ॥
(রামকৃষ্ণ নামে)
আপনার কে আছে ভবে, মুখ চেয়ে কার আছ তবে,
'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' রবে, ভাসাও হৃদি নয়ন-জলে ॥
(রামকৃষ্ণ বলে)
—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ১৮ ॥

রামকৃষ্ণ নামের বান ডেকেছে ভাই।
কোথা পাপী তাপী আয় রে ছুটে, সুখে নাম-তরঙ্গে ভেসে যাই
(রামকৃষ্ণ বলে)
'রামকৃষ্ণ' মধুর নাম, মুখে বল রে অবিরাম,
ভবের কষ্ট নষ্ট হবে পূরবে মনস্কাম।
ঐ দেখ নাম শুনে এসেছে ধেয়ে, ওরে এমন দয়াল আর তো নাই
(রামকৃষ্ণের মত)
যোগে যোগে কিবা ফল, রামকৃষ্ণ মুখে বল,
অনায়াসে করে পাবি চতুর্বর্গ ফল,
ধ'রে নামের ভেলা পারে যাবি (হেসে), যমের মুখে দিয়ে ছাই
(রামকৃষ্ণ বলে)
ও ভাই, নামের এমনি বল, প্রাণ করে রে শীতল,
হয় কি না হয় ডেকে দেখ সত্য কিবা ছল,
ওরে নামের বলে তরে গেছে, কত মহাপাপী শুনতে পাই ;
(আমাদের মত)

রামকৃষ্ণ গুণ-ধাম, তোমার পতিতপাবন নাম,
মোরা ভজনবিহীন, দীন অভাজন, হ'য়ো নাকো বাম,
দাও নামে রতি, পদে মতি, অন্য ধনরত্ন নাহি নাই।
(নাথ তোমা বিনে)

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ১৯ ॥

হরি আমার প্রেম-মধুর, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন
তব লীলা-ছলে ত্রিভুবন সৃজন পালন নাশন।
পাতকী তরিতে ভূভার হরিতে যুগে যুগে অবতরণ।
নর-শরীর ধারণ ॥
সিংহলে লীলা ভাসাইলে শিলা, অযাচিতে হরি প্রেম দিলে,
ভূচরে খেচরে দিলে বানরে অমর-বাঞ্ছিত চরণ,
নব-দূর্বাদল-শ্যামল-সুন্দর পরম-নন্দন-বন্দন।
যোগিজন-মনোমোহন ॥
অধর-অমৃত করিয়া পূরিত বাজালে মোহন বাঁশরী,
নিখিলের মন করিলে হরণ কমল-নয়নে নেহারি,
ও রূপ হেরিলে যোগী যোগ ভুলে, কুল মান ত্যজে কুল-নারী।
ব্রজ-বিপিন-বিহারী ॥
(বসি) সুরধুনী তীরে পতিতের তরে কে তুমি কাঁদিছ কাতরে,
পাপভারে ভরা ধরণী হেরিয়ে ব্যথা পেলে বুঝি অন্তরে,
এসেছ আবার হরি কি আমায় দেখা দিতে চিরকিঙ্করে,
রামকৃষ্ণরূপ ধ'রে ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ২০ ॥

ভকত-বিলাসি, দীন ভক্তে দেখা দাও হে আসি,
আমি ধন চাই না মুক্তি চাই না হে শুধু পদ-অভিলাষী,
(আমার রাজপদে কাজ নাই)
তুমি যে আমার সর্বমূলাধার, ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম।
(ঠাকুর) তুমি মম প্রিয়, পরম আত্মীয়,
(তাই) গেয়ে বেড়াই তোমার নাম।
প্রভু হে, প্রিয় হে, রামকৃষ্ণ গুণধাম,
বড় আপন জেনে তোমায় ডাকি।
বড় ভালবাসার ধন জেনে হে, আমি তোমায় ভালবাসি।
(আমার চিরসাথী জেনে—ব্যথার ব্যথী জেনে—ইত্যাদি)
এস অনাথ-শরণ, ত্রিতাপ-হরণ, জনম-মরণ নাশী,
এস যুগ-প্রবর্তক, ধর্ম-সংস্থাপক, ভকত-হৃদয়বাসী,
প্রভু হে, প্রিয় হে, দেখা দাও হে আসি ;
এস সর্বত্যাগী-যোগি-বেশে,
এস সন্ন্যাসীর সাজ সঙ্গে নিয়ে হে, আমায় সাজাতে সন্ন্যাসী।
(এস বিবেক বৈরাগ্য নিয়ে—এস ত্যাগের মন্ত্র কর্ণে দিয়ে—
মধুর রামকৃষ্ণ নাম কর্ণে দিয়ে)

—বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ

॥ ২১ ॥

শিশুর মত 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদিয়ে ঘুরে বেড়ায়,
ঠাকুরের কি ভাব হইল হায় !
উলঙ্গ পাগলপারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
দিবানিশি 'মা' নাম ছাড়া অন্য নাহি রসনায়।
পশু পাখী তরু লতা, সবকে শুধায় মায়ের কথা,
"বল রে আমার মা পাই কোথা, কে দেখেছ আমার মায় ॥"

মায়ের মন্দিরে গিয়ে, পড়ে থাকে হত্যা দিয়ে,
বলে 'মাগো না খাইয়ে প্রাণ ত্যজিব রাঙ্গা পায়'।
'দেখা দে মা ওমা আমার', এই বলিয়া ছাড়ে হুঙ্কার,
কত মত ভাবের বিকার, সর্ব অঙ্গে বিকাশ পায়।
গৌর কি রে ন'দে ছেড়ে আইল দক্ষিণেশ্বরে,
রামকৃষ্ণ রূপ ধরে জীবে কি রে প্রেম শিখায়?

—বৃন্দাবনচন্দ্র গোপ

॥ ২২ ॥

বাঞ্ছা পূর্ণ হল, আজি ধরাতে রামকৃষ্ণ এল।
তত্ত্ব লাভের বিড়ম্বনা, দ্বৈতভাবের বিবাদ গেল ॥
রামকৃষ্ণ একাকার, এ নব ভাবে প্রচার,
এক অনন্ত সবার মূলাধার।
যে যা বলে তাতেই মিলে একজনার খেলা সকল ॥
যে কালী সে বনমালী, হরি বলি ঈশাই বলি,
আল্লা বলে মোল্লা ভজায়, কর্তা ভজায় সেই কেবল,
স্বভাবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল ॥

—কালীপদ ঘোষ

॥ ২৩ ॥

নদীয়ার পথে পথে কাঙ্গালের বেশে হরি,
নাম প্রেম বিলাইলে ধরাতলে অবতরি।
সেধে ফিরে ঘরে ঘরে প্রেম নিবি আয় কে রে,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে যারে তারে পায়ে ধরি ॥
হেলায় দিলে না কান হলি নিষ্ঠুর পাষাণ,
বড় ব্যথা পেয়ে প্রাণে অভিমানে গেছে ফিরি।

ধরি পুনঃ করুণায় রামকৃষ্ণ নব কায়,
বহে জীব-পাপরাশি, কঠোর সাধনা করি ॥
নিরক্ষর দীন হীন রোগে দেহ বিমলিন,
উন্মত্ত পাগল যেন সাজিয়া দীন ভিখারী।
সবারে আপন বলি নিতে চাহে কোলে তুলি,
আর ফিরায়ো না তাঁরে রাখ গো হৃদয় চিরি ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ২৪ ॥

তুমি কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি, কাঙ্গালে করুণা করিতে হে,
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে, পতিত জনে তারিতে হে ॥
রামকৃষ্ণ নামে অমিয় ঢালা, হেরিলে ও রূপ জুড়ায় জ্বালা,
(তব) চরণ-তলে পরাণ সঁপিলে, ভাবনা পলায় দূরেতে হে ॥
করি তব কথা অমৃত পান, জাগিয়া উঠিছে অবশ প্রাণ,
হতাশ হৃদয়ে শত আশা জাগে, তোমার মধুর নামেতে হে ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ২৫ ॥

বন্দি কামারপুকুর পুণ্য-লীলাভূমি।
যেথা নরলীলা তরে জনমিলা তুমি ॥
দুঃখিনী-ব্রাহ্মণী নমি লুটায়ে অবনী।
পাইল যে তোমা হেন সুত গুণমণি ॥
রূপ-লাবণ্য-খনি গদাধর চাঁদ।
অনিমিষ নিরখিয়ে না পূরিল সাধ ॥
জগতের নাথ তুমি জগত আশ্রয় হে।
ধরাভার নিবারিতে ভূতলে উদয় হে ॥

রামকৃষ্ণ দাসে কয়, কি দিব হে পরিচয়,
ব্যক্ত তুমি ত্রিভুবন-স্বামী,
কি দিব তব উপমা, পিনাকী না পায় সীমা,
তোমারি তুলনা নাথ তুমি ॥

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ২৬ ॥

তুমি আসিলে তুমি আসিলে হে নাথ, পতিত কাঙ্গালে তারিতে,
শত অপমানে ম্রিয়মাণ জনে, আশার বারতা শুনাতে ॥
বিগত-শান্তি-বেদনাদগ্ধ, হেরি জীবকুল দুরাশা মুগ্ধ,
মধুর চরিতে মোহিলে এ চিতে, যেতে দিলে প্রেম-অমৃতে ॥
প্রেমের সাগর তুমি প্রভু মোর, মানবের দুঃখ হেরিয়া,
কঠোর সাধনে শীর্ণ শরীর, সুরধনী-তীরে বসিয়া ;
জীব-পাপ-ভার বহি প্রাণপণে, কতরূপ জ্বালা সহিলে আপনে,
হায়! প্রভু তবু এখনো গেল না, দ্বেষ ভেদ পাপ জগতে ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ২৭ ॥

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে।
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ি, গেল মা দিন দেখা ত নাহি দিলে ॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নাম ভেদ এক মূলে ॥
'একোয়া' 'ওয়াটার' 'পানি' 'বারি' নাম দেয় জলে,
'আল্লা' 'গড্' 'ঈশা' 'মুশা' 'কালী' নাম ভেদে বলে ॥

দীন, ধনী, মানী, জ্ঞানী বিচার নাই জাতি কুলে,
আপন-হারা পাগল-পারা সরলে নেহারিলে ॥
দু'বাহু তুলিয়ে ডাকে, আয় রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে ;
যতন করি পারের তরী বেঁধেছি ভবের কূলে ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ২৮ ॥

কে তুমি এলে এবার, প্রেমিক উদাসীর ভানে,
তোমার যমুনা সরযূ কোথা, লীলা গঙ্গা-পুলিনে।
গঙ্গাতীরে কাতর স্বরে মা মা বলা বদনে,
এমন ব্যাকুলতা মায়ের তরে, কেউ কখনো দেখিনে ॥
'টাকা মাটি, মাটি টাকা' নূতন সাধন গোপনে,
(তোমার) অপূর্ব সন্ন্যাস-লীলা নরদেহ ধারণে ॥
দীনের বেশে আশে পাশে, খুঁজছ যত দীন জনে,
জীবের তরে ঝরছে নয়ন, বসে আছ আনমনে ॥
তুমি কি চরাতে ধেনু রাখাল-দল সনে,
যমুনা নাচিত কি হে, তোমার বেণু-রব শুনে ?
তুমি কি হে বুদ্ধরূপী, পশুবধ-দমনে,
ছেড়ে সুখের বাসা সকল আশা, নিয়েছ ডোর-কৌপীনে ?
তুমি কি সন্ন্যাসী-গোরা, মাতোয়ারা নাম-গানে,
ডুবালে তরালে নদে, রাধা-প্রেম-বিতরণে ?
যে হও তুমি দয়ার খনি, স্থান দিও ঐ চরণে,
(তব) পদ-ভেলা ভাসিয়ে ভবে, পার হয়ে যাই তুফানে ॥
(জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বলে)

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ২৯ ॥

অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভুবন ভরিয়া উঠিছে।
(তব) অমিয় বারতা দেশ দেশান্তরে, হৃদয়ে হৃদয়ে পশিছে॥
বঙ্গ-হৃদয়-সরসী-সলিলে চারু শতদল ফুটিছে।
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে হেরি রূপে সৌরভে মাতিছে॥
প্রেমের ভূপতি! পতাকা তোমার বিজয়-গরবে ভাতিছে,
ভেদ বিবাদের চির অবসান, হেন আশা মনে জাগিছে॥
ক্ষীণ কণ্ঠ তুলি হীন এ বীণায় 'রামকৃষ্ণ' নাম গাহিছে,
প্রেম রাজ্যে তব দিও তারে স্থান, হেন চিরদাস মাগিছে॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৩০ ॥

ফুলসাজে রসরাজে হেরিয়ে জুড়াল মন,
মরি কি স্থন্দর শোভা, চিত-আঁখি-বিনোদন॥
ফুল্ল-ফুল হার গলে, সুধীর সমীরে দোলে,
কোমল-পদ কমলে, প্রফুল্ল ভকত মন,
বিভোর চিত-ভ্রমর, রূপরসে নিমগন॥
দেখ রে নয়ন ভরি, গোলোক-বিহারী হরি,
রামকৃষ্ণ রূপে আজি করেন কৃপা বিতরণ,
ফুল-সাজে ভক্ত-মাঝে ভকত-হৃদি-রঞ্জন॥
এমন মোহন সাজে, কে সাজালে রসরাজে,
ধন্য সে ধরণী-মাঝে, সফল তার জীবন,
দেখ রে মোহন ছবি জগজন-বিমোহন॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ৩১ ॥

কাঠুরে তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা।
কেঠো বনে কাল কাটালি ছুটল না তোর জঠর-জ্বালা॥

রামকৃষ্ণ দিলেন বলে, মিলে ধন দূর বনে গেলে (ও কাঠুরে)।
ও তুই এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চেলা ॥
আরও যদি যাস এগিয়ে, রজত খনি দেখবি গিয়ে (ও কাঠুরে)।
ওরে তার ওধারে সোনা হীরে মণি মানিক রত্নমেলা ॥
দেহের মাঝে আছে সে বন, যদি না পাস তার অন্বেষণ (ও কাঠুরে)।
ওরে ধর রামকৃষ্ণ চরণ, সেবন যার করে কমলা ॥

—অক্ষয়কুমার সেন

॥ ৩২ ॥

ছেড়ে আজ ধূলা নূতন খেলায় মেতেছে মন,
শিখাও রামকৃষ্ণ নিধি, খেলার বিধি যেমন যেমন ॥
তুমি হে গুণমণি, খেলুড়ের শিরোমণি,
খেলা বৈ নাই কিছু কাজ, করছ সৃজন পালন নিধন ॥
রাখাল সনে বৃন্দাবনে, কল্লে খেলা বনে বনে,
খেলছ নিয়ে জগজ্জনে, ইচ্ছা তোমার হয় যা যখন ॥
খেলতে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাই ত আসি,
শিখাও হে এমন খেলা, ভবের খেলা হয় হে মোচন ॥
কোন খেলায় নাহি ডরি, শুন হে হৃদ্‌বিহারী,
যদি হে কৃপা করি, দাও তোমার ঐ অভয় চরণ ॥
চোর-খেলাতে বুড়ি ছুঁলে, চোর হতে আর হয় না মূলে,
খেল রামকৃষ্ণ বলে, বুড়ি ছোঁয়ার এই ত সাধন ॥
জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়, জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়,
জয় 'রামকৃষ্ণ' জয়, বালক-সখা পতিত-পাবন ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ৩৩ ॥

'রামকৃষ্ণ' নাম-অমিয় পিও রে মন আমার,
(নামে) জুড়াবে তাপিত তনু ঘুচিবে মোহ-আঁধার ।।
(আজি) প্রকৃতির সনে মিশাইয়ে তান,
গাও হে তাঁহার মহিমার গান,
(হৃদে) 'রামকৃষ্ণ' 'রামকৃষ্ণ' জপ রে অনিবার ॥

—অজ্ঞাত

॥ ৩৪ ॥

পাখী তুই ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে ।
(ওরে) বৃথা উড়া নড়া-চড়া কূল পাবিনে অকূলে ॥
(ও) তুই যে দিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার,
(ও তার) নাহি অন্ত দিগ্‌দিগন্ত অপার পাথার ।
(তোর) ধরবে ডানা ঘোর যাতনা পড়বি মহা-মুস্কিলে ॥
(ও সে) অনন্ত অনন্তাভবের অন্ত কে করে,
প্রধান গ্রন্থ বেদ বেদান্ত গেল চুপ মেরে :
পুরাণেরা দিশেহারা সার হল নাম শেষকালে ॥
এদিকে অবিদ্যা মায়া পিশাচী করাল,
পাতিয়াছে মন-মোহিনী রূপ-রসাদির জাল,
পাখী তুই পড়বি ফাঁদে, মরবি কেঁদে প্রাণ হারাবি বেহালে ॥
(ঐ মাস্তুল ছেড়ে চলে এলে)

—অক্ষয়কুমার সেন

৩৫ ॥

রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজ রে মম-মধুপ মোর ।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী, থেকো না থেকো না তাহে বিভোর ॥

জনম-মরণ-বিষম-ব্যাধি, নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম-পীযুষ পিয় রে শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবে না তোর ॥
ধর্মাধর্ম সুখ-দুঃখ-শান্তি-জ্বালা, দ্বন্দ্ব-খেলা মাঝে নাহি নিস্তার;
জ্ঞান কৃপাণে পরম যতনে, কাট রে কাট রে করম-ডোর।
'রামকৃষ্ণ' নাম বলবে বদনে, মোহেরি যামিনী হইবে ভোর,
দুঃস্বপন-জ্বালা রবে না রবে না, ছুটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ৩৬ ॥

আরে রে ভাই মিলে সবাই, 'রামকৃষ্ণ' বলে ডাকি।
দেখি কেমন করে থাকে দূরে, পরাণ ভরে ডেকে দেখি ॥
মুখে তাঁর নামটি নিলে, প্রাণটি যায় অমনি গলে,
নামের গুণে দেখা মিলে সে কথাটি জান না কি ॥
নামের তুলনা নাই রে, প্রেমে জগত মাতিল রে,
সাধ হল যুগল চরণ ধরে, সযতনে হৃদে রাখি ॥
'রামকৃষ্ণ' নামটি নে রে, নাম বিনে আর গতি নাই রে,
নামেতে যাব তরে, আমরা কি ভাই রইব বাকি ॥
'রামকৃষ্ণ' রূপটি ধরে, এসেছেন জগতের তরে,
এমন দয়াল অবতারে, পাপীতাপীর ভয়-ভাবনা কি ॥

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ৩৭ ॥

কেমনে তোমা বিনে, বাঁচি প্রাণে জগত-জীবন,
বল কি আছে আমার, বিনে দুটি অভয় চরণ ॥
তুমি হে অনন্ত অপার, ভক্তের তরে তুমি সাকার,
আরো কত আছে আকার, লীলা তোমার বুঝে ক'জন ॥

তুমি হে প্রেমিকের সখা, নামটি তোমার অমিয় মাখা,
প্রেমহীনে দাও হে দেখা, (নৈলে) কেমন তুমি অনাথ-শরণ ।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ৩৮ ॥

নমো 'রামকৃষ্ণ'-রূপ-ধারণ, মোহন মনোহারী,
জগত-তারণ-কারণ নাম, শমন-শাসন-কারী,
বল 'রামকৃষ্ণ' নাম, প্রাণে পাবি রে আরাম ।।
সত্য সনাতন, প্রেম-রূপ-ঘন, ভকত-চিত-শোভন,
তাপিত তরে নররূপ ধ'রে, যুগে যুগে অবতরণ ;
স্বগণ সনে মিলন, লীলা সাধন কারণ,
মহাভাব প্রকটন-কারী ; দীন শ্রীচরণ ভিখারী,
দেখা দাও, প্রাণ জুড়াও, আমায় কোলে তুলে লও ।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ৩৯ ॥

(মধুর) 'রামকৃষ্ণ' নাম বল মন আমার,
দূরে যাবে তোর মোহ-আঁধার ।।
কাতরে ডাকলে তাঁরে, সে কি দূরে রইতে পারে,
অমনি এসে ভালবেসে মুছাবে রে তোর অশ্রুধার ।।
যদি না লাগে ভাল, নামটি আবার বল,
পরাণ খুলে নামটি নিলে, বইবে প্রাণে শান্তি-ধার ;
অবহেলে পরশ-রতন, নিয়ে রইলি কাম-কাঞ্চন,
'রামকৃষ্ণ' নামে হও না মগন, নূতন খেলায় মজ এবার ।।

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

॥ ৪০ ॥

দিবা বিভাবরী ডাক প্রাণ ভরি, 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে।
পাপ তাপ যাবে, প্রাণ জুড়াইবে, নামেরি মহিমা বলে ॥
তরু-পত্র-প্রান্তে লম্বিত নীহার, জান কি পতনে কি বিলম্ব তার,
পদ্মপত্রে জল, জীবন চঞ্চল, কেমনে রয়েছ ভুলে ॥
উঠ উঠ ভাই থেকো না অলসে, দেখ নামরসে ধরা যায় ভেসে,
গায় দেশ-বিদেশে 'রামকৃষ্ণ' নাম, প্রেমের লহরী তুলে ॥
সে নামে থাকে না ভবেরি বন্ধন, ঘুচে যায় মায়া-কাম-কাঞ্চন,
হয় মৃত্যুঞ্জয়, সদানন্দে রয়, প্রেমানন্দে পড়ে ঢলে ॥
আহা মরি হেন 'রামকৃষ্ণ' নাম, নাহি তাতে রুচি বিধি মোর বাম,
তুমি গুণধাম হ'য়ো নাকো বাম, স্থান দাও পদতলে ॥

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ৪১ ॥

শ্রীরাম তুঁহি, কৃষ্ণ তুঁহি, পরব্রহ্ম নারায়ণ, তুঁহি আদি শকতি।
তুঁহি সৃজন-পালন-সংহরণ কর, শান্তি বিধায়ণ তুঁহি ব্রহ্মজ্যোতিঃ ॥
জগন্নাথ প্রকট হো, য়হ পুণ্য ভূমিমে,
শিখাবত সব-ধরম-সমজ্ঞান প্রতীতি।
ধন্য রামকৃষ্ণ তুম দয়াল ভগবান,
দেহুঁ প্রভু জ্ঞানধন আউর শুধ ভকতি ॥

—স্বামী অপূর্বানন্দ

॥ ৪২ ॥

জয় 'রামকৃষ্ণ,' 'রামকৃষ্ণ', বল রে আমার মন।
যুগ-অবতার যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

জীব-দুঃখেতে কাতর ধরি নর-কলেবর,
বারম্বার অবতার জগত-ঈশ্বর ;
(এবার) মাধুর্য-ঘন-মুরতি জিত-কামিনী-কাঞ্চন ;
(ঐশ্বর্য বিহীন লীলা) ॥
পূর্ব পূর্ব অবতার, এলো কলাংশে যাঁহার
স্বয়ং সে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে এবার,
ওরে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ, পাবি রে নব জীবন ;
(কত আর ঘুমাবে জীব, কাম-কাঞ্চন-আবেশে) ॥
রামকৃষ্ণের কৃপায়, বিবেকানন্দ বিলায়,
ভক্তি মুক্তি বিনামূল্যে কে নিবি রে আয় !
'রামকৃষ্ণ' বলে, নেও রে তুলে, যার যত হয় প্রয়োজন
(ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ)

—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

॥ ৪৩ ॥

তুমি ব্রহ্ম, 'রামকৃষ্ণ', তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম,
তুমি বিষ্ণু, তুমি জিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু প্রাণারাম
তুমি আধেয় আধার, তুমি ব্রহ্ম নিরাকার,
তুমি নর-রূপ ধর, বিজিত-কনক-কাম ॥
অপার-করুণা-সিন্ধু, তুমি দেব দীনবন্ধু
যাচে ইন্দু কৃপাবিন্দু, চরণে করি প্রণাম ॥

—ইন্দুভূষণ

॥ ৪৪ ॥

পরম গুরু সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ॥

জাগালে ভারত শ্মশানতীরে, অশিব-নাশিনী মহাকালীরে ;
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাসালে নিজ ভারত আবার ॥
সত্যযুগের পুণ্যস্মৃতি, আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ভারত দেশে দেশে, ঋষি-পুণ্য-তীর্থ-বারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়, পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নাম মাখা প্রেম নিকেতনে, ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার ॥

—নজরুল ইসলাম

॥ ৪৫ ॥

'রামকৃষ্ণ' শ্যাম শ্যামা শিবে, ভেদ ভেব না আমার মন।
নামরূপের গোলাপে ঢাকা, আছেন সেই এক নিরঞ্জন ॥
চিনির ছাঁচে উট হাতী ঘোড়া, পুতুল পাখী রথ হয় যেমন,
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে সব গঠন ॥
ভেদ ভাবনা মন ছাড় না, সুখ পাবে না তায় কখন,
বহুতে এক দেখলে তবে, পাবি রে সেই মোক্ষধন ॥
অস্থি মাংস মেদ শোণিতে সকল শরীর হয় সৃজন,
এক আত্মারাম বিহরেন তায়, কে হিন্দু ভাই কে যবন ॥
সাধ যদি তোর থাকে রে মন, পেতে সত্য সনাতন,
(তবে) ভাসিয়ে দে না দ্বেষাদ্বেষী, পর না চোখে প্রেমাঞ্জন ॥

— দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ৪৬ ॥

বড় আশা করে এসেছি ঠাকুর করুণা-নয়নে চাও হে।
দিয়ে রাঙ্গা-চরণ রাজীবলোচন কামনা মোদের পূরাও হে ॥
হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়া, প্রকাশ আসিয়া তায়—
ভকতি-হিল্লোলে প্রেম-পরিমলে, পুলকে পূরিবে কায় ;

মাতিয়া যাইবে মন-মধুকর,
পিবে বসি শুধু শ্রীচরণের মধু বিভোর হইয়া তায়—
তৃষিত এ চিত হবে তিরপিত; একবার দেখা দাও হে ॥
দয়ার আধার প্রেম-সুধাকর রামকৃষ্ণ গুণমণি,
আসি বারে বারে নানারূপ ধরে, তারিলে তাপিত প্রাণী ॥
মোদের তারিতে হবে (ঠাকুর)
আর বল কেবা আছে, যাব কার কাছে লইবে মোদের ভার।
মোরা অতি দীন ভজন-বিহীন, নিজ গুণে কৃপা কর হে ॥

—অজ্ঞাত

॥ ৪৭ ॥

নীলকমল নয়নযুগল কি যেন কি বিষাদে বিমলিন,
কোমল হৃদয়েতে কেন গো ব্যথা পেতে ধরাতে সাজিল দীনহীন ॥
পঞ্চবটী মূলে বিল্বতরু তলে, সাধিলে সাধনা সুকঠিন,
দ্বাদশ বৎসর নাহি অবসর, করিলে সুন্দর তনু ক্ষীণ ॥
কোন্ সে প্রেমলোকে ছিলে গো চিরসুখে,
ভেদ-বিবাদ বেদনা-বিহীন ;
মলিন ভূতলে প্রেমে নেমে এলে, দীনহীনজনে কোলে তুলে নিলে,
মানব-মঙ্গলে তনু তেয়াগিলে, সহিলে যাতনা নিশিদিন ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৪৮ ॥

আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি-গান।
ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি হে আমার প্রাণ ॥
কেহ বলে তুমি সাধক-প্রধান, কেহ দেয় তোমা দেবতার মান,
(আমি) গৌরব সব ত্যজিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান,

যবে মনে পড়ে করুণার ছবি, পরদুখে ম্রিয়মান,
পর পাপ বহি রোগ যাতনায় ছটফটি যায় প্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ, হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ,
শুধু মনে হয় রাতুল চরণে করিতে জীবন দান ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৪৯ ॥

তুমি এলে ফাল্গুনে।
ফুল্ল কানন মলয়ানিল কম্পনে।
কোকিল-কুল-কূজিত মুখরিত অলি-গুঞ্জনে ॥
হেরি ধরণী রঞ্জিতা, উৎসব উল্লসিতা,
চন্দ্রা-উদর-সিন্ধু-মথন উদিত চন্দ্রকিরণে ॥
(তব) কুসুমকোমল অঙ্গ, (তাহে) উথলে রূপ তরঙ্গ,
মন্মথ শত নিমেষে নিহত বঙ্কিমায়ত নয়নে ॥
সাতেকপুরীভূষণ, কৃষ্ণ নন্দনন্দন,
বিধি হরিহর সদাই বিভোর চরণপদ্ম ধেয়ানে ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৫০ ॥

আজি এ জীর্ণ বীণায় আমার, গাব নব সমাচার।
মুছ আঁখিজল চাহ মুখ তুলি, ক্ষুদ্র ভাবিয়া আছ যেবা ভুলি,
দীনের তরে দীনের সুহৃদ্ ধরাতে এল আবার ;
মানবের দুঃখে নয়ন তাঁহার ঝরিতেছে অনিবার ॥
হে ভীরু ভয় ভাবনা যত কর কর পরিহার ;
শুন কান পাতি অমৃত-গীতি, ভুলে যাও আজি মরণ-ভীতি,
ঐ ডাকে হায় লইতে হেলায় জনম মরণ পার ॥

—স্বামী প্রেমেশানন্দ

॥ ৫১ ॥

উথ্‌লেছে প্রেম-পারাবার।

(তোরা) আয় না ছুটে ভবের মুটে, ভাসিয়ে দে না মাথার ভার ॥
যার লেগেছে বোঝা, তার হ'য়েছে সোজা,
বোঝাবুঝির বুঁচ্‌কি ফেলে মারছে সে মজা,
(তুই) রইলি ব'সে বোঝার আশে, করবি শেষে হাহাকার ॥
প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দে না গা,—
যাবি ভেসে এমন দেশে যার পাশে নাই গাঁ,—
(ওরে) চন্দ্র সূর্য ধ্বংস হলেও, হয় না সেথা অন্ধকার (বোকা) ॥
সেথায় সবই উল্টা ঢং, সেথায় সবই উল্টা ঢং,
হেথায় কাল সেথায় সাদা বুঝ্‌বি কি ভাই রং,
(ও তোর) কার্যকারণ, সব অকারণ, নাই তথায় তার অধিকার ॥
গুরুদাস কেঁদে বলে তাই, আর বিচারে কাজ নাই,
বোঝাবুঝি অনেক হ'ল (এখন) সোজায় চল ভাই,
'রামকৃষ্ণ' আমার প্রেমের পাথার, ডুবলে হবি ভবপার (বোকা) ॥

—গুরুদাস

॥ ৫২ ॥

জাহ্নবী কূলে পঞ্চবটী মূলে, হেরি মন গলে রাজে ঐ কে রে,
শান্তি-নিকেতন চিদানন্দঘন, অনুপম-সুধা-স্নিগ্ধ জ্যোতি ক্ষরে।
শিরসি শ্বেত সহস্রার দলে, হংস সনে হংসী যথা সুখে মিলে,
জীব অহং ভুলে সমাধি হিল্লোলে, আপনা হারায় প্রশান্ত সাগরে ॥
চিত্ত সহ ক্রমে যত-বৃত্তিচয়, প্রকৃতি সহিত ত্রিগুণ বিলয়,
শুদ্ধবুদ্ধিগম্য সুধীগণে কয়, অচিন্ত্য এ মন মন নিতে নারে ;
নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা প্রায়, ধর্মাধর্মদ্বন্দ্ব স্তব্ধ সমুদয়,
এক অনন্ত অখণ্ড অদ্বয় নির্বিকল্পময়, কেবা কায় হেরে ॥

—স্বামী তপানন্দ

॥ ৫৩ ॥

আবার যদি এলে হরি আবার দিলে দরশন।
আবার জীবে দিলে অভয় ওহে শ্রীমধুসূদন ॥
জ্বালাও তবে প্রাণের আগুন, জ্বলুক শিখা দ্বিগুণ দ্বিগুণ ;
বজ্র-বীণায় ঝঙ্কৃত কর স্পন্দিত হোক ত্রিভুবন ॥
পাঞ্চজন্য বাজাও আবার দ্বাপরের সেই রুদ্র-তান,
যে গান শুনে সব্যসাচীর ক্লৈব্য ছাড়ি আত্মদান।
অভী'র মন্ত্রে উঠুক ভারত, মুগ্ধ নেত্রে দেখুক জগৎ,
কর্ম যাদের ধর্মেরি তরে, সেই জাতির আর নাই মরণ ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

॥ ৫৪ ॥

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয় ভব-ভয়-হারী হে।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম, জয় নর-রূপ-ধারী হে ॥
কাম-কাঞ্চন-আঁধারে, ধরণী ডুবিল হেরে ;
(তুমি) উদিলে সূর্য অমিত বীর্য, যুগে যুগে অবতরি হে ॥
(এবার) মহা সমন্বয়ের তরে, রাম-কৃষ্ণ একাধারে ;
ডাকছে কেন সকাতরে জগতের নরনারী হে ॥
(আমি) শুনেছি অভয় বাণী, তুমি জগৎ চিন্তামণি ;
(তাই) তোমারি দ্বারে অতি কাতরে, এসেছি দীন ভিখারী হে ॥

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

॥ ৫৫ ॥

কে উদিল ঐ ভারত-গগনে, নেহার নেহার মন রে আমার।
উজল স্নিগ্ধ কিরণে কাহার, দূরে গেল আজি ধরার আঁধার ॥
তরুণ অরুণ অপরূপ ভাতি, রূপ অনুপম জিনি নিশাপতি ;
ভকত-বিহগ গায় প্রেম-গীতি, ধায় দিশি দিশি আনন্দে অপার ॥

বিভেদ-বিবাদ-তপত-পবন ; ভব-মরু-মাঝে বহে অনুক্ষণ ;
সুখ-মরীচিকা-মুগধ-নয়ন, জীবগণ তাহে করে হাহাকার।
মরু-কান্তারে নন্দনবন, সৃজন কারণ তব আগমন,
মিলন-মলয় ধীরি ধীরি বয়, মনে লয় দুখ ঘুচিল ধরার ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

॥ ৫৬ ॥

মগন-হৃদয়-ভকত জাগে দয়াল নামগানে।
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম-সুধা পানে ॥
রজত-আসন ধরণী-শাসন না চাহি মণিকাঞ্চনে।
তুলসী-মাল মৃগ-ছাল, রামকৃষ্ণ বদনে ॥
ভুবন-মোহন রমণী-রতন না চাহি আলিঙ্গনে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ, স্থান অভয় চরণে ॥
নাহিক সাধ মধুর স্বাদ রসনা পরিতোষণে।
চাহে মন রামকৃষ্ণ-চরণামৃত সেবনে।
(রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ধ্যানে) ॥

—কালীপদ ঘোষ

॥ ৫৭ ॥

জয় জয় পরব্রহ্ম, জয় সনাতন।
(জয়) চিন্ময়, আনন্দরূপ, জয় নিরঞ্জন ॥
বিচিত্র লীলা-বিলাস, সৃজন পালন নাশ ;
(জয়) বিশ্ব-বীজ বিশ্বেশ্বর জয় পর-শরণ ॥
আনন্দ লহর ছুটে, (কত) দেব দেবী রূপ ফুটে ;
সর্ব-দেব-দেবী রূপে সাধনার ধন ॥
ত্বং হি শিব বিশ্বগুরু, ত্বং হি কালী কল্পতরু ;
ত্বং হি বিষ্ণু ভক্তাধীন, নরদেহ-ধারণ ॥

—বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

॥ ৫৮ ॥

জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল মন।
চাহে তোমারে সকল কাজে সকল যুগে তৃষিত ভুবন।
যুগ যুগ ধরি অপেক্ষারত ছিল ধরণী নীরবে চাহি,
তোমারি অমৃত পরশ লাগি ব্যাকুলা অবনী করে রোদন॥
তিমির সাগরে ডুবিল মেদিনী মৃত্যু ঘেরিল জীবনে হায়।
হাহারবে কাঁদে যত জীবগণ, ঊর্ধ্বে কাতর ডাকে তোমায়॥
তখনি তোমার জ্যোতির আলোকে নাশিলে ধরায় তিমির জ্বালা,
মৃত্যুরে মার অমৃত আনিয়া, জীবন দেখায়ে জাগালে জীবন॥

—নিশিকান্ত চক্রবর্তী

॥ ৫৯ ॥

কে তুমি আবার করুণাপাথার সেই সুরধুনী-তীরে,
কেন সদা আহা আকুলপরাণে ভাসিছ নয়ন-নীরে॥
সদানন্দময়ী আছে কোলে করে, তবু কেন বল দু'নয়ন ঝরে;
তাপিত ধরায় তারিতে কি হয়, সুধাইছ জননীরে॥
কেন আসিয়া হৃদয়-দুয়ারে, মোরে ডাকিতেছ বারে বারে;
আমি এমনি মগন মোহের কুহকে, দেখেও দেখি না তোমারে॥
এস দেব এস পতিতপাবন, এস আজি এস হৃদয়ের ধন;
সফল কর হে বিফল জীবন, দুখ নাশ চিরতরে॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

॥ ৬০ ॥

নমো নমো দেব, নমো নর দেব, নমো ভব-ভয়-হারী।
ভুবন পাবন নমো নারায়ণ, রামকৃষ্ণ-রূপ-ধারী॥
মদ-গর্বিত দুষ্ট-দলনে, সাধু-সজ্জন-পালনে,
ধরম স্থাপনে আসিলে ভুবনে; যুগে যুগে অবতরি॥

দখিন সহরে কত-না সাধনা, জীবে তরাইতে কত-না ভাবনা,
দীন দুখী তরে দুনয়ন ঝরে, জগজন-দুখ-হারী।
সকল জীবেতে এক নারায়ণ, মন্দিরে যাঁরে করে আরাধন,
শিখালে মানবে এ নব সাধন, বিতরিলে প্রেমবারি ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

॥ ৬১ ।

এসেছে আজ প্রাণের ঠাকুর, দেখবি যদি চলে আয়।
পাষাণ গলে তাঁর নামেতে, প্রেমে ভুবন ভেসে যায় ॥
মরি কি রূপ মাধুরী, মেটে না সাধ যতই হেরি।
মনে লয় তায় হৃদে ধরি, পরাণ সঁপি রাঙা পায় ॥
সদাই যেন আপনহারা, মা-নামেতে মাতোয়ারা।
হাসে কাঁদে পাগল পারা, ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় ॥
মোদের তরে মায়ের কাছে, কাতরে করুণা যাচে,
এমন আপন আর কে আছে, আপামরে প্রেম বিলায় ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

॥ ৬২ ॥

রামকৃষ্ণ নাম গাও মন অবিরাম।
জুড়াবে তাপিত প্রাণ, দুঃখ হবে অবসান,
হিয়ায় হেরিবে সদা সুখে প্রাণারাম ॥
আহা, কি মোহন রূপ যাই বলিহারি,
নয়ন ফিরে না হায়, বারেক নেহারি।
চিত-মনোহারী জগজন-তারি,
করুণা বিতরি হরি এলো ধরাধাম ॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

॥ ৬৩ ॥

পরমপুরুষ হরি, মধুহর মধুকৈটভারি।
হের অবতারে কামারপুকুরে নবভাবে তনু ধরি ॥
পিতৃত্বে বরিয়া দ্বিজ ক্ষুদিরামে, চন্দ্রমণি-গর্ভে গদাধর নামে।
শুক্লা দ্বিতীয়া উষার ফাল্গুনে, ধরা মধুভরা করি ॥
হ'য়ে কর্ণধার, ল'য়ে ধর্মতরী, ভব-সিন্ধুতটে ঘাটে ঘাটে ফিরি,
অহেতু কৃপায় ডাকে কাণ্ডারী, এস সবে নরনারী।
অকাতরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, বিলান প্রেমসুধা কলসে কলসে,
রামকৃষ্ণ বলি পিও মহোল্লাসে, পদযুগ হৃদে ধরি ॥

—স্বামী তপানন্দ

॥ ৬৪ ॥

স্বস্বরূপে লীন আঁখি দৃষ্টিহীন, হের সুখাসীন কে রে নরাকার
প্রশান্ত গম্ভীর, স্থাণু প্রায় স্থির, তেজোময় তনু ত্যাগের আগার ॥
পরিহিত পট কটিতে শিথিল, উপবীতমত বামাংসে অঞ্চল,
যুক্ত জানু-লম্বি সুভুজ যুগল, বিশাল হৃদয়ে আনন্দ পাথার ॥
বিশুদ্ধ সরল শিশুর সমান, অহং-লেশ-শূন্য সর্বশক্তিমান,
যোগীন্দ্র সর্বজ্ঞ প্রেমিক প্রধান, করুণাসিন্ধু পর তবতার ॥

—স্বামী তপানন্দ

॥ ৬৫ ॥

জ্ঞান-গঙ্গাকূলে বিশ্বাশ্বত্থ-মূলে বসি তুমি কে হে মনোবিমোহন ।
চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, চোখে চোখে আছ তবু অদর্শন ॥
মনে হয় যেন জীবনের জীবন, অন্তরে বাহিরে আছ সর্বক্ষণ,
তুমি হে আমার চির আপনার, জানি নাহি জানি কর আকর্ষণ ;
কি যেন দুর্ভেদ্য আবরণে ঢাকা, আমি নাই, শুধু তুমি মাত্র একা,
পরোক্ষে সুস্পষ্ট কবে দিবে দেখা, অপরোক্ষে পদে হবে সম্মিলন ॥

—অজ্ঞাত

॥ ৬৬ ॥

জয় নিখিল-জন-মনোহারী ; নরোত্তমরূপ-ধারী রে।
রতি-পতি-গঞ্জন, রূপ অতুলন, দীনেশ দীন বেশ-ধারী রে॥
সদা নিজ ভাবে ভোলা, শ্রীমুখে মা মা বলা, ভকত মনপ্রাণহারী।
জয় ভবেশ্বর, নবযুগ ঈশ্বর, সর্ব-ধর্ম-সমকারী রে॥
জয় নর-দুখ-বারণ, ত্যাগী-কাম-কাঞ্চন, কলিমল-মর্দনকারী।
জয় ভক্তেশ্বর ভকত-বিমোহন, ভকত মনোতম-হারী রে॥

—রাধাকান্ত মল্লিক

॥ ৬৭ ॥

আজি কি আনন্দ অপার (হলো), রামকৃষ্ণ এল এবার॥
'কিবা রূপ বলিহারি, নয়ন ফিরাতে নারি।
(এল) নিত্যরূপ পরিহরি, ঘুচাইতে ধরারি ভার॥
মায়ার তিমির বিনাশি' মহা ঘোর, বিকাশি করুণার রাশি,
যুগে যুগে অবতর, বহু নামরূপ ধর, তোষিতে ভকত পিপাসী।
নানা ভাবে মহালীলা, ভূতলে আনন্দ মেলা,
ধুলো-খেলা ছেড়ে এই বেলা, (তাঁর) অভয় চরণ কর রে সার॥

—নীরদরঞ্জন মজুমদার

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চেতনায় জগজ্জননীর যে বিশ্বব্যাপিনী মাতৃরূপ প্রকাশ লাভ করে, তাহাতে খণ্ডতা, অপূর্ণতা বা বৈষম্যের কোন স্থান ছিল না। তাই বিভিন্ন সর্ব ধর্মের মধ্যেকার সমন্বয়ের মূল সূত্রটি তিনি অনায়াসেই ধরিতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আজ মনে পড়িতেছে।

ভবানীপুরের এক খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের সহিত সে সময় আমার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। আমার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথা শুনিয়া তিনি এই শক্তিমান সাধক পুরুষকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আমি একদিন বন্ধুটিকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হই। রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইবার কালে বলিলাম—ইনি একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক, লোকমুখে ও আমার কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছেন।

আমার কথার উত্তর দিবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—মহাত্মা যীশুর চরণে আমার শত শত প্রণাম।

যীশু সম্পর্কে একটি অপর ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আগন্তুক খ্রীষ্টান যাজকটিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—মশাই, আপনি যীশুর চরণোদ্দেশে যে নত হয়ে প্রণাম করলেন, তার তাৎপর্য কি?

রামকৃষ্ণ মধুর কণ্ঠে বলিলেন—সেকি গো! তাঁকে প্রণাম করব না! তিনি যে ভগবানের অবতার! মানুষকে ত্রাণ করবার জন্য নরদেহে মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন!

বন্ধু ততোধিক বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—অবতার? ঈশ্বরের অবতরণ? আমি কিন্তু এর কোন অর্থই বুঝলাম না। আপনি কি

দয়া করে আমায় আর একটু পরিষ্কার করে এ কথাগুলো বুঝিয়ে দেবেন ?

—এ দেশে যিনি রাম, কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যীশুও তাঁর সেইরূপ আর এক প্রকাশ। তুমি ভাগবত পড়নি ? তাতে লেখা আছে, অনন্ত শক্তিমান ভগবান জীবের কল্যাণার্থে নরদেহে বহুবার অবতরণ করবেন।

—আমি কিন্তু এখনও এর তাৎপর্য বুঝতে পারছিনে। আপনি যদি দয়া করে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তা হলে বাধিত হবো।

—একটা সাধারণ কথা দিয়েই বলি। আচ্ছা, সমুদ্রের কথাই ধর। যখন এর দিকে তাকাও, এর অনন্ত জলরাশি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না। কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন জলভাগের কিছুটা জমে যায়, তখন এই অসীমতার মধ্যে তোমার দৃষ্টি সীমিত হয়, অবলম্বনের একটা ক্ষেত্র খুঁজে পাও, তুমি একে ইচ্ছে বা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতেও পার। অবতার সম্পর্কেও সেই একই কথা। ঈশ্বর অনন্ত, অরূপ, বিশ্বব্যাপী। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে এই অসীম শক্তি সীমার মাঝে রূপ নিয়ে আসেন। এই শক্তি যাঁদের, তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ, মহাত্মা বা অবতার। অবতার ঈশ্বরের বিশেষ ভাবের প্রকাশকেই বুঝায়। মহাপুরুষদের লোকোত্তর-জীবনের মধ্য দিয়েই লীলাময়ের স্বর্গীয় প্রকাশটি ঘটে। এ হচ্ছে অবতারের ব্যাখ্যা।

—এবারে আমি আপনার কথা বুঝলাম, কিন্তু এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছিনে।

এই কথা কয়টি বলিয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে বন্ধু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—অবতারবাদ সম্পর্কে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অভিমত কি বলুন তো।

রামকৃষ্ণ এবার হাসিয়া বলিলেন—ওদের (ব্রাহ্মদের) কথা আর ব'লো না। এ সত্য বোঝবার মত দৃষ্টি ওদের নেই।

আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—আপনাকে কে বলেছে যে, মহাপুরুষদের লোকোত্তর-সত্তা সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান নই ?

রামকৃষ্ণ ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—সত্যই কি তোমরা ঈশ্বরের অবতরণ বিশ্বাস কর? আমার তো সে ধারণা ছিল না!

এ প্রসঙ্গ এইখানেই সমাপ্ত হইল। ইহার পর রামকৃষ্ণ তাঁহার সেই শিশুসুলভ ভঙ্গীতে ও ভাষায় অধ্যাত্মজগতের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতে থাকেন। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকটি সেদিন তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। রামকৃষ্ণের গভীর সত্যোপলব্ধি সেদিন আমাকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি যখনই অবসর পাইতাম, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট যাইতাম। তাঁহার সহিত বহুবার সাক্ষাৎ করিয়াছি। তাঁহার মুখনিঃসৃত পরমতত্ত্বের বহু মূল্যবান ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগও কম পাই নাই, কিন্তু পৃথকভাবে সেগুলি সব আজ স্মরণ নাই। স্মৃতিপটে যে ঘটনাগুলি তখন বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছিল, তাহারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

আমি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ এক সময়ে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়াছেন। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের গুণাগুণের বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন—চুপ কর তো তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের কথা এভাবে বিচার করে কি লাভ বল দেখি? তাঁর মহিমা বুঝতে হলে স্মরণ, মনন, ধ্যান-ধারণা দিয়ে তা করতে হয়, তর্ক করে কি তা বুঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময়, একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যিই আমায় বোঝাতে পারিস? এই যে সেদিন সাবাজপুরে বন্যা আর ঝড়ে শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হলো, এ কি করুণার নিদর্শন? তোরা হয়তো বলবি, এই ধ্বংসের ফলে ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হলো। কিন্তু আমি তর্ক করে বলবো—যিনি সর্বশক্তিমান, একদিকে সৃষ্টি করতে হলে কি তাঁকে আবার একদিকে ধ্বংস করতে হবে? শত শত অসহায় শিশু, নারী, বালক, বৃদ্ধের কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি ঈশ্বরের করুণার কথা কল্পনা করা যায় রে?

একজন ভক্ত শ্রোতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—তবে কি বলতে হবে, ঈশ্বর নিষ্ঠুর!

শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—আরে বোকা, কে তোকে তা বলতে বলছে? ঈশ্বরের গুণাগুণ নির্ণয় কে করবে? তাঁর অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে? তাইতো বলছি, কাতর হয়ে, যুক্ত করে শুধু এই প্রার্থনা কর—ঈশ্বর! তোমার মহিমা বুঝবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই, তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞান-নেত্র খুলে দাও।

এই বলিয়া তিনি একটি সুন্দর গল্প সকলের সম্মুখে বিবৃত করিতে লাগিলেন।

—এক বাগানে একটা আমগাছের নীচে দুই বন্ধু পথশ্রান্ত হয়ে এসে বসলো। ওদের একজন তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল নিয়ে আমগাছের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অপরজন প্রকৃত বুদ্ধিমান, সে এসব চিন্তা না করে পাকা আমগুলো তৎক্ষণাৎ পেড়ে খেতে শুরু করলো। সে জানে, আমের হিসাবে তার প্রয়োজন নেই, সে আম খেতে এসেছে, খাওয়ার তৃপ্তিই তার কাম্য; আমাদের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ঈশ্বরের গুণের বিচারে আমাদের কাজ কি? আমরা আনন্দে তাঁর নামসুধা পান করে যদি তৃপ্ত হই, তাই কি পরম লাভ নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে থাকেন—বাগানে যে দুই বন্ধু এসে ঢুকলো, তাদের মধ্যে যে পাকা আমটি খেলো, প্রকৃত লাভবান সে-ই—এ সম্পর্কে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না। সে জানে, অপরের বাগানে স্বল্পক্ষণের জন্য এসে হিসাব করতে বসা মূর্খতা।

ভক্তেরা একবাক্যে মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলে পরমহংস হাসিয়া বলিলেন—ওরে, মানুষের জীবনও তো এমনি অল্পস্থায়ী। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাগুণ বিচারে সময়ের অপচয় করবি কেন? অনন্ত শক্তির হিসাব কে করতে পারে? তার চাইতে তাঁর নামগান করে আনন্দলাভ করলেই বরং জীবনের চরিতার্থতা। সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করে তাঁর নামগান করে যা, তিনিই কৃপা করে

তাঁর অনন্ত মহিমার রাজ্য তোর সামনে উন্মোচন করবেন। আমাদের আর হিসেবে প্রয়োজন কি ?

সম্মিলিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত। এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধকের মুখে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের এরূপ সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া সেদিন সকলেই বিস্মিত হইয়া যান।

একদিন আমি রামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। এক ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—অধ্যাত্মসাধনায় সদ্‌গুরু প্রাপ্তির উপর জোর দেওয়া কি সত্যই অপরিহার্য ?

রামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চয়ই, জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যবলেই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এপথে গুরুর করুণা যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। গুরুই শিষ্যকে প্রধানতঃ এপথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন, শিষ্যের চেষ্টার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে ব্যক্তিগত চেষ্টায়ও কাজ হয়, কিন্তু গুরুই সেই দুর্গম পথকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে সুগম করে দিতে পারেন।

এই বলিয়া তিনি সম্মুখে প্রবাহিনী গঙ্গায় চলমান একখানি বাষ্পায়-পোতের দিকে সমাগত ভক্ত ও দর্শনপ্রার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন—আচ্ছা, ষ্টীমারটি চুঁচুড়ায় কখন পৌঁছবে বলতে পার ?

একজন উত্তর দিলেন - সন্ধ্যা পাঁচটা-ছয়টা হবে।

—হাল-টানা নৌকোর সেখানে পৌঁছতে পনরো-কুড়ি ঘণ্টারও বেশী সময় লাগবে। কিন্তু নৌকোটিকে যদি ওই বাষ্পীয়-যানটির সঙ্গে জুড়ে দাও, তবে সেও ওটার মত অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে। যারা মুক্তি চায় তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা। তুমি যদি গুরুর নির্দেশ ছাড়াই এপথে চলতে আরম্ভ কর, তাহলে বহু বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে তোমার সময় ও পরিশ্রম

কম যাবে না, কিন্তু গুরু-সহায়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে তা সম্ভব হয়। এই হচ্ছে ধর্মজীবনে গুরু-সহায়ের তাৎপর্য।

অপর একদিন এক ভক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় ?

সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ সাধকের ব্যাকরণগত ত্রুটি আমার শিক্ষিত মনকে ঝাঁকুনি দেয় সত্য, কিন্তু তাঁহার অনাড়ম্বর সরল ও প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা আমার মনকে বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'জ্ঞান' ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু নিরক্ষর রামকৃষ্ণ জ্ঞানকে পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন—জ্ঞান পুরুষ, সেজন্য তাকে সকল সময়ই মহামায়ার অন্তঃপুরের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়—ভেতরে প্রবেশের অধিকার তার নেই। কিন্তু ভক্তি নারী, মায়ের অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি, মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে তার কোন বাধাই নেই। জ্ঞানের পথ আয়াস-সাপেক্ষ, কিন্তু ভক্তির সরলতা গমনপথকে স্নিগ্ধ করে, পথের বাধার রুক্ষতা দূর করে দেয়।

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মত দুরূহ তত্ত্বকে এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, একথা পূর্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, পরমতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি না হইলে বিশ্বসংসারের সমস্যা কাহারো নিকট এমন সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে না। তাঁহার ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলি এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ যে, তাহা যে-কোন মানুষই সাধারণ জ্ঞান দিয়া বুঝিতে পারিত।

একদিনের ঘটনার কথা বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের সাধনার কথা বলিতেছেন। এক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন—গৃহীরা ধ্যান-ধারণা করবে কখন ? দিবারাত্র সংসারের কাজে তারা মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এ অবস্থায় ভগবৎ-ভজনের অবসর কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—ওর মধ্যেই হয়। গ্রামদেশের চিঁড়েকুটুনী মেয়েদের দেখেছ ? ওরা চিঁড়ে কুটবার সময় এক হাতে ঢেঁকির ভেতরে ধান ওল্টায়, আর এক হাতে শিশুকে স্তন দেয় ; আবার ব্যাপারী এলে তার সাথে চিঁড়ের দর-কষাকষি করে। করে সে সব কাজই, কিন্তু

মনটি দিয়ে রাখে ঢেঁকির গড়ের দিকে। সে জানে, অন্যমনস্ক হলেই তার হাত ঢেঁকির ঘায়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। সংসারী লোকেরা চিড়েকুটুনীর মত সমস্ত মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে সকল কাজ করে যেতে পারে, তাতেই কাজ হবে।

সাধক রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটি ভগবদ্‌সত্তায় এমনই ভরপুর ছিল যে, সেখানে যে-কোন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইত। আন্তরিকতাহীন অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর তিনি পছন্দও করিতেন না।

একদিন ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। কথা-প্রসঙ্গে মালা জপের প্রসঙ্গ উঠিল। এক ভক্ত পরমহংসকে প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা, দেব-দেবীর নাম স্মরণের জন্য মালা জপের কি সত্যই কোন সার্থকতা আছে?

রামকৃষ্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলিলেন—হ্যাঁগো, যদি তার পেছনে আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু আন্তরিকতাহীন নাম জপে কোন ফলোদয়ই হয় না। যেমন ধর, টিয়াপাখীর হরিনাম করা। পোষা পাখীকে রাধা-কৃষ্ণ বুলি শেখাও, সে পড়তে শিখবে এবং কারণে অকারণে সেই শিখানো বুলি পড়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করবে। কিন্তু যদি কোনদিন তাকে বেড়ালে আক্রমণ করে, তখন কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর রাধা-কৃষ্ণ বুলি বার হবে না। সে তখন প্রাণভয়ে মাতৃভাষায় 'ক্যাঁ' 'ক্যাঁ' শব্দই করতে থাকবে। তার কারণ, রাধা-কৃষ্ণ তার শেখা বুলি, অন্তরের কথা নয়, সেজন্যই সঙ্কটকালে সে-বুলি ভুলে যায়।

তিনি বলিয়া চলিলেন—আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতাহীন ধর্মাচরণ-কারীদের অবস্থা টিয়াপাখীর মতই হয়ে থাকে। ধর্মানুষ্ঠান তাদের জীবনের বহিরঙ্গ ব্যাপার, তাই সঙ্কটমুহূর্তে তারা টিয়াপাখীর মতই এটা বিস্মৃত হয়ে যায়—ফলে ধর্মের মুখোশ খুলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। বিশ্বাস বা ভক্তির জোর না থাকলে ধর্মের ভাব অল্প আঘাতেই ছুটে যায়। যে বিশ্বাস জীবনের সঙ্কটকালে টিকে থাকতে পারে না, সে আবার বিশ্বাস নাকি?

এরূপ ধরনের কথা বহুবারই শুনিয়াছি। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সহজ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষতা নূতন রূপ লইয়াই প্রত্যেকটি ভক্তের অন্তর স্পর্শ করিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত কথোপকথনের বহু স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতেছে। সকল কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের দীর্ঘতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম। আমার প্রতি প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর স্নেহ প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটনা বলিয়া এ রচনা শেষ করিব। সংসারী মানুষের ভালবাসা প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ, কিন্তু তাঁহার স্নেহ যেন স্রোতস্বিনী, আপন গতিতেই উহা পরিপূর্ণ ও সার্থক। তাঁহার এই অহেতুকী স্নেহের ধারায় আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা বলিতেছি।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকার্য লইয়া ব্যস্ত থাকায় আমি কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাইতে পারি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই আমার সংবাদ লইতে কোন-না-কোন ভক্তকে পাঠাইতেন, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেন। আমিও যাইব বলিয়া প্রায়ই প্রতিশ্রুতি দিতাম, কিন্তু নানা কার্যের মধ্যে তাহা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। অবশেষে স্নেহপরায়ণ পরমহংস একদিন অন্যত্র যাইবার পথে আমার বাসায় উপস্থিত হন।

আমার কাছ ঘেঁষিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি বলিলেন—কি গো, আমার কথা বুঝি তোমার মনে পড়ে না? যাব যাব বল—অথচ যাও না। ব্যাপার কি তোমার?

উত্তরে বলিলাম—সমাজের কাজ নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত আছি, সেজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারিনি।

শিশুর মত রুষ্ট ও অভিমানাহত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—চুলোয় যাক তোমার ব্রাহ্ম সমাজ! যে কাজ করলে বন্ধুর সাথে দেখা করা যায় না, অমন কাজ করে লাভ কি?

একটু থামিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তিনি কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিলেন—কি মজা হয়েছে জান? আমি যখন

তোমার বাড়ি আসছি, তখন আমারই একজন ভক্ত আমায় বলে—আপনি একজন ব্রাহ্মের বাড়ি যাচ্ছেন কেন? তিনি এমন কি পদস্থ ব্যক্তি যে আপনি নিজে তাঁর কাছে যাবেন? —আমি উত্তরে তাদের কি বলেছি জান?

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেই পরমহংস বলিলেন—আমি বললাম, আমার কাছে সে যে তোমার চাইতে কোন অংশেই কম প্রিয় নয়!

দমদমের এক বাগানবাড়িতে ব্রাহ্ম সমাজের এক উৎসবে আহূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হন। আমার সেখানে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হয়। আমি পৌঁছিয়া দেখি তিনি শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতেছেন ও নামে বিভোর হইয়া আছেন। সেই অবস্থায় আমাকে দেখিয়া তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আমার নিকট আসিলেন ও আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অতঃপর স্নেহমাখা স্বরে বলিতে লাগিলেন—তুমি আসনি, তাই এতক্ষণ অত আনন্দের মধ্যেও যেন কিসের অভাব বোধ হচ্ছিল। এখন আমার মন পূর্ণ আনন্দ লাভ করেছে।

ইহা বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিগুণ উৎসাহে নাম গান ও নৃত্যে মগ্ন হইয়া গেলেন। এই অল্প কয়েকটি কথার মধ্য দিয়া আমার প্রতি সাধকের গভীর স্নেহের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়া গেলাম।

আরও একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। অনেকদিন পর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি। পরমহংসকে তাঁহার কক্ষে না দেখিয়া ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিতেছি। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া তীর-ধনুকসহযোগে একদল কাক তাড়াইতে ব্যস্ত। হাবভাবে মনে হইতেছে, সে সময়ে ইহা অপেক্ষা আর কোন কাজই তাঁহার জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাঁহার এই শিশুসুলভ ব্যস্ততা কৌতূহলোদ্দীপক। সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম—কি ব্যাপার? আপনি দেখছি একজন তীরন্দাজ হয়ে উঠলেন!

আমার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া রামকৃষ্ণ আমাকে দেখিলেন। দীর্ঘদিনের পরে দেখা, তাই আমার উপস্থিতি তাঁহাকে স্নেহবিহ্বল করিয়া তুলিল। তীর-ধনুক তৎক্ষণাৎ মাটিতে ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন ও আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখা গেল, তিনি গভীর ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাঁহার কক্ষে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি সুস্থ হইলেন। অতঃপর তিনি যে কথাটি বলিলেন, তাহাতে যে-কেহ বিস্মিত না হইয়া পারিবে না। তিনি বালকের মত আবদার করিয়া কহিতে লাগিলেন—ওগো, তুমি আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে? এখানকার একজন আমায় একবার চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখাতে নিয়ে যাবে বলে কথা দেয়, শেষ পর্যন্ত তা রাখেনি।

সাধকের সমস্ত মুখমণ্ডলটি তখন এক অকপট কৌতূহল ও বালসুলভ আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি পরম উৎসাহে বলিয়া চলিলেন—আচ্ছা, তোমার সিংহ দেখতে কেমন লাগে, জগজ্জননী দেবী দুর্গার সাক্ষাৎ বাহন!—বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে বার-বার তিনি বলিতে লাগিলেন—ওগো, তুমি আমায় সত্যিই নিয়ে যাবে তো?

আমি বলিলাম—সিংহ আমি এর আগে বহুবার দেখেছি। আপনার সঙ্গে থেকে আবার দেখতে পেলে খুশীই হতাম, কিন্তু আজ আমার নানা জরুরী কাজ রয়েছে। তবে আমি আপনাকে আজ সুকিয়া স্ট্রীট পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নরেন্দ্রের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

রামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার নির্দেশমত আমি একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া তাঁহাকে লইয়া সুকিয়া স্ট্রীট অভিমুখে রওনা হইলাম। স্থির হইল, মেট্রোপলিটন

ইন্‌স্টিটিউশন হইতে নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইবেন।

সাধকপুরুষ রামকৃষ্ণের ভাবগম্ভীর অধ্যাত্ম-জীবনের সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল, সে মানুষ যে এত রসিক এ সংবাদ পূর্বে আমার জানা ছিল না। সেদিন তাঁহার রসিকতা দেখিয়া আমি সত্যই বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম। তিনি গাড়িতে উঠিয়াই আমার বাম পার্শ্বে বসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি প্রথমে তাঁহার এই ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বুঝি নাই। তিনি কিন্তু আমার পাশে বসিয়াই যে ভঙ্গী করিলেন, তাহা যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতুককর। সকলে যথারীতি আসন গ্রহণ করিলে গাড়ি ছাড়িল। গাড়িটি দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছাড়িতেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধের চাদরখানি লইয়া নব-পরিণীতা বধূর মত নিজের মাথায় ঘোমটা টানিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার এ আচরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বধূর মত সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া সকৌতুকে বলিলেন—আমি যে তোমার প্রেমিকা। প্রেমিকের সাথে বেড়াতে চলেছি। মাথায় ঘোমটা দেব না!—এই বলিয়া একখানি হাত সপ্রেমে আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে বসিয়া রহিলেন।

এই কৌতুকের ভাবটি অবলম্বন করিয়াই কিন্তু সাধকের সমগ্র সত্তায় আধ্যাত্মিক ভাবের অবতরণ ঘটিল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, এক দিব্য ভাবের ব্যঞ্জনায় ও অপার্থিব আনন্দে তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভাবাবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন। মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন—মা জগজ্জননী, আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ করে দিসনে। আমি চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহ দেখব, আনন্দ করবো। আমায় সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিসনে।

বলিতে বলিতে গভীর ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্যরহিত হইয়া তিনি আমার বক্ষে এলাইয়া পড়িলেন। আমি ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি ভাবলোক হইতে নামিয়া আসিলেন ও আবার

তাঁহার শিশুসুলভ চপলতা ও সরস কথাবার্তায় সকলকে আনন্দ দিতে লাগিলেন ইতিমধ্যে গাড়ি সুকিয়া ষ্ট্রীটে পৌঁছিলে নরেন্দ্রনাথের দায়িত্বে তাঁহাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।

রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমার সহিত তাঁহার খুব অল্পই দেখা হয়—অবশ্য ইহার পিছনে ছিল দুইটি কারণ। প্রথমতঃ, এ সময়ে তাঁহার নিকট কয়েকজন নূতন ভক্ত আসেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চের দু'একটি অভিনেতারও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উক্ত ব্যক্তিদের আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না। সুতরাং উহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আমার মনে তিক্ততারই সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য তাঁহাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আমি এই মতবাদ কোন সময়ই মানিতে পারি নাই। পাছে এই প্রসঙ্গ লইয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এ আশঙ্কায় আমি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করি।

অনেকদিন পরের কথা। একদিন আমারই এক বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নিকট রামকৃষ্ণের অসুখের সংবাদ পাইয়া বড় বিচলিত হইয়া পড়ি। সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া তখন আমি দক্ষিণেশ্বর-অভিমুখে যাত্রা করি। তখন তাঁহাকে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করার কথাবার্তা চলিতেছে। আমাকে দেখিয়া তো কিছুক্ষণ তিনি রুদ্ধ অভিমানে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি কেন তাঁহার এত অসুখেও দেখিতে আসি নাই, ইহা লইয়া বার-বার অনুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না।

আমার ব্যবহারে তিনি আন্তরিক ব্যথা পাইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আমি অকপটে তাঁহাকে না আসিবার কারণ দুইটি জানাইয়া দিলাম; আরও বলিলাম—আপনার শিষ্য ও ভক্তেরা আপনাকে ঈশ্বরের এক নূতন সংস্করণরূপে যেভাবে প্রচার আরম্ভ করেছে, তাতে—আমি সাধারণ মানুষ, ঈশ্বরের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে ভরসা পাইনে।

সরল অনাবিল হাস্যে কক্ষটি মুখরিত করিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন—

একবার ভেবে দেখ, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর গলার ক্যান্সারে মরতে বসেছে।

অতঃপর উৎসাহী শিষ্যদের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করিলেন—বোকার অশেষ গুণ!

আমার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইহাই শেষ দেখা। ইহার পর চিকিৎসার্থ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলে। কিন্তু যথাসময়ে রামকৃষ্ণের মুক্তাত্মা নরজীবনের অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল। যে পূতস্মৃতি তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা আজিও শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুর জীবনকে উজ্জীবিত করিতেছে।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সময় খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু ঐটুকু কালের মধ্যেই উহা গভীর ও আন্তরিক না হইয়া পারে নাই। তাঁহার জীবন ও বাণী আমার চলার পথেও সহায়ক হইয়াছে, আমার জীবনের বহু আধ্যাত্মিক আদর্শকে উহা রসপুষ্ট করিয়াছে। জীবনপথে যে সকল মনীষী ও মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন ; এমন কি, অনেকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভয়ের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অমানুষ যোগ-বিভূতি সকলই উহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন তুমি তাঁহাকে মান ? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহু দূরের ঘটনাবলীও ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া দেখিতে পাইতেন, যে—স্পর্শ করিয়া কঠিন কঠিন শারীরিক ব্যাধিসমূহ কখনও কখনও আরাম করিয়াছেন, যে—দেবতাদের সহিতও তাঁহার সর্বদা ব্যাক্যালাপ হইত এবং তাঁহার বাক্য এতদূর অমোঘ ছিল যে, মুখপদ্ম হইতে কোন অসম্ভব কথা বাহির হইলেও বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলীও ঠিক সেইভাবে পরিবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রিত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাঁহার কৃপাকণা ও আশীর্বাদ লাভে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষিত এবং বিশেষ সম্মানিত পর্যন্ত হইয়াছিল, অথবা কেবলমাত্র রক্তকুসুমোৎপাদী বৃক্ষে শ্বেতকুসুমেরও আবির্ভাব হইয়াছিল ইত্যাদি।

অথবা বলেন যে—তিনি মনের কথা বুঝিতে পারিতেন, যে—তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রত্যেক মানবশরীরের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মনের চিন্তা, গঠন এবং প্রবৃত্তিসমূহ পর্যন্তও দেখিতে পাইত ; যে—তাঁহার কোমল করস্পর্শমাত্রেই চঞ্চলচিত্ত ভক্তের চক্ষুতে ইষ্ট মূর্ত্যাদির আবির্ভাব হইত অথবা গভীর ধ্যান এবং অধিকারী বিশেষে নির্বিকল্প সমাধির দ্বার পর্যন্ত উন্মুক্ত হইত। বিরল কেহ কেহ আবার বলেন যে—কেন তাঁহাকে মানি, তাহা আমিই জানি না ; কি এক অদ্ভুত জ্ঞান এবং প্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ যে তাঁহাতে দেখিয়াছি, তাহা জীবিত পরিচিত মনুষ্যকুলের ত কথাই নাই, বেদপুরাণাদি গ্রন্থনিবদ্ধ জগৎপূজ্য

আদর্শসমূহও তাঁহার পার্শ্বে আমার চক্ষুতে হীনজ্যোতিঃ হইয়া যায়; এটা আমার মনের ভ্রম কিনা, তাহা বলিতে অক্ষম। কিন্তু আমার চক্ষু সেই উজ্জ্বল প্রভায় ঝলসিয়া গিয়াছে এবং মন সে প্রেমে চিরকালের মত মগ্ন হইয়াছে, ফিরাইবার চেষ্টা করিলেও ফিরে না, বুঝাইলেও বুঝে না; জ্ঞান, তর্ক, যুক্তি যেন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, ডাকিলেও সাড়া দেয় না বা সহায়তা করে না; এইটুকুমাত্র আমি বলিতে সক্ষম—

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কে বা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত
জপ তপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে,
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে অপর মনুষ্য সাধারণ স্থূল বাহ্যিক-বিভূতি অথবা সূক্ষ্ম মানসিক-বিভূতির জন্যই তাঁহাকে ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকে। স্থূল-দৃষ্টি মানব মনে করে যে, তাঁহাকে মানিলে তাহারও রোগাদি আরোগ্য হইবে; তাহারও সঙ্কট-বিপদাদির সময়ে বাহ্যিক ঘটনাসমূহ তাহার অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত হইবে। স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার মনের ভিতর যে এই স্বার্থপরতার স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যগত কি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি মানবও তাঁহার কৃপায় দূরদর্শনাদি বিভূতি লাভ করিবে, তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া গোলোকাদিস্থানে বাস করিবে অথবা আরও কিঞ্চিৎ সমুন্নত দৃষ্টি হইলে সমাধিস্থ হইয়া জন্ম-জরাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এই

জন্যই তাঁহাকে মানিয়া থাকে। স্বকীয় প্রয়োজনসিদ্ধিই যে এই বিশ্বাসেরও মূলে বর্তমান, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ দেববিভূতি-নিচয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেও অথবা নিজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধি প্রয়োজনরূপ সকাম ভক্তিও যে তাঁহাতে অর্পিত হইয়া অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়, এ বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও তত্তদ্বিষয় আলোচনা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহার মনুষ্যভাবের চিত্র কথঞ্চিৎ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করাই অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

সকাম ভক্তি—নিজের কোনরূপ অভাবপূরণের জন্য ভক্তি, ভক্তকে সত্য দৃষ্টির উচ্চ সোপানে উঠিতে দেয় না। স্বার্থপরতা সর্বকালে ভয়ই প্রসব করিয়া থাকে এবং ঐ ভয়ই আবার মানবকে তুর্বল হইতে তুর্বলতর করিয়া ফেলে। স্বার্থলাভ আবার মানবমনে অহংকার এবং আলস্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার চক্ষু আবৃত করে এবং তজ্জন্যই সে যথার্থ সত্য দর্শনে সমর্থ হয় না। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর ভিতর যাহাতে ঐ দোষ প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ধ্যানাদির অভ্যাসে দূরদর্শনাদি কোনরূপ মানসিক শক্তির নূতন বিকাশ হইয়াছে জানিলেই পাছে ঐ ভক্তের মনে অহংকার প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে ভগবানলাভরূপ উদ্দেশ্যহারা করে, সেজন্য তিনি তাহাকে কিছুকাল ধ্যানাদি করিতে নিষেধ করিতেন, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; ঐ প্রকার বিভূতিসম্পন্ন হওয়াই যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়, ইহাও বার-বার বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু তুর্বল মানব নিজের লাভ-লোকসান না খতাইয়া কিছু করিতে বা কাহাকেও মানিতে অগ্রসর হয় না এবং ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন হইতে ত্যাগ শিক্ষা না করিয়া নিজের ভোগসিদ্ধির জন্যই ঐ মহৎ জীবন আশ্রয় করিয়া থাকে। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার লৌকিক তপস্যা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সত্যানুরাগ, তাঁহার বালকের ন্যায় সরলতা এবং নির্ভর, এ সকল যেন তাহাদিগের ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করে। আমাদের মনুষ্যত্বের অভাব ঐ প্রকার হইবার কারণ এবং সেই

জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনুষ্যভাবের আলোচনাই আমাদের অশেষ কল্যাণকর।

ভক্তি যৎকিঞ্চিৎ ও যথার্থ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিয়া তুলে। সর্ব জাতির সর্ব ধর্মগ্রন্থেই একথা প্রসিদ্ধ। ক্রুশারূঢ় ঈশার মূর্তিতে সমাধিস্থ মন, ভক্তের হস্তপদ হইতে রুধির নির্গমন, শ্রীমতীর বিরহ-দুঃখানুভবনিমগ্ন মন, শ্রীচৈতন্যের বিষম গাত্রদাহ এবং কখনো বা মৃতবৎ অবস্থাদি, ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে বৌদ্ধভক্তের বহুকালব্যাপী নিশ্চেষ্টাবস্থান প্রভৃতি ঘটনাই ইহার নিদর্শন। প্রত্যক্ষও দেখিয়াছি, মনুষ্যবিশেষে প্রযুক্ত ভালবাসা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানুষকে ভালবাসিতের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহার বাহ্যিক হাব-ভাব চাল-চলনাদি তাহার মানসিক চিন্তাপ্রণালীও সমূলে পরিবর্তিত হইয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিও তদ্রূপ যদি আমাদের জীবনকে দিন দিন তাঁহার জীবনের কথঞ্চিৎও অনুরূপ না করিয়া তুলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভক্তি এবং ভালবাসা তত্তন্নামের যোগ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—"তবে কি আমরা সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সমর্থ? একের সম্পূর্ণরূপে অপরের ন্যায় হওয়া জগতে কখনও কি দেখা গিয়াছে?" উত্তরে আমরা বলি, সম্পূর্ণ একরূপ না হইলেও এক ছাঁচে গঠিত পদার্থনিচয়ের ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। ধর্মজগতে প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ সদৃশ। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরাও সেই সেই ছাঁচে গঠিত হইয়া অদ্যাবধি সেই সকল বিভিন্ন ছাঁচ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মানুষ অল্পশক্তি; ঐ সকল ছাঁচের কোন একটিরও মত হইতে তাহার আজীবন চেষ্টায়ও কুলায় না। ভাগ্যক্রমে কেহ কখনও কোন একটি ছাঁচের যথার্থ অনুরূপ হইলে আমরা তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। কিন্তু সিদ্ধ মানবের চাল-চলন, ভাষা, চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক সকল বৃত্তিই সেই ছাঁচপ্রবর্তক মহাপুরুষের সদৃশ হইয়া থাকে। সেই মহাপুরুষের জীবনে যে মহাশক্তির প্রথম অভ্যুদয় দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল,

তাহার দেহ মন সেই শক্তির কথঞ্চিৎ ধারণ, সংরক্ষণ এবং সঞ্চারের পূর্ণাবয়ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ-প্রণোদিত ধর্মশক্তি-নিচয়ের সংরক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন জাতি আবহমানকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

ধর্মজগতে যে সকল মহাপুরুষ অদৃষ্টপূর্ব নূতন ছাঁচের জীবন দেখাইয়া যান, তাঁহাদিগকেই জগৎ অদ্যাবধি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। অবতার ধর্মজগতে নূতন মত—নূতন পথ আবিষ্কার করেন; স্পর্শমাত্রেই অপরে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করেন। তাঁহার দৃষ্টি কখনও অনিত্য সংসারে কামকাঞ্চনের কোলাহলের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার জীবন পর্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অপরকে পথ দেখাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিজের ভোগসাধন বা মুক্তিলাভও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু অপরের দুঃখে সহানুভূতি, অপরের উপর গভীর প্রেমই তাঁহাদিগকে কার্যে প্রেরণা করিয়া অপরের দুঃখনিবারণের পথ আবিষ্করণের হেতু হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবকান্তি যত দিন না দেখিয়াছিলাম, ততদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারখ্যাত মহাপুরুষগণের জীবনবেদ পাঠ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলাম। তাঁহাদের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী দলপুষ্টির জন্য শিষ্যপরম্পরারচিত প্ররোচনাবাক্য বলিয়া মনে হইত, অবতার সভ্য জগতের বিশ্বাসবহির্ভূত কিম্ভূত-কিমাকার কাল্পনিক প্রাণিবিশেষ বলিয়া অনুমিত হইত। অথবা ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও সেই সকল অবতারমূর্তিতে যে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যভাব সকল বর্তমান, বিশ্বাস হইত না। তাঁহাদের শরীরে যে আমাদের মত রোগাদি হইতে পারে, তাঁহাদের মনে যে আমাদেরই মত হর্ষ-শোকাদি বিদ্যমান, তাঁহাদিগের ভিতরে যে আমাদেরই ন্যায় প্রবৃত্তি-নিচয়ের দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতে পারে, তাহা ধারণা হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্পর্শেই সে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে। অবতার-শরীরে দেব এবং মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্বে

কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, এ কথা ভাবি নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় বালকস্বভাবই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অজ্ঞান বালক সকলেরই প্রেমের আস্পদ এবং সকলেই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতঃ ত্রস্ত হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিলে লোকের মনে সেই সকল ভাবের স্বভাবতঃ স্ফূর্তি হইয়া, তাহাদিগকে মোহিত ও আকৃষ্ট করিত। কথাটি কিছু সত্য হইলেও আমাদের ধারণা—পরমহংসদেবের শুদ্ধ বালকভাবে যে জনসাধারণই আকৃষ্ট হইত, তাহা নহে, কিন্তু হর্ষ ও প্রীতির সহিত দর্শকের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় দেখিয়া মনে হয়, কুসুমকোমল বালক পরিচ্ছদে আবৃত, ভিতরে বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ। ভারতের যশস্বী কবি অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর চরিত্র বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোঽনুভবিতুমর্হতি॥"

সেই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেও প্রতি পদে বলিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকভাব এক অতি অভিনব পদার্থ। অসীম সরলতা, অপার বিশ্বাস, অশেষ সত্যানুরাগ সে বালকত্বের মূলে সর্বদা প্রকাশিত থাকিলেও বিষয়বুদ্ধি মানব তাহাতে কেবল নির্বুদ্ধিতা এবং বিষয়বুদ্ধিরাহিত্যেরই পরিচয় পাইত। সকল লোকের কথাতেই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশেষতঃ ধর্মলিঙ্গধারীদের কথায়। দেশের এবং নিজ গ্রামের প্রচলিত ভাব সকলও এই বালকত্ব পরিস্ফুট করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শস্যভারশ্যামলাঙ্গ হইয়া হরিৎ-সমুদ্রপ্রতীকাশ অথবা তদভাবে ধূসরমৃত্তিকাসমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ বহুযোজন-ব্যাপী প্রান্তর, তন্মধ্যে বংশ, বট, খর্জ্জুর, আম্র, অশ্বত্থাদি বৃক্ষাচ্ছাদিত কৃষককুলের মৃত্তিকানির্মিত সুপরিচ্ছন্ন দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভমান পর্ণ-কুটীররাজি, সুনীল পত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ তালবৃক্ষরাজিমণ্ডিত, ভ্রমরমুখরিত পদ্মসমাচ্ছন্ন হালদারপুকুরাদিনামখ্যাত বৃহৎ সরোবরনিচয়,

বুড়োশিবাদিনামা প্রথিতযশা দেবাধিষ্ঠিত ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগৃহ; অদূরে পুরাতন গড়-মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন স্তূপরাজি, প্রান্তে ও পার্শ্বে অস্থিসমাকুল বহু-প্রাচীন শ্মশান, তৃণাচ্ছাদিত গোচর, নিবিড় আম্রকানন, বক্র সঞ্চরণশীল ভূতির খাল খ্যাত ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী এবং সমগ্র গ্রামের অর্ধেকেরও অধিক বেষ্টন বর্তমান বর্ধমান হইতে পুরীধামে যাইবার যাত্রীসমাকুল সুদীর্ঘ রাজপথ—ইহাই—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর।

শ্রীচৈতন্য এবং তচ্ছিষ্যগণ-প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মই এখানে প্রবল। কৃষাণ প্রজাকুল তাহাদের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে অথবা দিনান্তে কার্যাবসানে তাঁহাদেরই পদাবলী গানে আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রমাপনোদন করে। সরল পদ্মময় বিশ্বাসই এ ধর্মের মূলে; এবং জীবন-সংগ্রামের কঠোর তরঙ্গসমূহ হইতে সুদূরে বর্তমান এই গ্রামের ন্যায় বালকের হৃদয়ও ঐরূপ বিশ্বাস এবং ধর্মের বিশেষ অনুকূলভূমি। বালক রামকৃষ্ণের বালকত্ব কিন্তু এখানেও অদ্ভুত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার বিচিত্র কার্যসকলে না হইলেও, উদ্দেশ্যের গভীরতা এবং একতানতা দেখিয়া সকলে অবাক হইত। "রামনামে মানব নির্মল হয়" কথকমুখে একথা শুনিয়া কখনও বা এ বালক দুঃখিতচিত্তে কল্পনা করিত যে, তবে কথক ঠাকুরেরও অদ্যাবধি শৌচের আবশ্যক হয় কেন? কখনও বা একবার মাত্র যাত্রাদি শুনিয়া তাহার সকল অঙ্গ আয়ত্ত করিয়া বয়স্যসমূহসংগে আম্রকাননমধ্যে উহার পুনরভিনয় হইত। গ্রামান্তরগন্তকাম পথিক বালকের সে অদ্ভুত অভিনয় ও সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গন্তব্যপথে যাইতে ভুলিয়া যাইত। প্রতিমাগঠন, দেব-চিত্রাদিলিখন, অপরের হাবভাব অনুকরণ, সঙ্গীত-সংকীর্তন, রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গভীর অনুভবে এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। তাঁহার শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, কৃষ্ণনীরদাবৃত গগনে উড্ডীন ধবল বলাকারাজি দেখিয়াই তিনি প্রথম সমাধিস্থ হন; তাঁহার বয়স তখন ৬।৭ বৎসর মাত্র ছিল। যখন যে ভাব হৃদয়ে আসিত, সেই

ভাবে তন্ময় হওয়াই এ বালকমনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রতিবেশীরা এখনও এক বণিকের গৃহপ্রাঙ্গণ নির্দেশ করিয়া গল্প করে, কিরূপে একদিন ঐ স্থানে হরপার্বতী-সংবাদের অভিনয়কালে অভিনেতা সহসা পীড়িত হইয়া অপারগ হইলে রামকৃষ্ণকে সকলে অনুরোধ করিয়া শিব সাজাইয়া অভিনয় করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি ঐ সাজে সজ্জিত হইয়া এমনই ঐ ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞামাত্র ছিল না। এই সকল ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যায় যে, বালক হইলেও বালকের চঞ্চলচিত্তত্ব তাঁহাতে আশ্রয় করে নাই।

দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেই তাহার ছবি মনে এরূপ সুদৃঢ় অংকিত হইত যে, ঐ প্রেরণায় উহার সম্পূর্ণ আয়ত্তীকরণ এবং অভিনবরূপে পুনঃ প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকা এ বালকের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

গ্রন্থাদি না পড়িলেও বাহ্যজগতের সংঘর্ষে এ বালকের ইন্দ্রিয়নিচয় স্বল্পকালেই সমুচিত প্রস্ফুটিত হয়। যাহা সত্য, প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইব, যাহা শিখিব, তাহা কার্যে প্রয়োগ করিব এবং অসত্য না হইলে জগতের কোন বস্তুই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিব না, ইহাই এ বালকমনের মূলমন্ত্র ছিল। যৌবনের প্রথম উদ্গম—অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন বালক রামকৃষ্ণ শিক্ষার জন্য টোলে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বালকত্বের সাঙ্গ হইল না। সে ভাবিল, এ কঠোর অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ টীকাকারের চর্বিত-চর্বণ প্রভৃতি কিসের জন্য? ইহাতে কি বস্তু লাভ হইবে? মন ঐ প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণফল টোলের আচার্যকে দেখাইয়া বলিল, তুমিও ঐরূপ সরল শব্দনিচয়ের কুটিল অর্থকরণে সুপটু হইবে; তুমিও উহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির তোষামোদাদিতে বিদায়াদি সংগ্রহ করিয়া, কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে; তুমিও ঐরূপ শাস্ত্রনিবদ্ধ সত্য সকল পাঠ করিবে এবং করাইবে, কিন্তু চন্দন-ভারবাহী গর্দভের ন্যায় তাহাদিগের অনুভব জীবনে করিতে পারিবে না। বিচারবুদ্ধি বলিল, এ চালকলাবাঁধা বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। যাহাতে মানবজীবনের গূঢ় রহস্যসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ সত্য অনুভব করিতে পার, সেই

পরা-বিদ্যার সন্ধান কর। রামকৃষ্ণ পাঠ ছাড়িলেন এবং আনন্দপ্রতিম দেবীমূর্তির পূজাকার্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু ওখানেও শান্তি কোথায়? মন বলিল, সত্যই কি ইনি আনন্দঘনমূর্তি জগজ্জননী অথবা পাষাণপ্রতিমা মাত্র? সত্যই কি ইনি ভক্তিসমাহৃত পত্র-পুষ্প-ফল-মূলাদি গ্রহণ করেন? সত্যই কি মানব ইহার কৃপাকটাক্ষলাভে সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া দিব্যদর্শন লাভ করে? অথবা মানবমনের বহুকালসঞ্চিত কুসংস্কাররাজি কল্পনা সহায়ে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছায়াময়ী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং আপনাকেই আবহমানকাল ধরিয়া প্রতারণা করিয়া আসিতেছে? প্রাণ এ সন্দেহ নিরসনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তীব্র বৈরাগ্যের অংকুর বালকমনে ধীরে ধীরে উদ্গত হইল। বিবাহ হইল, কিন্তু ঐ প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া সাংসারিক সুখভোগ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। নিত্য নানা উপায়ে মন ঐ প্রশ্ন সমাধানে নিযুক্ত রহিল এবং বিবাহ, সংসার, বিষয়বুদ্ধি, উপার্জন, ভোগসুখ এবং অত্যাবশ্যকীয় আহার-বিহারাদি পর্যন্ত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইল। সুদূর কামারপুকুরে যে বালকত্ব বিষয়বুদ্ধির পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বালকত্বই দক্ষিণেশ্বর দেবমন্দিরে নিতান্ত প্রস্ফুটিত হইয়া সেই বিষয়বুদ্ধির আরও অধিক উপেক্ষণীয় বাতুলত্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এ বাতুলতায় উদ্দেশ্যহীনতা বা অসম্বদ্ধতা কোথায়? ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিব, স্পর্শ করিব, পূর্ণভাবে আস্বাদন করিব, ইহাই কি ইহার বিশেষ লক্ষণ নহে? যে লৌহময়ী ধারণা, অপরাজিত অধ্যবসায় এবং উদ্দেশ্যের ঋজুতা ও একতানতা কামারপুকুরে বালক রামকৃষ্ণের বালকত্বে অভিনব শ্রী প্রদান করিয়াছিল, তাহাই এখন বাতুল রামকৃষ্ণের বালকত্বকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার করিয়া তুলিল।

দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রবল মানসঝটিকা বহিতে লাগিল। সে প্রাকৃতিক ভীষণ সংগ্রামে অবিশ্বাস সন্দেহ প্রভৃতির তুমুল তরঙ্গাঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনতরীর অস্তিত্বও সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বীরহৃদয় আসন্নমৃত্যুসম্মুখেও কম্পিত হইল না; গন্তব্যপথ ছাড়িল

না। ভগবদনুরাগ ও বিশ্বাস সহায়ে ধীর-স্থিরভাবে নিজপথে অগ্রসর হইল। সংসারের কামকাঞ্চনময় কোলাহল—লোকে যাহাকে ভাল-মন্দ, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্যাদি বলে—সে সকল কতদূরে পড়িয়া রহিল, ভাবের প্রবল তরঙ্গ উজানপথে উর্ধ্বে ছুটিতে লাগিল। সে প্রবল তপস্যা, সে অনন্ত ভাবরাশির গভীর উচ্ছ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবলিষ্ঠ দেহ ও মন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নূতন আকার—নূতন শ্রী ধারণ করিল। মহাসত্য, মহাভাব, মহাশক্তি ধারণ ও সঞ্চারের সম্পূর্ণাবয়ব যন্ত্র গঠিত হইল।

হে মানব! শ্রীরামকৃষ্ণের এ অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? তোমার স্থুল দৃষ্টিতে পরিমাণ ও সংখ্যাধিক্য লইয়াই পদার্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে সূক্ষ্ম-স্বার্থগন্ধ পর্যন্ত বিদূরিত করিয়া অহংকারকে সমূলে উৎপাটিত করে, যাহার বলে ইচ্ছা করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থ-চেষ্টা শরীর-মনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, সে শক্তির পরিচয় তুমি কোথায়ই বা পাইবে? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধাতু স্পর্শমাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের হস্ত যে আড়ষ্ট হইয়া তদ্ধাতুগ্রহণে অসমর্থ হইত; পত্র পুষ্প প্রভৃতি অপরের তুচ্ছ বস্তুও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহার বিনানুমতিতে গ্রহণ করিয়া নিত্যাভ্যস্ত পথ দিয়া আসিতে আসিতে যে তিনি পথ হারাইয়া বিপরীতে গমন করিতেন, গ্রন্থি প্রদান করিলে সে গ্রন্থি যতক্ষণ না উন্মুক্ত করিতেন, ততক্ষণ যে তাহার শ্বাস রুদ্ধ থাকিত, বহু চেষ্টাতেও বহির্গত হইত না, সুকোমল রমণীস্পর্শে তাঁহার যে কূর্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংকোচাদি হইত, এ সকল শারীরিক বিকার যে পবিত্রতম মানসিক ভাবনিচয়ের বাহ্য অভিব্যক্তি, আজন্ম স্বার্থদৃষ্টিপটু তোমার চক্ষু তাহাদের কোথায় দর্শন পাইবে? তোমার দূরপ্রসারী কল্পনাও কি এ শুদ্ধতম ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়? ভাবের ঘরে চুরি করিতেই আমরা আজীবন শিখিয়াছি। যথার্থ গোপন করিয়া কোনরূপে ফাঁকি দিয়া বড়লোক হইতে পারিলে বা নাম কিনিতে পারিলে আমাদের মধ্যে কয়জন পশ্চাৎপদ হয়? তাহার পর সাহস। একবার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দশবার আঘাত করা অথবা অগ্নি-উদগারকারী তোপসম্মুখে ধাবিত হইয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণবিসর্জন,

এ সাহস করিতে না পারিলেও শুনিয়া তোমার প্রীতির উদ্দীপন হয়। কিন্তু যে সাহসে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবী ও স্বর্গের ভোগসুখ এবং নিজের শরীর ও মন পর্যন্ত জগতের অপরিচিত অজ্ঞাত অননুলব্ধ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সাহসের কিঞ্চিৎ ছায়ামাত্রও তুমি কি অনুভবে সমর্থ? যদি পার, তবে হে বীর, তুমি আমার এবং সকলের পূজনীয় মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি তুচ্ছ কথাসকল বা অতি ক্ষুদ্র কার্যসমূহও কি গভীরভাবে পূর্ণ থাকিত, তাহা স্বয়ং না বুঝাইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সমাধিভঙ্গের পরেই অনেক সময় যে তিনি নিত্যপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিসমূহের নামোল্লেখ ও স্পর্শ করিতেন অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য-বিশেষের উল্লেখ করিয়া ভক্ষণ-পানাদি করিবেন বলিতেন, তাহার গূঢ় রহস্য একদিন আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"সাধারণ মানবের মন গুহ্য, লিঙ্গ এবং নাভি সমাশ্রিত সূক্ষ্ম স্নায়ুচক্রেই বিচরণ করে। কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে ঐ মন কখনো কখনো হৃদয়সমাশ্রিত চক্রে উঠিয়া জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ময় রূপাদির দর্শনে অল্প আনন্দ অনুভব করে। নিষ্ঠার একতানতা বিশেষ অভ্যস্ত হইলে কণ্ঠসমাশ্রিত চক্রে উহা উঠিয়া থাকে এবং তখন যে বস্তুতে সম্পন্ননিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়া অপর কোন বিষয়ের আলোচনা তাহার পক্ষে অসম্ভবপ্রায় হয়। এখানে উঠিলেও সে মন নিম্নাবস্থিত চক্রসমূহে পুনর্গমন করিয়া ঐ নিষ্ঠা কখনো কখনো ভুলিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যদি কখনও কোনভাবে প্রবল একনিষ্ঠা সহায়ে কণ্ঠের ঊর্ধ্বদেশস্থ ভ্রূমধ্যস্থিত চক্রে তাহার গমন হয়, তখন সে সমাধিস্থ হইয়া যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার নিকট নিম্ন চক্রাদির বিষয়ানন্দ উপভোগ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়; এখান হইতে আর তাহার পতনাশঙ্কা থাকে না। এখান হইতেই কিঞ্চিন্মাত্র আবরণে আবৃত্ত পরমাত্মার জ্যোতিঃ তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। পরমাত্মা হইতে ঈষম্মাত্র ভেদ রক্ষিত হইলেও এখানে উঠিলেই অদ্বৈতজ্ঞানের বিশেষ আভাসপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই চক্র ভেদ করিতে পারিলেই ভেদাভেদ সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান হয়।

আমার মন তোদের শিক্ষার জন্য কণ্ঠাশ্রিত চক্র পর্যন্ত নামিয়া থাকে, এখানেও ইহাকে কোনরূপে জোর করিয়া রাখিতে হয়। ছয়মাস কাল ধরিয়া পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানে অবস্থান করাতে ইহার গতি স্বভাবতই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে, এটা করিব, ওটা খাইব, একে দেখিব, ওখানে যাইব ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাতে নিবদ্ধ না রাখিলে উহাকে নামান বড় কঠিন হইয়া পড়ে এবং না নামিলে কথাবার্তা, চলাফেরা, খাওয়া ও শরীররক্ষা ইত্যাদি সকলই অসম্ভব। সেই জন্যই সমাধিতে উঠিবার সময়ই আমি কোন-না-কোন একটা ক্ষুদ্র বাসনা, যথা তামাক খাব বা ওখানে যাব ইত্যাদি করিয়া রাখি, তথাপি অনেক সময় ঐ বাসনা বার-বার উল্লেখ করায় তবে মন এইটুকু নামিয়া আসে।"

পঞ্চদশীকার একস্থানে বলিয়াছেন, সমাধিলাভের পূর্বে মানব যে অবস্থায় যেভাবে থাকে, সমাধিলাভের পরে সমধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াও নিজের সে অবস্থা পরিবর্তন করিতে তাহার অভিরুচি হয় না। কেন না, ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর সকল বস্তু বা অবস্থাই তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বোক্ত প্রবল ধর্মানুরাগ প্রবাহিত হইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেভাবে চালিত হইত, তাহার কিছু-কিছু নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কার্যসমূহে পাওয়া যাইত, তার দুই-চারিটি উল্লেখ করা এখানে অযুক্তিকর হইবে না।

শরীর, বস্ত্র, বিছানা প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে জিনিসটি যেখানে রাখা উচিত, সে জিনিষটি ঠিক সেইখানে নিজে রাখিতে এবং অপরকেও রাখিতে শিখাইতে ভালবাসিতেন, কেহ অন্যরূপ করিলে বিরক্ত হইতেন। কোন স্থানে যাইতে হইলে গামছা বেটুয়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য ঠিক ঠিক লওয়া হইয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার কালেও কোন জিনিস লইয়া আসিতে ভুল না হয়, সেজন্য সঙ্গী শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। যে সময়ে যে কার্য করিব বলিতেন, তাহা ঠিক সেই সময়ে করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যাহার হস্ত হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, মিথ্যাকথন হইবার ভয়ে সে ভিন্ন অপর কাহারও হস্ত হইতে ঐ বস্তু

কখনও গ্রহণ করিতেন না। তাহাতে যদি দীর্ঘকাল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাহাও স্বীকার করিতেন। ছিন্ন-বস্ত্র, ছত্র বা পাদুকাদি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে সমর্থ হইলে নূতন ক্রয় করিতে উপদেশ করিতেন এবং অসমর্থ হইলে কখনো কখনো নিজেও ক্রয় করাইয়া দিতেন। বলিতেন, ওরূপ বস্তু ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয়। অভিমান, অহঙ্কারসূচক বাক্য তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হওয়া এককালে অসম্ভব ছিল। নিজের ভাব বা মত বলিতে হইলে নিজ শরীর নির্দেশ করিয়া 'এখানকার ভাব' 'এখানকার মত' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিষ্যবর্গের হাত-পা চোখ-মুখ প্রভৃতি শারীরিক সকল অঙ্গের গঠন, তাহাদের চাল-চলন আহার-বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্যকলাপও তন্ন-তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয়ের গতি, কোন্ প্রবৃত্তিরই বা আধিক্য ইত্যাদির এরূপ স্থির করিতে পারিতেন যে, তাহার ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। আমাদের বোধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-দুঃখাদি জীবনানুভবের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল, তাহাই উহার কারণ। সহানুভূতি ও ভালবাসা বা প্রেম দুইটি বিভিন্ন বস্তু হইলেও শেষোক্তের বাহ্যিক লক্ষণ প্রথমটির সহিত বিশেষ বিভিন্ন নহে। সেইজন্য সহানুভূতিকে প্রেম বলিয়া ভাবা বিশেষ বিচিত্র নহে। প্রত্যেক বস্তু ভাবিবার কালে উহাতে তন্ময় হওয়া তাঁহার মনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

ঐ গুণ থাকাতেই তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন এবং ঐ চিত্তের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও ঠিক ঠিক বিধান করিতে পারিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকত্ব-বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কতদূর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ শিক্ষাই যে পরে মনুষ্যচরিত্র-গঠনে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিষ্যবর্গও যাহাতে সকলস্থানে সকল

বিষয়ে ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার করিতে শিখে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক কার্যই বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিত্য উপদেশ করিতেন। বিচারবুদ্ধি বস্তুর গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া মনকে যথার্থ ত্যাগের দিকে অগ্রসর করিবে, একথা বার-বার বলিতে শুনিয়াছি। বুদ্ধিহীনের অথবা একদেশী বুদ্ধিমানের আদর তাঁহার নিকট কখনই ছিল না। সকলেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে যে, 'ভগবদ্ভক্ত হইবি বলিয়া বোকা হইবি কেন' অথবা 'একঘেয়ে হ'সনি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়, এখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব, অম্বলেও খাব এই ভাব।' একদেশী বুদ্ধিকেই তিনি একঘেয়ে বুদ্ধি বা একঘেয়ে ভাব বলিতেন। 'তুই ত বড় একঘেয়ে'—ভগবদ্ভাবের বিশেষ কোনটিতে কোন শিষ্য আনন্দানুভব না করিতে পারিলে এইটিই তাঁহার বিশেষ তিরস্কারবাক্য ছিল। ঐ তিরস্কারবাক্য এরূপভাবে বলিতেন যে, উহার প্রয়োগে শিষ্যকে লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে হইত। ঐ উদার সার্বজনীন ভাবের প্রেরণাতেই যে তিনি সকল ধর্মমতের সর্বপ্রকার ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'যত মত তত পথ' এই সত্য নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ফুল ফুটিল, দেশ-দেশান্তরের মধুপকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দিক হইতে ছুটিতে লাগিল, ফুল্ল কমলও রবিকরস্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া সকলকেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপণতার লেশমাত্রও করিল না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্পর্শমাত্রহীন ভারত-প্রচলিত কুসংস্কারখ্যাত ধর্মভাবে গঠিত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্ম-মধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত আস্বাদ জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? যে মহান্ ধর্মশক্তি তিনি সঞ্চিত করিয়া শিষ্যবর্গে সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে জলন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্বধর্ম-মতের অন্তরে এক অপরিবর্তনীয় জীবন্ত সনাতন ধর্মস্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ

পূর্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে ? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ু-সঞ্চরণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন-না-একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মানস-গোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি ভারত ভিন্ন দেশের ধর্মাচার্যেরা ধর্মজগতে যে একদেশী ভাব বিদূরণ করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-বালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্মমতসমূহের প্রকৃত সমন্বয়রূপ অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হইল—এ চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে ? হে মানব, ধর্মজগতে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের উচ্চাসন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া থাক ত তবে বল, আমরা এ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না ; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, নির্জীব ভারত তাঁহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্রিত—জাগ্রত এবং জগতের গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে—তাঁহার মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করায় নরও দেবকুলের পূজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র লীলাভিনয়ের কেবল আরম্ভমাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছে। তখন আমার বয়ঃক্রম কিঞ্চিন্ন্যূন চতুর্দশ বৎসর। তাহার পূর্বেই কলিকাতায় তাঁহার নাম প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল — তাঁহার উপদেশও কিছু কিছু পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গের ফলে ব্রাহ্মণ-সমাজ মাতৃভাবে ভগবদারাধনায় বিশেষভাবে প্রচলনের কথা, ব্রাহ্ম হইয়া যাঁহারা উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও তাঁহার নিকট যাতায়াতের ফলে আবার উপবীত গ্রহণের কথা, তাঁহার শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বসকল অতি সহজ ভাষায় সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রভৃতির কথা তাঁর জীবদ্দশায় আমার কানে আসিয়াছিল। কিন্তু তখন অল্পবয়সের দরুন এবং হৃদয়ে ধর্মসাধনার বিশেষ প্রেরণা না আসায় তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই নাই। এখন প্রায়ই মনে হয়, যদি তাঁহাকে একবারও অন্ততঃ দেখিতাম, তবে জীবন সার্থক হইত। এখনও অনেক বয়স্ক ব্যক্তির সহিত দেখা হয়, যাঁহারা তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, যদিও অনেকে তখন তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন নাই। তখন বুঝিতে পারুন বা না-পারুন, তাঁহারা যে দেবদুর্লভ মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়াই তাঁহাদিগকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে।

যাহা হউক, পরমহংসদেবের অদর্শনের ৪ বৎসর পরে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে মহাত্মা রামচন্দ্রের দর্শনলাভ করি ও তল্লিখিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহার জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হই। ক্রমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কথামৃতকার শ্রীম—) ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণের ও মহেন্দ্রবাবু বা মাষ্টার মহাশয়ের কৃপায় তদানীন্তন বরাহনগর মঠে স্বামী

বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্যান্য সকল সন্ন্যাসী ভক্তগণের সহিত পরিচিত হই। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য দেশ বিজয়ান্তে কলিকাতায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আগমনের পূর্বে তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্যলাভ হয় নাই।

তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগিগণ তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়া এবং নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদেরও অনেকে এই সংকল্প করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশসংক্রান্ত বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশের বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য। পাঠকবর্গকে এই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতে সাগ্রহে অনুরোধ করি। তাঁহার শিষ্য ভক্তগণের সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহাদের জীবন দেখিয়া ও কথা শুনিয়া এবং এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের ফলে আমি তাঁহার জীবন ও উপদেশের যে মূলকথা বুঝিয়াছি—তাহাই অতি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করিব।

এক কথায় যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনকথা বলিতে হয়, তবে বলিতে হয়, তিনি ঈশ্বর বৈ আর কিছুই জানিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তিনি মাঝে-মাঝে ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। সংসারের পড়াশুনা চালকলা-বাঁধা বিদ্যা জানিয়া পড়াশুনায় একদম মনোযোগী হইলেন না—তার পর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পূজারীর পদে ব্রতী হইয়া মার সাক্ষাৎদর্শন অথবা শরীরপাত—এই পণ করিলেন—ফলে জগদম্বার সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। শেষে এই দর্শন স্থায়ী করিবার জন্য উক্ত মন্দিরে যত সাধু-সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ আসিতেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রায় কাহাকেও তিনি গুরু করিতে বাকি রাখিলেন না—এইরূপে তিনি অদ্বৈতবাদী তোতাপুরী, তন্ত্রবিদ্ ভৈরবী ব্রাহ্মণী, রামভক্ত জটাধারী প্রভৃতিকে গুরুপদে বরণ করেন। ইহারা যাহা যাহা বলিতেন, তাহার খুঁটিনাটি সাধন কোনটিই তিনি অবহেলা করিতেন না, এক উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন—সাক্ষাৎকার। ধর্মকে তিনি

কেবল মতবাদ বলিয়া মনে করিতেন না—তাঁহার জীবনে একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল সাধন। ঈশ্বরদর্শনের বিঘ্ন কাম-কাঞ্চনাসক্তি ও অহঙ্কার দূরীকরণের জন্য তাঁহার টাকা মাটি—মাটি টাকা সাধনা, কালীবাড়ির কাঙালীগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন, অপরের পায়খানা সাফ করা প্রভৃতি সাধনার কথা প্রসিদ্ধ। এইরূপে তিনি ক্রমে জড়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়া ভাবরাজ্যে এবং পরে সর্বভাববিবর্জিত নির্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে পর্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। জগতের সৌভাগ্য যে, বহুকাল ধরিয়া অহরহঃ বাহ্য-জ্ঞানদৃশ্য অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও মায়ের ইচ্ছায় তাঁহার শরীরপাত হয় নাই। তাঁহার নিকট ঈশ্বরসাধনার মতমতান্তরের ইতরবিশেষ ছিল না—তাঁহার ইসলাম ও খ্রীষ্ট সাধনাও প্রসিদ্ধ।

আমার মনে হয়, মতমতান্তরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিব, এইরূপ অহরহঃ দৃঢ় চেষ্টার ফলেই তাঁহার জীবন একদিকে যেমন গভীর, অপরদিকে তেমনই উদার হইয়াছিল। তিনি যদি কিছু ঘৃণা করিতেন, তবে তাহা সংসারাসক্তি বা সাংসারিকতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না করিয়া ধর্মপ্রচার-কার্যে অগ্রসর হন নাই—অথবা বলা যাইতে পারে, ধর্মপ্রচার তিনি নিজে কখনও করিতে চান নাই—তাঁহাকে মন্ত্রজপ করিয়া সেই জগদম্বাই তাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া সেই জগদম্বাই তাঁহাকে যাহা বলাইয়াছেন, তিনি তাহাই বলিয়াছেন, তাই তাঁহার প্রত্যেক কথার জোর অত। অনেকে সাধনাবস্থায় তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিল—কিন্তু তাঁহার এই ঈশ্বরপ্রেমরূপ ব্যাধি যে লৌকিক চিকিৎসার অসাধ্য। তাঁহার এই সাধনাবস্থায় অনেক পণ্ডিত, সাধক, সিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ অশ্রুতপূর্ব সাধনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, শেষে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্তী ভক্ত সাধক-গণের সহিত তাঁহার পরিচয়ের ফলে হিন্দু সনাতন সমাজেও একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে কয়েকজন যুবক তাঁহার একেবারে অনুগত হইয়া সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিল।

তাঁহার উক্তিগুলি অতি সরল অথচ অতি গভীর। ঈশ্বরকে

যে-কোন নামেই ডাক না কেন, তাঁহাকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, কালী, শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, আল্লা বা গড্ যাহাই বল না কেন, ঈশ্বর সেই একই সচ্চিদানন্দ বস্তু— যেমন জলকে বারি, পানি, ওয়াটার, এ্যাকোয়া—যাহাই বল না কেন, উহা দ্বারা পিপাসাশান্তি অবশ্যই হয়।

আমবাগানে গিয়া পাতা গনিয়া লাভ নাই—আম পাড়িয়া খাইতে পারিলেই তৃপ্তি। তদ্রূপ শাস্ত্রের নানাবিধ বাদানুবাদে কিছুই হয় না —শাস্ত্রের সার কথা সচ্চিদানন্দকে সম্ভোগ করা, তাহাতেই সর্বশাস্ত্র-জ্ঞানের ফললাভ হয়।

ঈশ্বরের চাপরাস না পাইয়া প্রচারকার্য করা বৃথা—কারণ, কেহই তোমার কথা শুনিবে না, অথবা শুনিলেও তাহাতে বিশেষ কার্য হইবে না।

তিনি নিজে ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিকতাকে ঘৃণা করিতেন—কিন্তু বিশেষ অধিকারী ব্যতীত তিনি কাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন না। কেবল বলিতেন, ঈশ্বরকে জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা কর। যেমন যারা ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটে, তাহারা সেই সঙ্গে দশ রকম কার্য করে, কিন্তু সদা লক্ষ্য রাখে যে, হাতে ঢেঁকি না পড়ে। তদ্রূপ সংসারের সব কার্য কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে সদা লক্ষ্য রাখিও।

তাঁহার জীবন ও উপদেশ আলোচনা করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? ইহাতে আমাদের পরম লাভ – যে কোন ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি যে মতই বিশ্বাস করুন না কেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই সাধন-ভজন অনুষ্ঠান আছে। সকলকে তাঁহার দৃষ্টান্তে নিজ নিজ মতানুযায়ী সাধন-ভজন অনুষ্ঠানে বেশী করিয়া সময় দিতে হইবে। তাঁহার জীবন ও উপদেশে Conversion-এর (ধর্মান্তরের) কোন অবকাশ নাই। যদি কোনরূপ Conversion থাকে, তবে তাহা হৃদয়ের Conversion (পরিবর্তন)—আর অপরের হৃদয় পরিবর্তন করিতে গেলে নিজের হৃদয় পরিবর্তন বিশেষরূপে আগে হওয়া দরকার। সুতরাং সাধন-ভজনের দিকে আমরা প্রত্যেকে বেশী করিয়া ঝোঁক দিলে স্বতঃই উদার ভাব না আসিয়া

থাকিতে পারে না। কারণ, তখন আর অপরকে সমালোচনা করিবার সময় বা স্পৃহা থাকে না। হিন্দুকে মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই—শাক্তকে বৈষ্ণব করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। —দ্বৈতবাদীকে অদ্বৈতবাদী করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনানুসরণ করিয়া আজ হইতে আমরা সকলে বিশেষভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হই। যিনি একেবারে ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, তিনি যতটা পারেন, ততটা ত্যাগ করুন। সম্পূর্ণ কাম-কাঞ্চনত্যাগী হইতে না পারি, যতটা পারি, ততটাই আমাদের কল্যাণ।

যাঁহারা বলিবেন, অপরকে বুঝানই—অপরের সঙ্গে তর্ক-বিবাদ-বিসম্বাদ করাই আমাদের ধর্মের অঙ্গ, যে সকল কর্মকে আমরা কুকর্ম বলিয়া জানি, সেইগুলিই আমাদের ধর্মের অঙ্গ, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। তিনি চিরজীবন শিখিয়াই গিয়াছেন—বলিতেন, সখী, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। তাঁহাকে গুরু, কর্তা বা বাবা বলিলে তাঁহার কষ্ট হইত। তিনি তান্ত্রিক সাধনা রীতিমত করিলেও কি কখনও এক ফোঁটা মদ্যপান করিয়াছিলেন, অথবা স্ত্রী-জাতিকে জগজ্জননী ব্যতীত অন্যদৃষ্টিতে কখনও দর্শন করিয়াছিলেন? তিনি কথায় কথায় বলিতেন, সকলেই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক ঠিক চল্‌ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারও ঘড়ি ঠিক চলছে না—তাই সূর্যকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ঘড়ি ঠিক করিয়া লইয়া তবে চালাইবার মত করিয়া লইতে হয়। অথবা যেমন বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ, কিন্তু উহা ছাদে পড়িয়া নানা ময়লার সহিত মিশিয়া বিভিন্ন নলের মধ্য দিয়া পড়ে—তদ্রূপ যাঁহারা ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের দ্বারা তথাকথিত বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ লাভ করিয়া সকলেই এক কথা বলিয়া গিয়াছেন—কেবল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যেখানে যেমন প্রয়োজন—কোথাও কর্ম, কোথাও জ্ঞান, কোথাও ভক্তি—কোথাও দ্বৈতবাদ, কোথাও অদ্বৈতবাদের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে

—আবার অজ্ঞ কামনান্ধ জীব আমরা—আমাদের দুর্বলতা ও অজ্ঞতা অনুযায়ী তাহার মধ্যে নানা আবর্জনা মিশাইয়াছি। তাই বলি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' খুব সত্য কথা—কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়া আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা-প্রসূত কদাচারকে ধর্মের নামে চালাইবার চেষ্টা কখনও না করি।

আজকাল লোকে বলে, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক নানা সমস্যা রহিয়াছে—রামকৃষ্ণচরিত ও উপদেশ আলোচনা করিলে তাহার কিছু মীমাংসা হইবে বলিতে পার?—আমরা জোর করিয়া বলি, হাঁ, ভাল করিয়া বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলে সকল সমস্যারই মীমাংসা হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির মূলগত সমস্যা, স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার বিরোধ। যত দিন সমাজে স্বার্থপরতা অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিবে, ততদিন রাষ্ট্রগত ও সমাজগত নিয়মের যতই পরিবর্তন হউক না কেন, কিছুতেই মানুষের শান্তি নাই। বিদ্যার কথা বলিতেছ? সকলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—বিজ্ঞান (Science), কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি না, বিজ্ঞানবলে আমরা প্রকৃতির উপর যে সকল শক্তিলাভ করিতেছি—তাহার কত অপব্যবহার হইতেছে? তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় এই বলিয়া উপসংহার করিতে চাই—ঈশ্বরকে খোঁটারূপে ধরিয়া যত ইচ্ছা বন্-বন্ করিয়া ঘুর—প্রাণ ভরিয়া রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়াদির চর্চা কর—পতনের ভয় নাই। লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। তবে ইহাও বলিব যে, ঈশ্বর-প্রেম ব্যতীত—ধর্মের উন্মাদনা ব্যতীত—কেবল শুষ্ক নীতি-দ্বারা কখনও স্বার্থপরতারূপ ব্যাধির পূর্ণ উপশম হয় না।

ঈশ্বরপ্রেমিক বলেন—নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। তিনি দল বাঁধিয়া Social Service (সমাজের সেবা) করিতে যান না—জীবকে নারায়ণের মূর্তি জানিয়া তাহাদের সেবায় আত্মবিসর্জন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশ অনুসরণ করিতে পারিলে জগতে অপূর্ব সেবাধর্মের অভ্যুদয় হইবে এবং তাহাতেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া জগতে শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু ইহার জন্য

আমাদের প্রত্যেকের এই জীবন ও উপদেশের শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান করিতে হইবে।

শুধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতারবরিষ্ঠ বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়া শতসহস্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলে চলিবে না। যাঁহারা যথার্থ আন্তরিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও উপদেশ চর্চা করিবেন, তাঁহারা বাহ্যতঃ হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান—দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা নূতন মানুষ হইবেন—তাঁহারা নিজের অহংকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া ভগবানের প্রকাশ জ্ঞানে সকল সম্প্রদায়ের নর-নারী-সেবায় অগ্রসর হইবেন।

বর্তমান যুগে অল্পকাল পূর্বেই আমাদের সমক্ষে এই আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। আসুন, আমরা সকলে তাঁহার জীবন ও উপদেশ চর্চা করিয়া ও যথাসাধ্য জীবনে পরিণত করিয়া নিজেদের সার্থক করি।

কুল! কুল! কুল!—

জলকলমসংঘর্ষণ-সঞ্জাত—উহা কি শুধুই কল্লোলধ্বনি! ঐ ভাগীরথী-বীচি-বিক্ষোভজনিত কুলু-কল্লোল নিনাদ। কুল! কুলু! কুলু! প্রবাহিত সলিলধারা পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া কি ঐ তরঙ্গোত্থিত কল্লোলগীতিকে মৃদু মধুর আলাপনের মত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কুল! কুল! কুল!—

জাহ্নবীসলিলপ্রবাহ সেই ভাগবতী স্বীকৃতি-বাণীকেই কুলু কল্লোলে পরিব্যক্ত করিতেছে। কি সে-কথা! কেমন সে-কাহিনী! বৈকুণ্ঠলোকের কোন্ অমৃত বারতা মর্ত্য ভুবনের এই বারিপ্রবাহে সমীরিত হইতেছে! কোন্ এক অনাদি যুগে বিষ্ণুপদসম্ভূতা ভাগবতী ধারা মুক্তির অভয় বারতা বহন করিয়া আনিয়াছিল! আজ জননী জাহ্নবী বঙ্গের শ্যামল বুকের উপর দিয়া বহিতে বহিতে কোন্ ভাগবতী গীতি গাহিয়া যাইতেছেন।

কুল! কুল! কুল!—আমি আসিয়াছি! আসিয়াছি আমি! একদিন অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—আমাকে আমি সৃজন করিব—

তদাত্মানং সৃজাম্যহম্

আজ আমি আমাকে সৃজন করিয়াছি! মর্ত্যের মানুষী মূর্তি লইয়া প্রকটিত হইয়াছি! বহু বহুতর সুদূর অতীতে ভগীরথের মঙ্গলশঙ্খ-নিনাদে বিগলিত হইয়া গোমুখীমুখ-প্রপাতে এই মৃত্তিকার ধরণীতলে ঝরিয়া পড়িয়াছিলাম। অন্যদিন কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য বাজাইয়া মানবের সহিত মানবী লীলা করিতে করিতে স্বীকৃতিবাণী ঘোষণা করিয়াছিলাম।—আমি আসিব। আমি আমাকে সৃজন করিব। আজ সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলাম।

কুল! কুল! কুল! ভাগীরথী-জল-কল্লোলের উহাই যুগ-বিঘোষণা! কে আসিয়াছ—তুমি দেবতা! কোন্ মূর্তিতে আসিয়াছ—যুগপ্লাবন! তোমার স্বরূপের পরিচয় বেদবেদান্তবেদ্য! কিন্তু এই যুগ-প্রত্যূষে তোমার রূপের পরিচয় কি নিত্য সনাতন? আজ তুমি কে ও কি?

ভাগীরথীর তটসৈকতে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়িয়া পড়িতেছে! এই জাহ্নবীপ্রবাহধারা সেই ভাগীরথী-প্রবাহিনী সেই ভাগবতী ভাবের বিগলিত মর্ত্য মূরতি! আর, আর ঐ পুলিনতটে এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-মূর্তি! অন্তরে যে আশা, কণ্ঠে যে ভাষা, তাহা যুগ-বিপরীত! ঐ নিঃস্ব নিরবলম্ব ব্রাহ্মণ জাহ্নবীতীরে বসিয়া একান্তে জলকল্লোলের সহিত কহিয়া যাইতেছেন—টাকা—মাটি! মাটি—টাকা! ইনিও শাশ্বত সনাতন পুরুষ! সেই পরম সত্তার মানুষী মূর্তি!

ভাগীরথীর তট-উপান্তবর্তী 'টাকা মাটি' সাধনায় সমাহিত ঐ মানবরূপী দেবতা, উনিই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ!

প্রথমেই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, ইহা কেমনতর আবির্ভাব! অর্থকে একমাত্র পরমার্থ মনে করিয়া যখন অর্থের মহা আড়ম্বরে সম্পূজন চলিতেছে, তখন প্রাচীনতার প্রতীক ঐ উন্মুক্তকায় ব্রাহ্মণ এ কোন্ অভিনব তত্ত্বের তপস্যা করিতেছেন? ইহা কোন্ অনাসৃষ্টি? টাকা মাটি! যে যুগে মানব-জীবনের যাবতীয় কিছুকে বিত্ত-বৈভবের উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিবার অতি উগ্র আয়োজন এবং প্রচেষ্টা, তখন জাহ্নবী-তটবর্তী ব্রাহ্মণ এ কোন্ সাধনায় সমাহিত?

ভারতবর্ষে—সাধু, সন্ন্যাসী, ত্যাগী, মুমুক্ষু ইঁহাদের কোনই অভিনবত্ব নাই। ভারতের সমীরণ-হিল্লোলে বৈরাগ্যের মন্ত্র উদ্গীত হইতেছে। তাহার আকাশে মুক্তির সাধ বিথারিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি ধূলিকণিকাটি পর্যন্ত সন্ন্যাসের সাধনায় সমাহিত। সেই জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কেবলমাত্র নব যুগের একমাত্র ত্যাগী মুমুক্ষু বলিলেই তাঁহার সম্পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হইবে না। উহা তাঁহার খণ্ড পরিচয়েরও খণ্ডাংশ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব এবং তাঁহার জীবনাবদান বা তপস্যাকে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে

হইলে বর্তমান যুগের মানসিকতাকেও অনুধ্যান করা প্রয়োজন হইবে।

আধুনিক যুগটি বড় উপাসক যুগ। দুর্বার ভোগাকাঙ্ক্ষাই বর্তমান যুগের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। এই অপরিমেয় ভোগলিপ্সার নাম আসুরিক দুষ্প্রবৃত্তি। আসুর মনোভাব কেবলমাত্র উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; এই উপভোগের দুষ্পূরণীয় লালসার বশে সে ক্রমশঃ জড়োপাসক হইয়া পড়ে। অতীত আসুরিকতার দিনেও এমনি হইয়াছিল, অদ্যও এমনি হইয়াছে। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু জড়জাগৃতির অহঙ্কারে হরিবিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। দশস্কন্ধ রাবণ সাক্ষাৎ ভগবতীকে অপহরণ করিয়া অশোকবনে চেড়ী-নিপীড়িতা করিয়াছিল। আর সেই প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক পূর্বযুগে অসুর জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া এই অশুচি ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিল—ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি।

ইতিহাস পুনরাবর্তন করে। সেই পৌরাণিক দিনের আসুরিকতাই আজ রূপান্তরে একটা যুগমূর্তি প্রকটিত করিয়া তাহার আধুনিক আসুরলীলা উপভোগ করিতে চাহিতেছে! উহারই নাম বর্তমান দিনের জড়তান্ত্রিকতা। আধুনিক সভ্যতা বর্তমান দিনের জীবনভঙ্গিমা কেবলমাত্র জড়োপাসনা। সেই পৌরাণিক আসুরিকতা নব্যরূপে নবতর ভঙ্গিমায় অদ্যকার এই জড়-সম্পূজক সভ্যতা!

এই জড়পূজা সৃষ্টির বিষ। মন্থন উদ্বেজিত সেই পুরাকালের আসুরকুলের বিমন্থনেই যে মথিত সিন্ধুবক্ষ হইতে গরল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে; অদ্যও তাহা হইতেছে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও বর্তমান সভ্যতা-সম্ভূত হলাহলে বিশ্বমানবতা প্রপীড়িত। কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্ববিধাতার। তিনি আসুরিকতার নিরসন করিয়া এই নিখিল সংসারকে কল্যাণ-সংরক্ষিত করেন। বিশ্বজননী চণ্ডিকারূপেও তিনি দেবভাবাপন্ন মানবকে আশ্বাস দিয়াছেন:

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥'

আবার পার্থ-সারথিরূপে পাঞ্চজন্য বাজাইয়াও সমাশ্বাস-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন :

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'

বর্তমান জড়ভাবাপন্ন যুগে যে দেবতাটিকে নরদেহ ধারণ করিয়া জাহ্নবীতটে টাকা মাটির তপস্যা করিতে দেখিয়াছি, তিনি যুগব্যাধির প্রশমনকারী। তাই তাঁহার ঐ অভিনব সাধনা টাকা মাটি! জড় উপাসক সভ্যতা যখন জড়ের উপাসনা করিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাহার প্রতিযোগী সাধনা আরম্ভ করিয়া জড়পূজার অবসান ঘটাইলেন। তাই সেদিন দেখিয়া ধন্য হইলাম—ঐ টাকা মাটির তপস্যা!

কিন্তু ঐ বৈরাগ্যমূলক তপস্যাটিই ত সর্বস্ব নহে! জড়ের ঊর্ধ্বে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা না থাকিলে, সেই চৈতন্য জাগ্রত জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষীভূত না হইলে জড়কে ত উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। যেখানে সেই পরম চৈতন্যের অনুভব নাই, সেখানে জড়-সমাশ্রয়। তাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিন্ময়ী জগন্মাতার উপাসনায় আত্মসমাহিত দেখিতে পাইলাম। এই চিন্ময়ী জননী একান্ত চিৎমাত্র সত্তা নহেন, মৃন্ময়ী মূর্তির অভ্যন্তরে চিন্ময়ী জগজ্জননীকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিয়া প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে সেই আর্য-যুগের ঋষির মতই ঘোষণা করিলেন —জড় কই! মৃন্ময়ী প্রতিমা কই! এ যে আমার চৈতন্যময়ী মা! আর্য-ঋষিও প্রজ্ঞার তৃতীয় দৃষ্টি লইয়া বলিয়াছিলেন :

'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'

বৈষ্ণব ভক্তেরও অপরোক্ষ অনুভূতি :

'যাঁহা যাঁহা নেত্রপরে
তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে!'

জড়—কোথায়, সকলেই যে চৈতন্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর আজ পুণ্যক্ষণ। অধুনা দিনের সভ্য

মানবতা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলি বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই অধ্যাত্মযজ্ঞের দ্যোতনা কি? ইহা কি বীরপূজা (Hero worship)? না মনীষার প্রতি সম্ভ্রম-নিবেদন? এই রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কি এবং তাহা কোন্ কারণসম্ভূত, তাহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আর একটু প্রাক্‌দিনের ইতিহাস-কথা আলোচনা করিতে হইবে। সে-কথা বিবেকানন্দ-সৃষ্টির কাহিনী।

বিবেকানন্দ—যে বিবেকানন্দকে গৈরিক উত্তরীয়-মণ্ডিত জড় সভ্যতা-দর্পিত চিকাগো মহানগরীর ধর্ম মহাসভায় জলদনির্ঘোষে ভারতের অধ্যাত্ম-সভ্যতা প্রচারণায় ব্রতী দেখিয়াছি, সেই বিবেকানন্দ নহেন। যে বিবেকানন্দ ভক্তি-আকুলিত কণ্ঠে আকুতি-মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন, 'ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর।' সেই বিবেকানন্দও নহেন। যে বিবেকানন্দ সন্ন্যাস-জীবনে উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন:

'বল, ওঁ তৎ সৎ ওম্।'

সেই অধ্যাত্মপন্থী বিবেকানন্দও নহেন। সেই প্রাক্‌দিনের নরেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী সদস্য, প্রতীচ্য দর্শন এবং চিন্তা-প্রণালীতে সুশিক্ষিত বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ ছিলেন আধুনিক সভ্যতা-সাধনার প্রতীক। ভারতীয় অধ্যাত্ম পন্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি প্রতীচ্যের জড়চিন্তা ও সভ্যতা সাধনার পথানুগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যুগধর্ম-প্রবর্তনার সুনির্দিষ্ট পাত্র ছিলেন। তাই, ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের নিকট যখন অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার কোনও অনুভবগম্য যুক্তি না পাইয়া দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণতলে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই যুগসমুদ্বর্তী, যুগদীপ্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে প্রসন্ন হাস্যে অভয় অমৃতায়মান কণ্ঠে কহিলেন,—

'হাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। যেমন তোকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ঠিক তেমনই তাঁহাকে দেখিয়াছি।'

এই দিন, এই ক্ষণ, যুগ ধন্য হইল! যুগের মোহনিশা অবসান হইয়া মঙ্গল উষা বিরঞ্জিত হইয়া উঠিল! আসুরিক যুগ অবসানের শেষ

শয্যা আশ্রয় গ্রহণ করিল। চিকাগো ধর্ম মহাসভার দিন ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিকতা জয়যুক্ত হয় নাই, হইয়াছে সেইদিন—যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপার্শ্বে জড়-ভাবাচ্ছন্ন বিবেকানন্দের প্রজ্ঞা-দৃষ্টি উন্মোচিত হইয়াছিল। শতবার্ষিকীর শুভ সমারম্ভও সেইদিন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম কৃপায় বিবেকানন্দ প্রজ্ঞা-দৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহার প্রথম স্পর্শে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চঞ্চল হইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, "এ কি করিলে ঠাকুর। আমার যে মা ও ভাই-বোন আছে।" এই আর্ত আকুলতা জড়ের সহিত সম্বন্ধ-ছেদন জন্য। বর্তমান মানব মাটিতেই জড়াইয়া এবং ছড়াইয়া থাকিতে একান্ত আকুলিত।

এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই হইয়াছিল—যেদিন বিবেকানন্দ জড় বুদ্ধি, জড় চিন্তা, জড় অনুভবের বন্ধনমুক্ত হইয়া দিব্য সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র প্রাক্-জীবনকে আধুনিকতার প্রতীক বলিলে যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। স্বামীজীর চিত্ত-মনে ছিল সংশয়, সন্দেহ ছিল ইতস্ততঃতা!—জড় না চৈতন্য! মূর্তি না নিরাকার! অধ্যাত্ম না অধিভূত! দোদুল্যমান চিত্ত!—সত্যই কি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ দর্শন এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতামুখে কহিয়াছেন—সংশয়াত্মা বিনশ্যতি! সেই সংশয়-প্রপীড়িত বিবেকানন্দ নিঃসংশয় প্রত্যয় লাভ করিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শে। এবং এইদিনই শতবার্ষিকীর সমারম্ভ।

পরম ভাষ্যকার শ্রদ্ধা-বিগলিত কণ্ঠে কহিয়াছেন:

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্॥"

এই ভাগবতী কৃপা প্রত্যক্ষীভূত হইল চিকাগো ধর্ম মহাসভায়। ধর্ম মহাসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে বিবেকানন্দ আমেরিকায় উপস্থিত হন নাই। তাঁহার পরিচয় মাত্র ছিল না, বক্তারূপে বা বিধুবশ্রেষ্ঠরূপে তাঁহার কোনরূপ খ্যাতি পূর্বে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু সেই অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক, সেই মুণ্ডিতশীর্ষ গৈরিক বাসপরিহিত তরুণ, সেই

রামকৃষ্ণের মানস সন্তান, সেই ভাগবতী ভাবধারা প্রবাহের যোগ্যতম নিমিত্ত, অধুনা বিশ্বের প্রখ্যাতনামা মনীষীমণ্ডলীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, যখন মাত্র সাধারণ কয়েকটি কথা—“আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ—Sisters and brothers of America” উচ্চারণ করিলেন, তখন সেই মহতী সভায় এক বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল। কি যে হইল, কেহ কিছু বুঝিল না, ভাবিবার অবকাশ পাইল না, কোন্ মহতী বাণী তাঁহাদের কর্ণে নিনাদিত হইল! কিন্তু আনন্দ ও উৎসাহের আতিশয্যে সেই বিরাট জনসমুদ্র উথলিয়া আলোড়িয়া উঠিল।

ইহাই মূকং করোতি বাচালম্। রামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—‘প্রভুর কৃপা’। ইহা কল্পনার নহে, বুদ্ধিবিচারের বিষয়বস্তু নহে, একেবারে প্রত্যক্ষ প্রকট। বিবেকানন্দ এমন কি মহৎ কথা, এমন কি নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, সেই ধীমান্, চিন্তাশীল, বিদ্বান-মণ্ডলী এমন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন? আজ স্বামীজীর আমেরিকা-বক্তৃতার বিয়াল্লিশ বৎসর পরে ধীরে-সুস্থে চিন্তা করিবার অবকাশ পাইয়া বলিতেছি— উহা শ্রীভগবানের কৃপায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাগবতী-শক্তি উদ্বোধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারই জন্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীতে একটা সম্বর্ধনার সমারোহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ভাষণার সর্বস্ব নহে। জড়ের মাঝে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের ইহাই চরম ও পরম কথা। যে যুগ তাহার জড়সর্বস্বতা লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, উহা আমাদের প্রজ্ঞাহারী। বিশ্বের সর্ব কিছুকেই আমরা জড়মণ্ডিত দেখিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, এই জগৎব্রহ্মাণ্ড নীহারিকা—Nebula-সঞ্জাত। ভাবিয়াছিলাম, জড় হইতেই প্রাণোৎপত্তি! কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে সেই পরম চৈতন্যসিন্ধুরই বীচিবিক্ষোভ মাত্র, ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অজ্ঞতার অন্ধতামসলোকে নিরুদ্দেশ যাত্রা

করিয়াছিলাম। তাহার ফলেই বর্তমান মানবের এই ভয়াবহ দুঃখবহ, এই অশান্তি-উৎপীড়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জড়পরায়ণতার মাঝে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বমানবের শান্তির পথ অমৃতের সরণি প্রশস্ত করিয়া দিলেন, এবং ইহার বীজপ্রক্ষেপ বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের তৃতীয় দৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যা! ঐ মন্দিরে আজ রাত্রে মায়ের কাছে যা চাহিবি, তোর তাহাই লাভ হইবে।' বিবেকানন্দ মৃন্ময়ী জগন্মাতার সম্মুখে ধ্যানসমাহিত হইয়া যখন ঠাকুরের শক্তি সহায়ে সেই মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন আর ইহজাগতিক আর্তির কথা কহিতে পারিলেন না। লোকায়ত ভোগ-কামনাকে পরিহার করিয়া মুক্তি-কামনাকেই স্বীকার করিয়া লইলেন। সেই প্রাক্-পৌরাণিক যুগের যম-নচিকেতা অভিনয়ের পুনরভিনয় হইল। প্রেম-কামনা পরিহার করিয়া প্রেম-কামকে অস্বীকার করিয়া আধুনিক জগৎকে প্রবোধিত করা হইল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করিয়া এই ভোগসর্বস্ব যুগে পুনরায় যে বৈরাগ্যের বিজয়কেতন উড্ডীন হইল, ইহার কারণ, ঈশ্বরসান্নিধ্য জন্য প্রেয়-বুদ্ধির উদ্বর্তন। ঠাকুর ইহাই করিয়া গিয়াছেন। ইহা সুসিদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহার অবতরণ। আশ্চর্যের কথা, যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ভোগরাগ পরিহারপূর্বক ত্যাগের গৈরিক বস্ত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই পণ্ডিত চতুষ্পাঠীর সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত সেকেলে মনোবৃত্তিসম্পন্ন নহেন। উঁহারা প্রত্যেকেই বর্তমান জগতের প্রামাণ্য এবং সম্মানিত শিক্ষায় সুশিক্ষিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে গুরু বলিয়া অঙ্গীকারের অর্থ প্রতীচ্য সভ্যতার জড়বাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া অধ্যাত্ম-সভ্যতার বরণ। বিবেকানন্দের এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ সেই ঋষিযুগের সেই শ্রেয়ঃ-মানসিকতার—

'যেনাহং নামৃত স্যাম
কিমহং তেন কুর্য্যাম্'

অনুসরণ। আর ইহা একটি অপ্রবুদ্ধ সংস্কারবশে হয় নাই, হইয়াছে চৈতন্যের দিব্য সাক্ষাৎকারে।

আজও যে শতবার্ষিকী উৎসব, ইহাও মাত্র অনুষ্ঠান নহে। ইহাও শরণাগতি। এই অনুষ্ঠানের মর্ম-কাহিনী—

'শিষ্যস্তেঽহং শাধিঃ মাং ত্বাং প্রপন্নম্'

সমগ্র প্রতীচ্য খণ্ড, আমেরিকা, প্রাচ্য য়ুরোপ অধুনাদিনের নিখিল মানবতা যে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন, ইহার কারণ, আসুরিক প্রেয়-বুদ্ধিকে পরিহার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতরণ মাহাত্ম্যে শ্রেয়-পন্থাকে আশ্রয় ও অঙ্গীকার করিতে চাহিতেছে।

ইহাই সেই আত্মসৃজন। সৃজন অর্থ শুধু আকার পরিগ্রহ করা নহে। প্রতি মননে আপনাকে আকারিত করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্বর্ধনা বা পূজা করিবার অর্থ—ভাগবতী ভাবধারাকে অঙ্গীকার করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাষ্ট্রিক অতিমানব বা Superman হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের কোনই ভাগবত সার্থকতা থাকিত না। কিন্তু টাকা মাটির তপস্বী, একেবারে ঈশ্বরনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্বর্ধনা কিম্বা পূজা ঈশ্বর-আনুগত্যেরই প্রকারান্তর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জড় অধ্যুষিত জগতে চৈতন্যের দিব্য বিভূতি। আর এই ভাগবতভাবুকতা তিনি সর্বপ্রথমে বিবেকানন্দরূপ ক্ষেত্রে উপ্ত করেন; এই যে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব, বস্তুতঃ ইহা বিবেকানন্দ-প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব, আর বিবেকানন্দ সেই পরমতত্ত্ব-প্রসূত ভাগবতী তরঙ্গ-ভঙ্গ। তিনি পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর প্রবাহধারার মত জড়ভাব ভস্মীভূত অন্ধকার জগতে প্রবাহিত হইয়া প্রাণের স্পন্দন ঘটাইয়াছেন। সেই উদ্বোধিতপ্রাণ আজ কৃতকৃতার্থ হইয়াই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বিবেকানন্দ-জীবনে। বিবেকানন্দ ঠাকুরকে যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ শ্রীরামকৃষ্ণধ্যান। স্বামীজী তাঁহার দেবগুরুকে যেভাবে ধ্যান

ও জ্ঞানগোচর করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।—স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যানে বলিতেছেন :

'কালবশে সদাচার-ভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহু-বিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, অনন্ত ভাব-সমষ্টি—অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুমতে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান, আপাত প্রতীয়মান বহুধাবিভক্ত, সর্বথা বিপরীত আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, তাহা দেখাইতে – এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্ব দৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।'

এই বিবেকানন্দের প্রাক্-জীবন ভারতীয় ভাগবত ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পথচারী, নিরাকার উপাসক, প্রতীচ্যের মুক্তিবাদে দীক্ষিত বিবেকানন্দ। একদিন তিনি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতেই অভিযান করিয়াছিলেন। এই বিবেকানন্দ অন্যদিন অকুণ্ঠ-কণ্ঠে বলিলেন—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ! প্রাগৈতিহাসিক বহু পূর্বে পৌরাণিক যুগে একদিন তিনি একান্ত স্থূল স্ফটিক-স্তম্ভ ভেদ করিয়া আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন, আজও বিবেকানন্দের বুকে জাগ্রত হইয়া তিনি সেই পৌরাণিকী লীলারই পুনরভিনয় করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতী ধারা। জড়ত্বে জীবন সঞ্জীবিত করাই

তাঁহার অবতরণ-অবদান। ভারতবর্ষের সহিত সমভাবে—বরং কিছু অধিকতর উৎসাহে শতবার্ষিকী সমারোহে প্রতীচ্যের যোগদান ব্যাপারে জড়ভাবের নরক-বহ্নিতে ভস্মীভূতের জীবন উদ্দীপনাই কি অভিব্যঞ্জিত হয় না—যে প্রতীচ্য মানব জড়পূজায় পুরাকালের অসুরকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, যাহার নারীজাতি মাতৃত্ব অঙ্গীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে একান্তই উৎসাহপরায়ণা, হিরণ্য-কশিপুর মত যাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান (Anti-God) করিয়াছে, তাহাদেরই অগ্রণী পুরুষগুলি কত নিগূঢ় অনুরাগে রামকৃষ্ণ-পূজায় অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতেই ত শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের মর্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নভোযানের আবিষ্কর্তা নহেন, ফোর্থ ডাইমেনস্যনের মত কোনও গাণিতিক তত্ত্বও গবেষণা করেন নাই, মাধ্যমিক সূত্র—Law of Gravitation-এর মত কোন জড়-জাগতিক নীতিও তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই; তিনি কবি, শিল্পী, পণ্ডিত—কিছুই নহেন, এমন কি, তিনি নিরক্ষর। এবং যে শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে বর্তমান দিনে কাহাকেও সভ্য-মানব বলিয়া গণনা করা যায় না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই প্রতীচ্য শিক্ষায় একেবারে অনক্ষর ছিলেন। অথচ সভ্যতা-স্পর্ধিত প্রতীচ্য মনীষা আজ সেই বর্ণজ্ঞানহীন দিব্য মানবের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে চাহিতেছে। দ্বাপরে যিনি কংসবধ করিয়াছিলেন, কলির যুগ-সন্ধ্যায় তিনিই কি রূপান্তরে কংসনিধন করিলেন না?

সাধুত্বের নিকষে কষিয়া আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনার পরিসমাপ্তি ঘটাইব না। আর্য-আধ্যাত্মিকতার বিচারে সেই দেব-মানবকে পরম ভক্ত বলিয়াই অভিহিত করিব। আমরা বলিব—গো ব্রাহ্মণ এবং জগদ্ধিতায় যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইনি তিনি। রামকৃষ্ণরূপী এই ব্রাহ্মণ-বিগ্রহ—তিনিই সেই পরতত্ত্ব পরমিহ! শতবার্ষিকী মঙ্গলবাসরে আমরা অকুণ্ঠ উদাত্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি—

'ষড়ৈশ্বর্য্যৈ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং।
ন রামকৃষ্ণাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥'

বিবেকানন্দসৃষ্টি এবং স্বামীজীর দ্বারা য়ুরোপখণ্ডে অধ্যাত্মবিজয়,—ইহাই ঠাকুরের এক অবতরণ-সার্থকতা, এমন কথা বলিতেছি না। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার উত্তরাধিকার আমরা তাঁহাকে অকুণ্ঠ-চিত্তে আমাদের পুরাতনী ভাবধারায় (Tradition) অনুপ্রাণিত হইয়া সেই দেবমানবকে পরতত্ত্ব পরমিহ বলিব ; কিন্তু সেই অনুভবের অপেক্ষা একটা বৃহৎ প্রামাণিকতা ও প্রতিষ্ঠা জড়বাদী, জড় সভ্যতার অনুগমনের দ্বারা তাঁহার সম্পূজন। য়ুরোপের অভ্যুদয়ের সহিত এই জড় ভাবুকতা ভারতবর্ষকেও আক্রান্ত করিতেছিল, আহারে-ব্যবহারে শিক্ষায়-দীক্ষায়, ভারতসন্তান অনেকেই প্রতীচ্য ভাবভাবাপন্ন হইয়া একটা অভিনব ঈঙ্গ ভারতীয় সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উক্ত অ-ভারতীয় জড়বিজিত সমাজও শ্রীরামকৃষ্ণস্পর্শে নবজীবন লাভ করিলেন। প্রতীচ্যের নিরাকার-মূলক সম্পদ উপাসনা একে একে পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিও ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইতে লাগিলেন। এমন না হইলে কাহার সাধ্য প্রতীচ্য শিক্ষার জঠরসম্ভূত বিবেকানন্দকে বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠা করে এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন—Europeanised, civilised, self-centred, semi-sceptical, so called educated reasoner-কে বিস্ময়ব্যাকুলিত করে! পরমতত্ত্ব না হইলে কাহার শক্তিতে বিশ্বভুবনজয়ী, ঈশ্বরের প্রতিযোগী সন্তান সমগ্র য়ুরোপ আমেরিকাকে রামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দের সামান্ত 'ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' এই কয়েকটি শব্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ অভিভূত করে! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই পরম শক্তি, একদিন যিনি ব্রাহ্মণবালকরূপে ত্রিপাদ ভূমিতে ভুবনত্রয় অধিকার করিয়াছিলেন। নহিলে কোন্ প্রচার, কোন্ প্রোপাগাণ্ডা, কোন্ সংগঠনী শক্তির দ্বারা এই রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে য়ুরোপ আমেরিকার—এই সেদিন মাত্র যে য়ুরোপ আসুর দর্পে গর্জন করিয়াছে—শ্বেত জাতিরা কৃষ্ণাঙ্গদের শাসন করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—মনীষীমণ্ডলী শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে যোগদান করিয়াছে। এই শতবার্ষিকী উৎসব কি বামনাবতারের ত্রিপাদভূমি অধিকারের যুগ-সংস্করণ নহে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হইতে পারেন পরমহংস। তিনি ত্যাগী, বৈরাগী, তিনি সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়কারী অপূর্ব সাধক। সর্বোপরি—তিনি পরতত্ত্ব পরমিহ—বেদ-মানব। তাই, সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার শ্রীমুখে যাহা সমীরিত করিয়াছেন, তাহাই বেদ, বেদান্ত, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। তাহা শ্রবণ করিয়া অদ্যকার শিক্ষা-সভ্যতা-স্পর্ধিত মানব ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

কুল! কুল! কুল! ভাগীরথীর প্রবাহমুখে যাহা তরঙ্গিত হইতেছে, এতক্ষণে তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। কুল! কুল! কুল!—আমি আসিয়াছি! আমি ভাগীরথীর সৈকততটে বসিয়া যে টাকা মাটির তপস্যা করিতেছি,—উহা তোমাদেরই উদ্ধার-ব্রত! টাকা মাটি—ইহা সেই বৈদিকবাণী—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। আর, মৃন্ময়ী প্রতিমায় যে জগন্মাতা চিন্ময়ীর সন্দর্শন, উহা সেই বেদান্তবোধি —সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—যুগসমুদ্ধর্তা আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ!

কুল! কুল! কুল!—আমি আসিয়াছি!

আমার মত কতকটা তোমাদের বলতে চেষ্টা করব। একথা আমি বিশ্বাস করি যে, যুগে যুগে নতুন ক'রে ধর্মোন্মাদনা আসে। শিক্ষিত জগতে আজ তেমনি এক উন্মাদনা এসেছে। প্রত্যক্ষ যুগেই ধর্মজাগরণে অসংখ্য বুদ্বুদ জাগে। বুদ্বুদগুলো দেখতে একই রকমের। এদের পেছনের আকাঙ্ক্ষাও একই রকমের। এ যুগে যে ধর্মভাব ভাবুকদের মধ্যে ক্রমে প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন চিন্তা-ঘূর্ণির উদ্দেশ্য এক—ভগবদ্দর্শন, তাঁকে দেখবার ও বুঝবার আকাঙ্ক্ষা। দেহগত, নীতিগত, ধর্মগত এবং সর্ববস্তু এক ক'রে দেখে অখণ্ড সত্তাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার একটা বাসনা যেন সবার মধ্যে জেগেছে। এ যুগের তাই সব আন্দোলন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অদ্বৈত বেদান্তের মহা দার্শনিক আদর্শের পথে চলেছে।

সর্বদাই বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন চিন্তা-বুদ্বুদের মধ্যে সংগ্রাম-সংঘাতে জয়ী হয় মাত্র এক বুদ্বুদ। অন্য সব বুদ্বুদ জাগে এক মহাতরঙ্গের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিতে। এই তরঙ্গ অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে সমাজে আনে প্লাবন।

যেসব দেশের কথা আমি জানি, ভারত, আমেরিকা বা ইংলণ্ড সব দেশেই দেখেছি, শত শত ভাবুকের মনে বিপ্লব এসেছে। ভারতে দ্বৈতবাদের অবসান হ'তে চলেছে, মাত্র অদ্বৈতবাদ এখানে করছে শক্তির প্রতিষ্ঠা। আমেরিকায় বহু আন্দোলন প্রবল হয়ে যাচ্ছে। এর সবগুলোতেই কম-বেশী অদ্বৈতভাব। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটিমাত্র অন্য সবগুলোকে গ্রাস ক'রে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠা করবে; কিন্তু এ কোন্ আন্দোলন?

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, শক্তিমানই বেঁচে থাকে। এই বাঁচার উপযুক্ততা চরিত্র-প্রতিষ্ঠা ছাড়া কি ক'রে হয়? চিন্তাশীল

জগতের ভাবটি ধর্ম যে হবে অদ্বৈত, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। জীবনে যারা চরিত্রবলে শক্তিমান হবে তাদেরই হবে জয়। হয়ত দেরি হতে পারে, কিন্তু হবেই।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার একথা একটু বলি, শোন। যখন ঠাকুর দেহ রাখলেন, তখন রইলাম কপর্দকহীন অজ্ঞাত আমরা জন-বারো যুবক। আমাদের বিরুদ্ধে তখন শক্তিমান বড় বড় কত প্রতিষ্ঠান। ওরা আমাদের উঠতেই মেরে ফেলবার কত-না চেষ্টা করেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ আমাদের একটা মস্ত সম্পদ দিয়ে গেছলেন—মাত্র কথা না ব'লে বাঁচার মতন ক'রে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় জীবন-মরণ সংগ্রাম করবার শক্তি। তাই আজ ভারত ঠাকুরকে চিনেছে, তাই ভারত আজ ঠাকুরকে ভক্তি করে। তাই আজ তাঁর শেখানো সত্য দাবানলের মতন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ বছর আগে তাঁর জন্মোৎসব করবার জন্য আমি একশোজনকেও জুটিয়ে আনতে পারিনি। গত বছর ৫০ হাজার লোক এসে জমেছিল।

তোমার ঐ সংখ্যা শক্তি, তোমার ঐ বিত্ত বিদ্যা বক্তৃতা কিছুই স্থায়ী হবে না, চাই পবিত্রতা, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা, চাই অনুভূতি। প্রত্যেক দেশে আপন শৃঙ্খলমুক্ত সিংহের মতন কেশরী চিত্ত অমন মাত্র বারোজন ক'রে মানুষ জাগুক; জাগুক তেমন বীর—যারা তাঁর স্বাদ পেয়েছে, জাগুক গুটি-কয়েক তেমন মানুষ—যাদের সমস্ত চিত্ত তাঁতে সমর্পিত হয়েছে; জাগুক তারা—যারা চায় না সম্পদ, চায় না শক্তি, চায় না যশ—দেখবে এরাই বিশ্ব কম্পিত ক'রে তুলবে।

কৌশল ত এই-ই! যোগদর্শনের স্রষ্টা পতঞ্জলি বলেছেন—মানুষ যখন অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তখনই তাতে হয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সে ভগবানের দর্শন পায়। সে স্বয়ং হয়ে যায় ভগবান। আর আপনি ভগবান হয়ে সে অন্যকেও করতে চায় ভগবান। এই কথাই আমি প্রচার করতে চাই। মতবাদের ব্যাখ্যা ঢের-ঢের হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকে পুঁথি লিখছে, কিন্তু অভ্যাস অনুশীলন একটু কি হবে না?

সমিতি-সংগঠন এসব আপনি আসবে। যেখানে হিংসার কিছু নাই,

সেখানে হিংসা জাগবে কি ক'রে? অসংখ্য লোক আমাদের ক্ষতি করতে চাইবে। কিন্তু ওতেই ত প্রমাণ হ'বে যে, আমরা চলেছি সত্য পথে। লোকে যতই আমায় বাধা দিয়েছে, ততই আমার শক্তি ব্যক্ত হয়েছে। আমায় একমুঠো খাবার দেয়নি, খেদিয়ে দিয়েছে; কিন্তু তারপর দেখেছি, রাজারাজড়ারা আমাকে চর্ব-চোষ্য খাইয়েছে, আমার পূজো করেছে। পুরুত ও সাধারণ সমভাবে আমায় তুচ্ছ করেছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ওদের সবারই ভাল হোক। ওরা আমারই আত্মা। ওরাই ত আমায় সাহায্য করেছে। ওদের থেকে বাধা না পেলে আমার শক্তি উঁচু থেকে আরও উঁচুতে চড়তে পেত না।

এক মহা রহস্য আমি আবিষ্কার করেছি—ধর্ম নিয়ে যারা ব'কে মরে, তাদের শঙ্কা করবার কিছু নেই। যারা সব বুঝেছে, তারাও কারু শত্রু নয়। বচনবাগীশ ব'কে মরুক। ওরা আর কি জানে। তারা নাম-যশ কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মত্ত থাকুক। আমাদের অনুভূতি অর্জন করতে হবে, ব্রহ্ম পেতে হবে, ব্রহ্ম হ'তে হবে, উঠে প'ড়ে লাগ। মরণ কবুল, সত্য ছেড় না। জন্ম-জন্ম সত্য ভাস্বর হয়ে উঠুক তোমাতে। অন্যে কি বলে, তাতে মোটেই কান দিও না। তারপর জীবনভোর চেষ্টায় একটিও—মাত্র একটিও বীর সংসারের শেকল ভেঙে মুক্ত হ'তে হবে, তবে আমাদের কর্তব্য শেষ—হরি ওঁ।

আর এক কথা। কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, ভারতকে আমি ভালবাসি। তবু প্রত্যহ আমার চোখ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আমাদের কাছে ভারত, ইংলণ্ড, আমেরিকায় ফারাক নাই। মূর্খতা যাকে ভুল ক'রে বলে মানুষ—সেই ভগবানের আমরা দাসানুদাস, যে গোড়ায় জল ঢালে, সে কি আর গোটা গাছকেই জল দেয় না?

সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের মূলে ঐ এক কথা —আমি আর আমার ভাই এক, অভিন্ন নই। এক কথা সর্বদেশে, সর্বজাতির পক্ষে সত্য। প্রাচ্যবাসীর চেয়ে পাশ্চাত্ত্যবাসী একথা শীগ্‌গির বুঝবে। প্রাচ্য ভাবসূত্র রচনা ক'রে আর গুটি-কয়েক সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্ম দিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

নাম-যশ চুলোয় যাক। অপরের উপর প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা দূর হোক। কাজ করে যাও। কাম-ক্রোধ-লোভের তিন বাঁধন থেকে মুক্ত হও, দেখবে সত্য তোমার নিত্য সঙ্গী।*

প্রত্যেক জাতিরই আছে বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি। কেহ রাজনীতি, কেহ বা সমাজনীতি, কেহ বা অন্য অন্য পথে কাজ করে। আমাদের পথ ধর্ম—এই ধর্মপথে ভিন্ন আমরা অন্যপথে চলতে পারি না।···এই ধর্ম হয়ে পড়েছিল বিপন্ন। মনে হয়েছিল, আমরা যেন জাতীয় জীবন হতে এই ধর্ম ছেঁটে ফেলতে চাই; মনে হয়েছিল, আমাদের অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড ফেলে দিয়ে তার স্থলে রাজনৈতিক মেরুদণ্ড বসাতে চাই। এটা সফল হলে আমরা পৃথিবী হতে লোপ পেয়ে যেতুম। আমাদের ধ্বংস নেই। তাই ধর্ম হলেন স্বপ্রকাশ। এই মহাপুরুষকে কি চোখে তোমরা দেখবে না-দেখবে, আমার তাতে কিছুই এসে যায় না, তাঁকে তোমরা কতটুকু শ্রদ্ধাভক্তি কর—তাতে কিছুই এসে যায় না, কিন্তু পরিষ্কার এই কথা তোমাদের মুখের ওপর বলে যাই, অদ্ভুত শক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ—এমনটি ভারতে বহু শতাব্দী ধরে হয়নি। তোমাদের কর্তব্য, এই শক্তির পরিচয় লওয়া; তোমাদের কর্তব্য, খুঁজিয়া দেখা ভারতের নব-জাগরণ ও কল্যাণ এবং ভারতের যোগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তিনি কি করে গিয়েছেন।···

আমাদের শাস্ত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ হল নিরাকার পুরুষ। ভগবানের কৃপায় এই আদর্শ অধিগত করবার মত উচ্চ আমরা যেন হতে পারলে কথাই ছিল না। কিন্তু এটা যেন সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন অগণতি নর-নারীর পক্ষে সাকার আদর্শই অপরিহার্য, জীবনের সাকার এইরূপ এক আদর্শের পতাকাতলে সাগ্রহে এসে যোগদান না করলে কোনও জাতি জাগতে পারে না, কোনও জাতি বড় হ'তে পারে না, কোনও জাতি বিন্দুমাত্র কাজ করতে পারে না। রাজনৈতিক আদর্শ

*জনৈক মার্কিন শিষ্যের নিকট লিখিত পত্র হইতে অনূদিত

অথবা রাজনৈতিক, এমন কি, সামাজিক বা বাণিজ্যিক আদর্শের কোনও ব্যক্তি ভারতে প্রভাব বিস্তার করতে পাববে না! আমাদের সম্মুখে চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ, শক্তিমান ধর্মগুরুদের ঘিরে আমরা পরম উৎসাহে সমবেত হতে চাই। আমাদের নেতাকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হ'তে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সেই গুরুরূপে আমরা পেয়েছি। আমার কথা বিশ্বাস কর, এই জাতি যদি জাগতে চায়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে তাকে সাগ্রহে সমবেত হতে হবে··· আর তিনি—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আমার জাতির কল্যাণের জন্য, আমার দেশের কল্যাণের জন্য, মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। আমরা চেষ্টা করি চাই না-করি, অভাবনীয় পরিবর্তন এদেশে আসবেই আসবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মহা-পরিবর্তনের জন্য তোমাদের অটল শক্তি প্রদান করুন, তোমাদের সত্যমণ্ডিত করে তুলুন।

জাহ্নবীস্রোতের উপর সুধাংশুর গলিত রজতধারার ঝিকিমিকি—তটে পুণ্য পঞ্চবটী—পঞ্চবটীর সিদ্ধপীঠে যোগাসনে ধ্যানমগ্ন ঋষি—সরল অপাপবিদ্ধ মাতৃমন্ত্রের সাধক মায়ের ছেলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ! বালকের মত আকুল আহ্বানে ডাকিতেছেন,—মা—মা! কৈ মা! কোথা মা!

এ মহান্ দৃশ্য সম্ভব কেবল আমার এই বাংলা মায়ের পুণ্য ক্রোড়ে। এ যে সাধনার পুণ্যভূমি, সাধকের তপোবন। যুগে যুগে সাধক ভক্তের পুণ্য স্পর্শে পবিত্র আমার এই স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমি!

জয়দেব, চণ্ডীদাস, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—বাংলার মাটিতেই এই আনন্দ-মেলার সম্ভব। বাংলার মাটিতেই সাধনা-ভক্তি-প্রীতি-আনন্দের মোহাগ্নি নিরবচ্ছিন্ন সূত্রাকারে প্রজ্বলিত হইয়া আসিতেছে। বাংলার মাটিতেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দে তাহারই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই মূর্তি দিয়াছিলেন, তাহাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া যুগ-মন্ত্রে আকন্যাকুমারী হিমাচল ধ্বনিত করিয়াছিলেন,—বন্দে মাতরম্!

শক্তির পূজারী মাতৃমন্ত্রের সাধক বাঙালীর আজ অপার আনন্দের দিন,—আজ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ শতবার্ষিকী—বাংলার ও বাঙালীর মহা পুণ্যতিথি! কেবল বাঙালীর নয়,—এই সাগরমেখলা ধরিত্রীর সর্বজাতির সর্বধর্মীরই আজ মহোৎসবের দিন। শতবর্ষ পূর্বে এমনই পুণ্যদিনে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে মহাপুরুষ যে মহাসাধনায় বসিয়াছিলেন, আজ তাহারই ফলে বিশ্বের মানব ধন্য হইতেছে। সংসার-সাহারায় চিরহরিৎ চিরকিশোর মরুদ্বীপের শীতলনির্মল অমিয়ধারার মত মহাপুরুষের যে পীযুষবাণী প্রবাহিত হইয়াছিল, আজ তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া মর্ত্যের মানুষ মৃত্যুজয়ী হইতেছে—মরণকেও ডঙ্কা মারিয়া মুক্তিধনের সন্ধান পাইতেছে। সেদিন সাধকের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত

হইয়াছিল অভয়বাণী,—ভয় কি তোদের, তোরা যে অমৃতের সন্তান। প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাক্।

সাধনায় ভগীরথ একদিন মর্ত্যে মন্দাকিনী বহাইয়াছিলেন, সাধনায় একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অজয়ের তটভূমি হইতে মণিপুরপ্রান্ত পর্যন্ত হরিনামে মাতাইয়াছিলেন, সাধনায় একদিন রামপ্রসাদ বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে মাতৃমন্ত্র মহাবীজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, —আর শতবর্ষ পূর্বে বাঙালীর রামকৃষ্ণ অঝোরে কাঁদিয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া ঘুমন্ত বাঙালীকে জাগাইয়াছিলেন. মাকে প্রত্যক্ষ চিনাইয়াছিলেন। সে আকুল আহ্বানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বিশ্বপ্রান্তে পৌঁছিয়াছিল, ভক্ত শিষ্য পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের গুরুবাণী-প্রচারে মানুষমাত্রেরই প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছিল,—সে আহ্বান ত শুধু বাঙালীর নহে। যতদিন জগতে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এ পুণ্যদিনের পবিত্র স্মৃতি মুছিয়া যাইবার নহে।

ছেলের মত আবদার করিয়া, অভিমান করিয়া, গালি দিয়া, জগজ্জননীকে বাঙালীর মত কে ডাকিতে পারিয়াছে? বাঙালীর জগজ্জননী ত দূর-সম্পর্কের অশরীরী প্রাণী নহেন, তিনি যে আপনার হইতেও অতি আপনার—অতি প্রিয়জন। 'আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'—এ সদম্ভ আবদারের আহ্বান বাঙালী দাশরথীই করিতে পারিয়াছিলেন। 'এবার কালী তোমায় খাবো'—এ ভয়ঙ্কর কথা বাঙালী রামপ্রসাদই বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। মায়ের পাগল ছেলে রামকৃষ্ণের দয়াতেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্রের পূজারী মহাপণ্ডিত বৈদান্তিকের মুখে মা-নাম ফুটিয়াছিল।

এ সাধনার দেশ। এ মাটির প্রতি ধূলিকণায়—জলবায়ুর প্রতি অণুপরমাণুতে সাধকের সাধনা, ভক্তের ভক্তি, তপস্বীর তপস্যা জড়াইয়া মিশাইয়া আছে। যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়,—সাধনা মূর্ত হইয়া উঠে। পুনরাগমনায়—আবার আসিব, ইহা ত এই পুণ্যভূমিরই মহৎ বাণী। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আমাকে সৃষ্টি করি,—শ্রীভগবানের

শ্রীমুখেই এই অভয় আশার বাণী ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধ্বনিতে হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপীঠে আমাদের মত মর্ত্যের মানুষের মধ্যে মানুষেরই মত, তাই ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল।

জগতে আসিল বিজ্ঞানযুগ—যন্ত্রযুগ—যুক্তির যুগ। দেখা দিল সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মে সংশয়, শাস্ত্রে অবিশ্বাস, যুক্তিতর্কের ক্রুর প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা (?) সহস্র ফণা বিস্তার করিল,—তাহার বিষের বিষে বিশ্বসংসার জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইতে লাগিল। তখনই কেলিকদম্ব হইতে যমুনাহ্রদে শ্রীভগবান্ ঝম্পপ্রদান করিলেন, সহস্রশীর্ষ কালীয় নাগের সহস্র ফণার উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটি একটি করিয়া বিষধর ভুজঙ্গের সহস্র ফণা ভাঙিয়া পড়িল নটবর চিরকিশোরের কমনীয় নৃত্যে। সংশয়, অবিশ্বাস, যুক্তি-তর্ক ক্রুর প্রশ্নের সহস্র শিরে নৃত্য—পাপের দলন, সকল সংশয়ের নিরসন।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবও ঐ কালীয়-দমনে সকল সংশয়, সকল অবিশ্বাস, সকল যুক্তিতর্ক, সকল ক্রুর প্রশ্নের সমাধানে। নিষ্পাপ সকল শিশুর মত কেবল 'মা!' 'মা!' বেদ-বেদান্ত নাই, বাইবেল-কোরাণ নাই, জেন্দা-আবেস্তা নাই; জোরোয়াস্তার কনফুসাস নাই,—কেবল স্বচ্ছ সরল শুভ্র মুক্তাবিন্দুর মত অমূল্য উপদেশের অমিয়ধারা, আর অন্তর্নিহিত সাংখ্য-বেদান্তের, গীতা উপনিষদের গভীর জ্ঞান!

মনীষী-পণ্ডিত-সাধক-ভক্ত সেই উপদেশের সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য কৃতার্থম্মন্য হইল, অবিশ্বাসীও 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। এমন সমন্বয় কে কবে কোথায় দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে? মহাপুরুষ কখনও ভক্তিভরে বাইবেল-কোরাণ নির্দিষ্ট সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কখনও তন্ত্র-বেদান্তের সাধনায় সমাহিত, কখনও বা অধ্যাত্ম রামায়ণের ভক্তির উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইতেছেন, আবার কখনও বা ভাগবত শুনিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছেন। শক্তি বৈষ্ণব শৈব ব্রাহ্ম শিখ বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান ইহুদী পার্শী,—সে

সাধনার অনুপ্রেরণা লাভে কেহ বঞ্চিত হইল না। এমন সর্বধর্ম-সমন্বয় এই বাংলার মাটির বাঙালী ভক্ত-সাধকের দ্বারাই সম্ভব হইল।

মাতৃমন্ত্রের পূজারী বাঙালী, আপদে-বিপদে মাতৃঅন্তপ্রাণ হইয়াও মাকে ভুলিতেছিল। সাধক রামপ্রসাদ তাহাকে বীজমন্ত্র স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাঙালীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, মাতৃনামের অক্ষয় কবচ বুকে বাঁধিয়া দিলেন, বাঙালী হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া ধন্য হইল।

পঞ্চবটীর সিদ্ধপীঠে সাধক মহাপুরুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, সংশয়ী মানুষকে মহামন্ত্র দিয়া যুগের প্রয়োজন সাধন করিয়া গেলেন। সে আজ অতীতের কথা, কিন্তু তাহার স্মৃতি কালজয়ী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন তাহার প্রত্যক্ষ ফল—তাহার প্রভাব পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে নাই, কোন্ মানুষ তাহার সেবা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয় না?

বাঙালীর কিছু নাই,—সে আজ রিক্ত, হতমান, অনাদৃত, লাঞ্ছিত,—কিন্তু তথাপি যদি তাহার গর্ব মান অহঙ্কার করিবার কিছু থাকে, তবে সে তাহার জয়দেব, চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। বাঙালীর যুগ-যুগের সাধনা বাঙালীর নিজস্ব। যতদিন বাঙালী সে ধারা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে, যতদিন বাঙালী তাহার সাধক মহাপুরুষের স্মৃতির পূজা করিতে সমর্থ থাকিবে, ততদিন বাঙালীর মান ইতিহাসের পত্রাঙ্কে নিকষরেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে।

আজ এই পুণ্যদিনে, এস বাঙালী! ভক্তিভরে জোড়করে মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিয়া বলি,—হে বিরাট! হে মহান্! আবার কবে আসিবে? আসিয়া তেমনই করিয়া পুণ্য তপোবনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে? কবে বাঙালী আবার তোমার পুণ্যসংস্পর্শে ধন্য হইয়া প্রাণ ভরিয়া মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিবে? কবে বাঙালী আবার তোমার পুণ্য পদব্রজে গড়াগড়ি দিয়া ধন্য হইবে?

গঙ্গার কূলে নবযুগের পবিত্র তীর্থভূমি দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে যুগপ্রয়োজনে যিনি নানা মতের সুকঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর দিয়ে বিভিন্ন ধর্মের চরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই সাধনসিদ্ধ দেবতা—যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবের আজ শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। তাই বিভিন্ন স্থানের মনীষীগণ সেই সমন্বয়-আচার্যকে স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে ধন্য ও পবিত্র হচ্ছেন। এই দেব-মানবের আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ ভারতের এবং জগতের প্রাণে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তা বিশেষ ক'রে স্মরণ করবার দিন আজ এসেছে।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় ইতিহাস আলোচনায় দেখতে পাই, সব দেশেরই জাতীয় জীবনের একটি বিশিষ্ট ভাবধারা রয়েছে, এবং তার উপরই সে-দেশের জীবন-মরণ সমস্যা নির্ভর করছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি এরূপ এক-একটি বিশেষ বিশেষ ভাবধারাকে আশ্রয় করেই সব দেশের জাতীয় জীবন জগতের সামনে মাথা উঁচু ক'রে বেঁচে থেকে তাদের শৌর্য বীর্য ও স্বাধীনতার পরিচয় দিচ্ছে। আবার দেখতে পাই, জাতি যখন তার জীবনের বৈশিষ্ট্যগত ভাবধারাটি ভুলে গিয়ে, একটা অনির্দিষ্ট অবিশ্বাসের মোহগহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ ক'রে পরানুকরণের ভেতর দিয়ে জীবনের তৃপ্তিকে খুঁজে পেতে চায়, আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে জাতীয়ত্ব-বোধকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে, দাসোচিত মনোবৃত্তি নিয়ে বিপথে ছুটে যায়, তার জীবন-প্রবাহের গতি ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে আসে, নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার সেদিন জাতির মনকে একেবারে নিবিড়ভাবে ছেয়ে ফেলে। জাতীয় জীবনের সেই চরম দুর্দিনে মানুষ একান্ত অসহায় হয়ে পড়ে।

ঠিক সেই সময়েই, জাতির মরণ-মুহূর্তে, তাকে আবার বাঁচিয়ে তোলবার জন্য,—নবীন উৎসাহের উজ্জ্বল আলো নিয়ে,—সম্মুখে

এসে দাঁড়ান জাতির ভাগ্য-বিধাতারূপে—নূতন এক নির্ভীক প্রবর্তক। তিনি মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রের মত জাতির জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চার ক'রে তার মোহাচ্ছন্নতা ঘুচিয়ে দিয়ে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে তোলেন, অবশ্য প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ভাবের ভেতর দিয়েই তাঁকে অগ্রসর হ'তে হয়। জাতি আপন বৈশিষ্ট্য-গরিমায় আবার বিশ্বের দরবারে উন্নত শীর্ষে এসে দাঁড়ায়। আজকের জগতে জার্মানীর হিট্‌লার, রুশিয়ার লেনিন্, চীনের সানইয়াৎসেন, ইতালীর মুসোলিনী, তুরস্কের কামাল পাশা—এঁদের কর্মময় জীবনধারাই—সেইসব জাতির ভাগ্য পরিবর্তন ক'রে দিয়েছে।

আরো একটি বিশেষত্ব দেখতে পাই, জাতির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য এই প্রবর্তকগণ সময়োপযোগী কতকগুলো বিশিষ্ট ভাবধারার নূতন আলোকে জাতিকে আলোকিত করেন, এবং জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য জেগে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই নূতন ভাবগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য জাতির প্রধান আদর্শটিকে আশ্রয় করেই অপর ভাবগুলি জাতির মনে প্রভাব বিস্তার করে।

এমনিভাবে আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ভারতের ভাগ্যাকাশেও দুর্ভাগ্যের দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল। অপর দেশের ন্যায় ভারতের জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট ভাবধারা হচ্ছে—ধর্মে; সেদিন এ জাতি তার আপন জীবনাদর্শ ধর্মকে ভুলে গিয়ে ইহকালসর্বস্ব শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে, জড়বাদের প্রহেলিকায় ধর্মের নামে পশুত্বকে এনে পূজার বেদীতে বসিয়েছিল, ভালমন্দের বিচার-বুদ্ধি গিয়েছিল লুপ্ত হয়ে, আর ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মত্ত, শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাম্ভিকতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, এবং প্রকৃত সত্য বা ধর্ম-উপলব্ধির আগ্রহ আর কারোরই ছিল না। চারিদিকে একটা তন্দ্রালু মোহাচ্ছন্নতা জাতিকে ঘিরে রেখেছিল, সেই সঙ্কট-মুহূর্তে নবযুগের অভ্যুদয়ের শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে স্বতঃ উৎসারিত বিধাতার অজস্র আশিস্‌ধারার ন্যায় নেমে এলেন যুগের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ। সময়ের প্রয়োজনে দক্ষিণেশ্বরের বেদীমূলে তাঁর

বিভিন্ন ধর্মের সাধনা আবদ্ধ হ'ল। প্রত্যেক পথের সূক্ষ্ম ভাবতত্ত্ব একান্ত শুচিতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত ক'রে কঠোর সাধনায় তিনি সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত পরমসত্য উপলব্ধি করলেন। বিবিধ শাস্ত্রের জটিলতার সমাধান নিজ জীবনে সুসম্পন্ন ক'রে অতি সরলভাবে তার সার-সত্য জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন। তাঁর সত্যোপলব্ধির পুণ্যদীপ্তিতে অগ্নিসাৎ হয়ে গেল ধর্মের নামে এতদিনের পুরানো সংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যাচারের জঞ্জাল। জড়বাদ-বিড়ম্বিত ভারতে তিনি নিজ জীবনের তপস্যা দ্বারা নূতন যুগের সূচনা করলেন,—সেদিন সবার সামনে দিনের আলোর মতই পরিস্ফুট হয়ে উঠল সকল ধর্মের সনাতন সত্য। রামকৃষ্ণ-জীবনের লোকোত্তর আদর্শই হ'ল নবীন ভারতকে গ'ড়ে তোলবার শ্রেষ্ঠ উপাদান। জাতির মন দীর্ঘ তন্দ্রার পর পথের সন্ধান পেয়ে এগিয়ে চললো। ভারতের জীবনে সেদিন হ'তে আবির্ভাব হ'ল এক শুভদিনের।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিশেষত্ব দেখতে পাই তাঁর ধর্মসমন্বয়সাধনে, তিনি নিজ জীবনে বিভিন্ন ধর্মের সত্য প্রত্যক্ষ ক'রে জগৎসমক্ষে যুগের বিশেষ বাণী ঘোষণা করলেন—'যত মত তত পথ'—অর্থাৎ সব ধর্মমত বা পথেই সরল বিশ্বাসে নিষ্ঠার সহিত সন্ধান করলে সত্যোপলব্ধি হয়। যিনি যে ধর্মাশ্রয়ীই হউন না কেন, নিজ ধর্মে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান হয়ে ধর্মানুষ্ঠান করলে সত্যলাভ হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন জীবনে সুকঠিন তপশ্চর্যার ভেতর দিয়ে এই মহান্ সত্য উপলব্ধি ক'রে জগৎকে দেখিয়ে গেলেন, কোন ধর্মই মিথ্যা নয়, শুধু পথের বিভিন্নতা মাত্র। আরো সরলভাবে এ সত্যকে বোঝাবার জন্য কথার ছলে উপদেশ দিলেন—যেমন পুকুরের জল, চারধার দিয়ে বিভিন্ন লোকে তুলে নিচ্ছে, কেউ বলছে 'ওয়াটার', কেউ বলছে 'এ্যাকোয়া', আবার কেউ বলছে 'জল' বা 'পানি'। এরূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও জল কিন্তু একই পদার্থ। সেরূপ সনাতন সত্য একই। জগতের লোক তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নামে—আল্লা, গড্, কৃষ্ণ, কালী, ব্রহ্মা ব'লে স্মরণ করছে।

তাঁর এই সরল-উদার বাণী বিংশ শতাব্দীর ভারতের পক্ষে পরম কল্যাণকর হয়েছে, শুধু ভারতের কেন বলি—সারা জগতেই তাঁর সাধনালব্ধ সত্য মানুষের ভেতর একটা শান্তি ও প্রীতির ভাব এনে দিয়েছে। আজ প্রকৃত ধার্মিক চাচ্ছেন—গোঁড়ামীর গণ্ডী ভেঙে দিয়ে সত্যের সন্ধান করতে এবং ধর্মে যে-কোন সংকীর্ণতা বা অন্ধ গোঁড়ামীর স্থান নেই, তাও প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছেন। সত্য যে সর্বত্রই এক, এ চিন্তা মানুষের মনে এসেছে। যদিও সঙ্কীর্ণচিত্ত গোঁড়ামী হ'তে ধর্ম এখনো মুক্ত হ'তে পারেনি, তাহলেও গোঁড়ামীর সুস্পষ্ট প্রতিবাদস্বরূপ সমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ উদার বাণী আজ ভারতের প্রাণে সমন্বয়ের ভাব জাগ্রত ক'রে বিশ্বের মনীষীমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক চিন্তা-জগতেও এক আলোড়ন এনে দিয়েছে। মানুষ আজ চাইছে হিংসা-দ্বেষ-বর্জিত প্রাণে শান্তিতে জগতে বাস করতে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিশ্বমানবতা প্রভৃতি যে-সব উদার ভাব জগতে ছড়িয়ে পড়ছে, এদের সবার ভেতরেই বর্তমান যুগের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত আবার শ্রীরাম-কৃষ্ণের সাধনালোকে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফিরে পেয়েছে। ভারতের জাতীয় আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার জন্য—গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি বা নেপোলিয়ানের দরকার হয়নি। অতীতকাল থেকে যখনই এদেশে ঐরূপ সঙ্কট-সময় উপস্থিত হয়েছে, তখনই ভারতের ভাবানুযায়ী যুগোপযোগী সাধনায় শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তকগণ যুগে যুগে এসে সত্যের সন্ধান দিয়ে জাতির বৈশিষ্ট্যকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন।

আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মচেতনার জন্য তার জাতীয় বিশিষ্টতাকে আশ্রয় ক'রে অপর ভাবগুলি পরিপুষ্ট হয়ে, জাতির প্রাণশক্তিকে আরো পুষ্ট ও শক্তিমান ক'রে দেয়। এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে জাতির নব-চেতনার জন্য তার রাষ্ট্রে ও সমাজে সত্যই জাগরণের সাড়া পড়েছে। ভারতের বিশিষ্ট চিন্তাশীল রাষ্ট্রনেতাগণ চাচ্ছেন, জাতি আজ ধর্মের বিভেদ ভুলে সবাই ভারত-বাসী ব'লে পরিচয় দেবে এবং বহু মত ও পথকে এক ক'রে, একই

উদ্দেশ্যসাধন একমন মন-প্রাণে সবাই দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। আবার সমাজহিতৈষিগণ চাচ্ছেন, জাত্যভিমান ভুলে গিয়ে সবার ভেতর ব্রহ্মসত্তা নিহিত রয়েছে, এই ভেবে নারায়ণ-জ্ঞানে অথবা বিরাট সমাজের অঙ্গরূপে—যাদের আমরা উপেক্ষায় দূরে রেখেছি—তাদের সেবার আয়োজন করতে। জাতির দুর্বলতা দূর ক'রে দেশের ও সমাজের মঙ্গলার্থে আরো নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে সমাজ জীবনকে আরো উন্নত ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্য অনেকে আজ স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করছেন—এ-ও সেই যুগ-প্রবর্তকেরই শুভ-নির্দেশ।

আজি আত্ম-চেতনা ফিরে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে সব দিকেই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ সত্যকে যিনি ভারতের সনাতন আদর্শ ব'লে ঘোষণা ক'রে জগতের সামনে ভারতের শান্তি সত্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই বীরকেশরী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আদর্শটিকে জাতির সামনে আবার এমনি সুস্পষ্ট ক'রে তুলে ধরলেন—যাতে সেই আদর্শকে অবলম্বন ক'রে সমাজের সব দিকেই কল্যাণ হয়।

তাঁর মহান্ ত্যাগ-তপস্যা-পূত জীবন ও বাণীই হ'ল—রামকৃষ্ণ-জীবনের প্রকৃত ভাষ্য। রামকৃষ্ণকে বুঝতে হ'লে বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা ভুল হবে। বিবেকানন্দের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে গঠিত, শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদেই বিবেকানন্দের ভেতর তাঁরই পূর্ণ শক্তির বিকাশ হয়েছিল জগৎ-শিক্ষার জন্য। বিবেকানন্দের জীবনধারা ও বাণী দ্বারাই ভারতের মৃত প্রাণে নূতন জীবনের স্পন্দন এসে গেল, আজ তাঁর বাণাই নবীন ভারতের বেদ-বাণী। তিনি জাতির বিশিষ্ট ধর্ম-ভাবটিকে জাগিয়ে দিয়ে, আপামর সাধারণকে মনুষ্যত্বের বেদীমূলে আহ্বান করলেন, সেখানে ছোট-বড় উন্নত-অবনতের প্রশ্ন নেই—'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই ছিল সেখানে বিচারের মাপকাঠি। মানুষের ভেতর আত্মসম্মান ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে দিয়ে, আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতিকে জগতের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে শেখালেন।

একটু চিন্তা করিলেই দেখতে পাই, রামকৃষ্ণের সত্য আদর্শ আজ নবীন-ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসক ও জগতের শান্তিবিধায়ক।

আজ শুধু মনে হচ্ছে, স্বামীজীর সেই বাণীটি—'এ জাত যেমন প'ড়ে গেছে—তেমনই আবার উঠবে'—আবার এ যুগ-মানবের পূত আদর্শ নিয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে আপন পরিচয় দেবে।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলাশিস্ মস্তকে নিয়ে তাঁরই চরণ-সান্নিধ্যে —স্বামীজীর ভাষায় আমাদের প্রাণের প্রার্থনা জানাচ্ছি, —'হে প্রভু, আমাদের মনুষ্যত্ব দাও, আমাদের মানুষ কর!'

যাঁরা জগৎ, তিনিই এসব করেছেন অধিকারীভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

*

এ বুদ্ধি ক'রো না যে, এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধ'রে থাকবে।

*

যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। ওর জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

*

আপনাতে আপনি থাক মন, যেও নাকো কারু ঘরে। যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে; মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষ-ভাব আর থাকবে না।···সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাহার সঙ্গে মিশবে যতদূর পার। আর ভালবাসবে। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ করবে।

*

সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠা-ভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।···পত্নী দেওর ভাসুর ইত্যাদিকে পা ধোবার জল ও আসনাদি দ্বারা সেবা করে, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।

*

শ্রাদ্ধের অন্ন খেয়ো না।

*

ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়।

*

মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ।...কন্যা শক্তিরূপা।

*

সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই ব'লে কি কুকুর জ্ঞানী?

*

ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোকে এসে খাওয়াবে —মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগ-ছেলেদের আর একজনে খাওয়াচ্ছে!

*

স্ত্রী-পুত্র বাপ-মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

*

তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নাই। তবে এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম শেষ হ'লে তুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

*

কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বল্‌বে, 'হে ঈশ্বর, আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও।'

*

কত পাশ করা, কত ইংরেজী পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকুরি স্বীকার ক'রে তাদের বুট জুতোর গোঁজা তু'বেলা খায়। এর কারণ কেবল কামিনী।

*

টাকার অহঙ্কার করতে নাই। যদি বল, আমি ধনী, ত ধনীর আবার তারে বাড়া আছে। ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।

*

বেশী উপায়ের চেষ্টা করবে, কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

*

অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ ক'রে থাকতে নাই। মনে কর, নষ্টা স্ত্রী পরমার্থহানি করতে আসছে, তখনই বীরের ভাব ধরতে হয়।

*

গুরুবাক্য বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই।...ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে।

*

বেশী খেয়ো না। আর শুচি-বাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না।

*

যদৃচ্ছা লাভ এই ভাল। সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আর এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছা লাভ।

*

যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি ঠিক দেখেন যে, মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা ব'লে তাই সকলকে পূজা করেন।

*

মা গুরুজন ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।...যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে... যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে, ততক্ষণ মার খপর নিতে হবে।

*

তোমরা মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা-আপনি গায় সে একা। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙে যাবে। লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

*

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও, তা'হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে, তত আসক্তি বাড়বে।

*

যদি বল, কতদিন সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকবো? তা এক দিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল; তিন দিন থাকলে আরও ভাল, বা বারো দিন, এক মাস, তিন মাস, এক বৎসর, যে যেমন পারে।

*

বাপের সঙ্গে প্রীতি করো···মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন সর্বব্যাপী হয়ে, তিনিই মা। জননী যিনি জ[illegible]ান।···বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ছাই হবে।

*

লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।

*

দয়া আর মায়া অনেক তফাৎ। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া—আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী,পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা এদেরই উপর। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা। শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি, এর নাম মায়া; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে ভালবাসা, এইটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।

*

লোককে খাওয়ানো একরকম তাঁরই সেবা করা, কি বলো? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ানো কি না তাঁকে আহুতি দেওয়া। কিন্তু তা ব'লে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই। এমন লোক,

যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে ব'সে খায়, সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

*

কর্তব্য আছে বৈকি। ছেলেদের মানুষ করা। স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে, তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় রাখতে হবে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়। যার দয়া নাই, সে মানুষই নয়।...সাবালক হওয়া পর্যন্ত সন্তান পালন করবে। তুমি বেঁচে থাকতে স্ত্রীকে ধর্মোপদেশ দিবে, ভরণপোষণ করবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্তমানে তার খাবার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে।

*

যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, ক্ষিদে তৃষ্ণা এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়ত খেতেই পেলে না। তখন ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।...তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়িতে বরং সুবিধে। আহারের জন্য ভাবতে হয় না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই। শরীরের যখন যেটি দরকার, কাছেই পাবে। রোগ হ'লে সেবা করবার লোক কাছে পাবে।

*

সংসারী লোক এত শোকতাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী ম'রে গেল, কি অসতী হ'ল, তবু আবার বিয়ে করবে। ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। লোকে মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়, আবার বছরে বছরে তাদের মেয়েছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছর বছর ছেলে হয়।

কি ! আগে টাকা সঞ্চয় ক'রে তবে ঈশ্বর ? আর দান ধ্যান দয়া কত ! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের ছুটি চাল দিতে কষ্ট হয়, অনেক হিসেব ক'রে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে, তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক, আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হ'লো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া।...আমারও মাগ আছে; ঘরে ঘটি-বাটিও আছে, হরে, প্যালাদের খাইয়ে দেই, আবার যখন হাবির মা এরা আসে, এদের জন্যও ভাবি।

অতিমানব শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য এই বৎসর পৃথিবীব্যাপী উৎসবের আয়োজন হইতেছে। 'যত মত তত পথ' ছিল পরস্পর বিবদমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁহার প্রধান বাণী। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক হইতে চলিল তিনি এই মহা-সত্য নিজের অদৃষ্ট-পূর্ব জীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিয়াছেন, তথাপি সভ্যতাগর্বিত ও শিক্ষা-অভিমানী মানব তাহার বিচার ব্যতীত গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার আলোকে আমরা প্রধান প্রধান ধর্মের আভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণীর সার্থকতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব।

ধর্মসঙ্ঘসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ধর্মসঙ্ঘ প্রথমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, তৎপরে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শেষে কর্ম-প্রসারে মনোনিবেশ করিয়াছে। মানুষের মন এমন বহির্মুখী যে, সংযম ও নিবৃত্তির পথে চলিয়া সত্যলাভ করিবার জন্য জীবননিয়োগ করিতে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সক্ষম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন—'অসংখ্য মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকেই সত্যলাভের জন্য যত্ন করে।' 'আহূত হয় অনেকে, কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই' যিশুখৃষ্টের এই কথাও তাহার প্রতিধ্বনি। সঙ্ঘ ও ক্যাথেলিক খৃষ্টান-সঙ্ঘ পৃথিবীর এই দুই বৃহত্তম ধর্মসঙ্ঘে কালের এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের বিদ্যোৎকর্ষের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত জীবন ও অনুভূতির ভিত্তিতে এক বিশাল দর্শন-সৌধ গড়িয়া উঠিবে। ভারতীয় দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি ধর্ম-জগতে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই উহার কিঞ্চিৎ আভাস চিন্তাশীল মনীষীগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং সর্বশাস্ত্রের সার-সত্য এই যে, অতি মানব স্বীয় সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, উহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সময়োপযোগী বলিয়াই প্রতীত হয়। বিস্তৃত আলোচনার ভার ভবিষ্যতের উপযুক্ত

শাস্ত্রজ্ঞ সাধকের হস্তে ন্যস্ত করিতেছি। সত্য যে এক ও অদ্বৈত, তাহা বেদ ও বাইবেল, কোরাণ ও কাব্বালা, জেন্দাবেস্তা ও গ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটক ও তাওতেকিং সকল ধর্মশাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আর কৃষ্ণ ও ক্রাইষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদ, জরোয়াস্তার ও লাওজে, মহাবীর ও মোজেস প্রভৃতি ধর্মসংস্থাপক ও ধর্মাচার্যগণ এই সনাতন সত্যকে দেশ ও কালের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুধর্মে যেমন সনাতন ধর্ম ও স্মৃতিধর্ম নামক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুই অংশ আলোচনার সুবিধার জন্য নির্দেশ করা যাইতে পারে, তদ্রূপ সকল ধর্মেই সনাতন ও সাময়িক এই দুই বিভাগ আছে। প্রথমটি অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের সমষ্টি, আর দ্বিতীয়টিতে আছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও যুগে এই সনাতন সূত্রগুলি যে যে আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার বিবরণ। সাধারণ মানুষের চিন্তা এত অগভীর যে, সে অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে গভীর সত্য লুকায়িত আছে, তাহা না দেখিয়া আকারের উপরেই বেশী জোর দেয়। তাহার অনিবার্য ফল এই ধর্মবিরোধ—যাহা সমাজে অশেষ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা ও অন্তর্মুখিনতা বৃদ্ধির সঙ্গেই উহা সাধকের মন হইতে অদৃশ্য হয়। কিন্তু এই দুনিয়ায় সত্যের সাধক কয়জন আছে? খাঁটি ধর্ম চায়ই বা কে? তাই সংসারে ধর্মের নামে এত অধর্ম, বিরোধ, বিদ্বেষ, হিংসা চলিতেছে। পারিবারিক সামাজিক ও দেশীয় স্বার্থ ও সংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সত্যের বিশ্বজনীন ও সার্বভৌমিক স্বরূপ দর্শন করিবার শক্তি বেশী সাধকের নাই।

কার্পেন্টারের 'Comparative Religion' এবং ফরাসী পণ্ডিতের 'Comparative Philosophy' প্রভৃতি পুস্তক অধ্যয়ন করিলে জানা যায় যে, বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্য আছে। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্ তাঁহার বিখ্যাত 'Varieties of Religious Experience' নামক পুস্তকে নানা দেশের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অনুভূতির প্রকারভেদ হইলেও উহা একই সত্যের আরাধনানুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

উপনিষদে আছে—"গবাম্ অনেক বর্ণানাং ক্ষীরস্যাস্ত্যেকবর্ণতা। ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং, লিঙ্গীনাস্তু গবাং যথা॥" অর্থাৎ গাভীদের বর্ণ অনেক রকমের হইলেও তাহাদের দুধের রং একই প্রকার। সাধকদিগের মানসিক গঠন ও ভাব অনুযায়ী জ্ঞানের ধারণারও তফাৎ হয় মাত্র, কিন্তু জ্ঞান একই। হৃদয়-গুহাতে নিহিত ধর্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া মানুষ যখন চরম সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হন, তখন তিনি ধর্ম ও শাস্ত্রের সীমার উর্ধ্বে উত্থিত হন। 'কোনও ধর্মের মধ্যে জন্মলাভ করা উত্তম হইলেও উহাতে মৃত্যু অবধি আবদ্ধ থাকা অতীব দুর্ভাগ্য'—এই সাধুবচন কতদূর সত্য, তাহা সত্য-সাধকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। চারাগাছের পক্ষে কাঁটার বেড়া সহায়স্বরূপ হইলেও শেষে উহা বাধাস্বরূপ হয়। সেইরূপ চরম সত্য লাভের পক্ষে ধর্ম ও শাস্ত্র বন্ধনবিশেষ। শাস্ত্রের সীমার পারে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও উপদেশ দিয়াছেন। ভাগবতে আছে—'পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ।' কৃষক যেমন খড়গুলি ফেলিয়া দিয়া ধান্য সংগ্রহ করে, সাধক তেমনি শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া অনুভূতির জন্য সচেষ্ট হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন,—'গ্রন্থ ত নয়, গ্রন্থি।' সাধক যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তাঁহার জীবনই জীবন্ত শাস্ত্র। চরম সত্যের উপাসক ও দ্রষ্টা সব ধর্মেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইসলামের সুফী, খ্রীষ্টান, রাহস্যিক, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, বেদান্তী, চীনের তাওবাদী, মিশরের নৈষ্ঠিকগণ অদ্বৈত সত্যেরই সাধক তাঁহারা সকলেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও অদ্বৈতবাদী।

'যত মত তত পথ'—বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন দর্শন একই সত্যের বিভিন্ন পথ মাত্র। পথের প্রভেদ হইলেও গন্তব্যস্থানের পার্থক্য নাই। মহাভারত সত্যই বলিয়াছেন,—'দেশ-কাল-নিমিত্তানাং ভেদে ধর্মো-বিভিদ্যতে।' ধর্মাচার্যগণের বাক্যগুলি অনুধ্যান করিলে জানিতে পারা যায় যে, সনাতন সত্য কোনও জাতির ধর্মের বা দেশের একচেটিয়া নহে, উহা সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। চৈনিক দার্শনিক কনফুঁসে বলেন যে,—তিনি চিরন্তন সত্যই শিক্ষা দিতেছেন, নিজের নতুন কিছু সৃষ্টি করেন নাই। ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার পূর্ববর্তী ২৪

জন বুদ্ধের কথা বলিয়া প্রচার করিলেন যে, ভবিষ্যতেও অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া অনুভূত সত্য উপলব্ধি করিবেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন —'ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ নাই। সকলেই ঈশ্বরাদেশে একই মহান্ সত্য শিক্ষা দেন।' তিনি আরও বলিয়াছেন,—'সর্বশাস্ত্রের মধ্যে কোরাণের উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। মক্কা ও আরবের অন্যান্য শহরবাসীদের জন্য তাহাদের ব্যবহৃত আরবী ভাষায় কোরাণ লিখিত হইত—যাহাতে তাহারা সহজে তাঁহার বাণী গ্রহণ করিতে পারে।' বৈদিক ঋষির উক্তি—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—হিন্দুধর্মের উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমীর 'মশনবী' গ্রন্থ মুসলমান-জগতে দ্বিতীয় কোরাণের ন্যায় সম্মানিত ও পঠিত হয়। তিনি বলেন, 'কোরাণের মজ্জা মাত্র 'মশনবী'তে রাখিয়াছেন। পূর্বাচার্যগণের বাণী পূর্ণ করিতেই যীশুখ্রীষ্টের জন্ম,—কোন ধর্মের অনিষ্ট বা ধ্বংস-সাধন করিতে নহে, - একথা তিনি স্বীয় মুখে স্বীকার করিয়াছেন।

ভাষা ও বাক্যের বৈচিত্র্য বাদ দিলে ভাবের সাম্য পরিলক্ষিত হয়। এক সুফী কবি বলিয়াছেন যে, অসংখ্য তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের মধ্যে একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের পরিভাষা যদি এক ভাষায় অনূদিত করা হয়—তখন উহাদের ভাবের সাদৃশ্য ও ঐক্য আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। আল্লাহো আকবর ও মহেশ্বর, কাদির ও ভগবান, রহিম ও শিব, রহমান ও শঙ্কর, আহুর মাজদা ও অসুর মহান, বুদ্ধ ও ক্রাইষ্ট একার্থবাচক। একই সত্যের হকিকৎ, নশিশ, জ্ঞান, তাও, আইনশফ, ব্রহ্ম, বোধি প্রভৃতি নাম নানা দেশে প্রচলিত। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির নিয়ম,--কিন্তু অনন্ত বৈচিত্র্যের পশ্চাতে যে অপরিচ্ছন্ন শাশ্বত ঐক্য আছে, তাহা না দেখিলে জীবনে ও সমাজে অশান্তির উদ্রেক হয়। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম ও কনফুঁসের ধর্ম পরম সদ্ভাবে বাস করে। চীনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনজন পথিক মিলিত হইলে একজন অপরের ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলে —'ধর্ম বহু, জ্ঞান এক আর আমরা পরস্পরের ভাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বহুরূপীর উপাখ্যান গভীর উপদেশপূর্ণ। বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত ছয়জন অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় আমাদের ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান অপূর্ণ।

আখ্যায়িকা-বর্ণিত অন্ধদের মধ্যে কেহ হাতীর কান, কেহ শুঁড়, কেহ পেট, কেহ লেজ দেখিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের ধর্ম-বিদ্বেষ তদ্রূপ অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত! সুফীদের মধ্যেও এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা একজন পার্শী, একজন তুর্কী, একজন রুমী ও একজন আরব পথ চলিতে চলিতে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হইয়া কোনও বৃক্ষতলে উপবেশন করে। কেহ কাহারো ভাষা বুঝিত না, তথাপি আকারে-ইঙ্গিতে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া আহার্য ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা কি ক্রয় করিবে? আরব 'এনাব', তুর্কী 'উজম', পার্শী 'আঙ্গুর' এবং রুমী 'আস্তাফিলে'র জন্য চিৎকার করিল। কিন্তু কেহ কাহারও ভাষা বুঝিল না। শেষে আরক্তিম চক্ষু ও বদ্ধমুষ্টি লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। জনৈক ফলবিক্রেতা নানা দেশের লোকের নিকট ফল বিক্রয় করিত বলিয়া নানা ভাষার ২।৪টি কথা জানিত। সে পথিকদের নিকটবর্তী হইয়া তাহাদের সংঘর্ষের কারণ বুঝিল এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদের ৪ জনের হাতে একই ফল দিল। উহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। আরবী এনাব, তুর্কী উজম, ইরানী আঙুর, রুমী আস্তাফিল, পহ্লবী দাখ, সংস্কৃত দ্রাক্ষা এবং ইংরেজী গ্রেপ একার্থ-বোধক। ধর্মজগতের দ্বন্দ্বসমূহও এইরূপ হয় অজ্ঞানপ্রসূত, না হয় স্বার্থপ্রণোদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন যে, একই জলাশয় হইতে জল লইয়া ওয়াটার, য়্যাকোয়া, পানি, জল প্রভৃতি নাম দেয়। ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যানেও এইরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ধর্ম মানব-মনের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি অনুযায়ী সত্যলাভের তিনটি পথ নির্দেশ করিয়াছে। বৈদিক জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গ, ইস্‌লামের হকিকৎ, তারিখৎ ও শারিয়াৎ, ঈশাহি ধর্মের নশিশ, পাইটাশ্‌ ও এনারজাইয়া, বৌদ্ধধর্মের সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প ও সম্যক্ ব্যায়াম—এই তিনটি পথ। জৈনধর্মের মধ্যেও এই তিনটি পথের উল্লেখ আছে। জৈনশাস্ত্রতত্ত্বার্থ সূত্রের বচন—'সম্যক্ দর্শন-জ্ঞান-চারিত্র্যাণি মোক্ষমার্গা।' ডাক্তার ভগবান দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি, তাঁহার গবেষণাপূর্ণ 'Essential Unity of all

Religions' নামক পুস্তকে বলেন যে, 'সর্বং ত্রৈরাশিকংগতিঃ' এই শাস্ত্রবাক্য গণিতের ন্যায় ধর্ম ও দর্শনে সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষ, জগৎ ও ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বালোচনাই সমগ্র দর্শনে পর্যবসিত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার তপস্যাময় জীবনে দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈতানুভূতিই ধর্ম ও দর্শনের শেষ কথা। কেবল ধর্মশাস্ত্রালোচনার দ্বারা এই সত্য ধারণা করা সম্ভব হইবে। জীবই ব্রহ্ম, ইহা বেদান্তের সার-সত্য কিন্তু বেদান্তের এই মহাকাব্য সকল শাস্ত্রেরই শ্রেষ্ঠ বাণী। নিউ টেষ্টামেণ্টের যিশুখৃষ্ট-কথিত 'I and my father are one,' ওল্ড ষ্টেটামেণ্টের 'I (self) am God and there is none else,' বেদের 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি', সুফীর 'আনাল হক', অদ্বৈতজ্ঞানেরই দেশভেদে বর্ণনা। পার্শী ধর্মগ্রন্থ 'অরমাজদ্ ইয়াস্তে'র বাক্য 'আমার প্রথম নাম আহ্মি' (সংস্কৃত অস্মি) বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি। বুদ্ধত্বলাভ করা বা ধর্মকারের সহিত মিলিয়া যাওয়াই মহাযোগী বৌদ্ধের আদর্শ। মহাযান, বেদান্ত ও তাশায়ুকের দার্শনিক তত্ত্বের এত সাদৃশ্য আছে যে, অন্য ভাষায় প্রকাশ করিলে তিনটিকে এক বলিয়া মনে হইবে। বৌদ্ধ-নির্বাণ ও বৈদিক-সমাধি একই অতীন্দ্রিয় অবস্থার দুইটি নামমাত্র। উপনিষদুক্ত সমাধির বর্ণনা অনেকেই জানেন, যথা,—'ন তত্র সূর্যো-ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ঃ অগ্নিঃ। তমেব ভাণ্ডং অনুভাতি সর্বম্। তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি॥" ভগবান বুদ্ধদেব 'উদানে' নির্বাণের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই এইরূপ। তিনি বলেন,—'যত্থ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি। ন তত্থ শুক্কা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাশতি॥ ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি। যদা হি অত্তনো বেদী মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো॥ অথ রূপা অরূপা চ সুখদুঃখা প্পমুচ্চতি।' দুইটি বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন একই ভাবকে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। ইহুদী, জৈন, পার্শী, খৃষ্টান ও মুসলমান ঋষিগণ-প্রদত্ত সত্য-দর্শনের বর্ণনা সমস্তই এই প্রকার। সৃষ্টিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বেদান্তে যেরূপ চরম সীমা অবধি বর্ধিত হইয়াছে, অন্য কোন দর্শনে

তদ্রূপ হয় নাই, কাজেই বেদান্তকে ধর্ম ও দর্শনের পূর্ণ পরিণতি বলা যায়। বিশ্ববিখ্যাত হিন্দুদার্শনিক এস. রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার 'Reign of Religion in Contemporary Philosophy' নামক পুস্তকে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের মতবাদের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধর্মের গোঁড়ামির জন্যই তাঁহাদের অনুশীলন অদ্বৈতবাদে পৌঁছিতে পারে নাই। যদি প্রত্যেক ধর্ম বা দর্শনকে যুক্তির ভিত্তিতে পরিবর্ধিত করা হয়, তবে প্রত্যেকেই বেদান্ত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে; জার্মেনীর দার্শনিক পল্ ডয়সন্ তাঁহার 'Elements of Metaphysics'-এ কাণ্ট ও শঙ্করের দর্শন তুলনা করিয়া এই মহাসত্যই সমর্থন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদরূপ হিন্দু দর্শনের তিনটি স্তর অন্যান্য দর্শনেও আছে। ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও অবতার পারমার্থিক সত্যের এই তিন প্রকার অন্যান্য ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'ধর্মকায়', 'নির্মাণকায়', 'সম্ভোগকায়', বাইবেলের 'গড দি ফাদার', 'গড্ দি হোলি ঘোষ্ট' এবং 'গড্ দি সন' একই পর্যায়ভুক্ত। ইস্লাম ও তাওধর্মেও ভগবানের নিরাকার সাকার রূপ ও অবতার বাদের উল্লেখ আছে। এই তিন প্রকার ঈশ্বরতত্ত্বের দিক দিয়া বিবর্ত-বাদ, পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ নামক তিনরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব আছে। সেমিটিক ধর্মত্রয়ে আরম্ভবাদের বেশী প্রভাব। বিবর্তবাদ বেদান্তের মত বৌদ্ধধর্ম, পলটিনাশ, কাণ্ট, প্লেটো প্রভৃতির দর্শনে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রামানুজের পরিণামবাদই হেগেল, বার্গশো প্রভৃতির প্রতিপাদ্য বিষয়। মানব-মন এমন একদেশদর্শী যে, কোনও তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ চিন্তা সে করিতেই পারে না। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি তাহাকে এত ঘেরিয়া রাখিয়াছে যে, ধর্মের ও দর্শনের আচার্যগণও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। দার্শনিকগণ এক-একটি অংশের উপর এমন জোর দিয়াছেন যে, তত্ত্বের অন্যান্য অঙ্গগুলি পঙ্গু হইয়া আছে। কোনও মতবাদের সর্বাঙ্গ সমৃদ্ধি তাই বেদান্ত ব্যতীত অন্য কোনও দর্শনে সম্ভব হয় নাই। কাউণ্ট কাইসারলিং তাঁহার

'Travel Diary of a Philosopher', 'Creative Understanding' প্রভৃতি সারগর্ভ পুস্তকে তুলনামূলক গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাঁহার মন যে ভূমিতে অবস্থিত, তিনি সেই স্থান হইতে পারমার্থিক সত্যের আভাস পাইয়া থাকেন। বর্তমান যুগের scientific mentalism যাহা এডিংটন, জানস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন, তাহা বৈদান্তিক বিবর্তবাদের বৈজ্ঞানিক সংস্করণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

কর্ম বা পুনর্জন্মবাদও ধর্মতত্ত্বের একটি অপরিচ্ছন্ন অঙ্গ। বৌদ্ধবাদ ও বেদান্তের উহা মেরুদণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতীয় ধর্ম হইতে এই কর্মবাদ সমগ্র এশিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জগতে যাহা progress, evolution এবং phylogenesis নামে পরিচিত, তাহা এই কর্মবাদের বৈদেশিক সংস্করণ। Psychic Research নানাভাবে কর্মবাদ প্রমাণ করিতে যাইয়া আংশিক কৃতকার্যও হইয়াছে। জগৎপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ্যাবিৎ ও দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাহার 'On Education' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ক একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কর্মবাদে অবিশ্বাসী তাঁহার মনের ধারণা যে, মানবাত্মার প্রাগ্‌ভাব ছিল। তাঁহার শিশু-পুত্রের যে জন্মের পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না, ইহা বুঝাইতে যাইয়া তিনি মহা-মুশকিলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পিতাকে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, প্রাচীন যুগে যখন পিরামিড প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল, তখন সে কি করিতেছিল। এইরূপে শিক্ষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণায় অগ্রসর হইয়া কর্মবাদের সাহায্য ব্যতীত মনীষিগণ আজ অনেক বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। থিওজফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ম্যাডাম্ ব্লভাটসকি তাঁহার লিখিত 'Secret Doctrine' নামক গ্রন্থে ইস্‌লাম, খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম প্রভৃতির কর্মবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্ত্য-জগতের মহোপকারসাধন করিয়াছেন। এই তিনটি ধর্মই বিশেষ করিয়া পুনর্জন্মবাদে অবিশ্বাসী। অবশ্য বাইবেলে এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা দ্বারা উহা প্রমাণিত হইতে পারে। ক্রাইষ্ট এক স্থানে বলিয়াছেন—'প্রফেট এলাইজাই

জনদি ব্যাপটিষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' যিশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক ইহুদিগণ কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টানধর্মে উহার প্রচলন ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট জগষ্টিনিয়ান চার্চ-কাউন্সিলে বিশেষ সাইনড করিয়া মধ্যযুগে উহা বন্ধ করিয়া দেন। 'মানুষ যাহা করে, তাহার ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়'—সেন্ট পলের এই বচন কর্মবাদেরই একটি সূত্র। যিশুখ্রীষ্ট নিজে বলিয়াছেন যে, এব্রাহামের পূর্বেও তিনি ছিলেন। তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আবার আসিবেন এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণকে তিনি স্বর্গে লইয়া যাইবেন। মানবের আত্মা দেশ-কাল-নিমিত্তাতীত, অজর, অমর, জন্ম-মৃত্যুরহিত, ইহাই কর্মবাদের প্রকৃত বাণী। সেন্ট পল্ 'Eternal life' বলিয়া আত্মার অমরত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীসে ও পারস্যে এই মতবাদ লোকে জানিত। পাইথাগোরাস ও তাঁহার শিষ্যগণ আত্মার অমরত্ব ও অজরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মশনবী ও তাশায়ুফ প্রভৃতি মুসলমান শাস্ত্রে ইহার পরিষ্কার উল্লেখ আছে। মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমী প্রমুখ সুফিগণ আত্মা যে মানুষ, পশু, উদ্ভিদ ও জড়-শরীর পরিগ্রহ করেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ চারি প্রকার শরীরধারণকে তাঁহারা ক্রমান্বয়ে 'নাস্ক', 'মাস্ক', 'ফাস্ক' ও 'রাস্ক বলিয়া অভিহিত করিতেন। জালাল উদ্দীন রুমী বলেন —'ঘাসের মত আমি শত শত বার জন্মিয়াছি ও মরিয়াছি। জড়ভূতের শরীর ছাড়িয়া আমি পরে বৃক্ষরূপে জন্মলাভ করি। ইহা নষ্ট হইলে পশু-জন্ম ও সর্বশেষে মানুষ হইয়াছি। মৃত্যুর পরে আবার দেবদূত বা দেবতা হইব। তাহার পর জন্ম ও মৃত্যুর পারে যাইয়া অনন্ত অসীম খোদার সঙ্গে মিলিত হইব।'

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এইরূপ বিশাল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা ব্যতীত বিশদালোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং আর ২।১টি কথার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করিয়াই ইহার উপসংহার করিব। 'Religion', 'ধর্ম', 'ইস্লাম' প্রভৃতিকে প্রতিশব্দ বলিলে ভুল হইবে না। সকল ধর্মেই

জীবন্মুক্ত বা পরমহংস অবস্থালাভের কথা আছে। অর্থাৎ, 'তীর্থঙ্কর', 'মর্দিতনাম', 'মেশাইয়া' প্রভৃতি একার্থবোধক। মধ্যবৃত্তি অনুসরণ করিবার জন্য প্রত্যেক ধর্ম আদেশ দিয়াছে। বুদ্ধদেবের 'মঝ্ঝিম পটিপদা', মহাবীরের 'অনেকান্তবাদ', কনফুসের 'Golden Mean' প্রভৃতি মধ্যপন্থা (middle path) গ্রহণেরই উপদেশ। প্রত্যেক দর্শন ঈশ্বরকে পুরুষ প্রকৃতি দুই ভাবে বর্ণনা করিয়াছে। লাও জে, চুয়াং-জু প্রভৃতি চৈনিক ঋষির 'yang' এবং 'yen' শব্দ দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাশ বলেন—'ঈশ্বর দিবা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, অভাব-পূর্ণতা সবই।' হিন্দুধর্ম ও ইস্‌লামের প্রদত্ত ভগবানের নাম হইতে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট হয়। যথা, 'ঈশ্বর, আদি ও অন্ত, আল-আওয়াল ও আল-আখির'; অব্যক্ত ও ব্যক্ত, আলবাটিন ও আজ্‌ জাহির; স্রষ্টা ও সংহর্তা আলবাদী ও আলজামী, ভব ও হর, আলমুহিয়্য ও আলমুমিৎ; মায়ী ও তারক, আলমুজীল, আল্‌দাহী; রুদ্র ও শিব, আলকোয়াহার ও আর-রাজ্যক্; যম ও ক্ষমাবান, আলগাজজাব ও আলগাফির; ঘোর ও দয়ালু, আলজাবার ও আল করিম; শাস্তা ও প্রভু, আলজলীল ও আলজামিল ইত্যাদি। প্রত্যেই ধর্মই ভগবানের অসংখ্য নাম ও রূপ দিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম প্রত্যেক মানুষের জন্য এক একটি ইষ্টদেবতা সৃষ্টি করিয়াছে।

সত্যলাভের জন্য অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতির প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশে স্বীকৃত; তবে সেমিটিক্ ধর্মে শ্রুতি, বৌদ্ধধর্মে যুক্তি এবং বেদান্তে তিনটির উপর সমান জোর দেওয়া হইয়াছে। বেদে যাহাকে পরমার্থ ও ব্যবহারিক সত্য বলে, ত্রিপিটকে তাহাকে সম্যক্ সম্বোধী ও সংবৃত্তিসত্য বলে। হিন্দুর যোগ, মুসলমানের শুলুক, বৌদ্ধের জেন প্রভৃতি অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক উপায় সর্বশাস্ত্রে গৃহীত। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিৎ সি. জে. জুং তাঁহার 'Secret of the Golden Flower' নামক গ্রন্থে চীনদেশীয় যোগ-মনস্তত্ত্বের গবেষণার আলোকে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগ-বিজ্ঞান

অল্পবিস্তর সকল ধর্ম-সম্প্রদায়েই অভ্যাস করে। তিনি বলেন, 'মন জয় করিবার এইরূপ সুগম ও অমোঘ উপায় আর নাই বলিলেই চলে। এমন কি, প্রাণায়ামের প্রচলন চীনদেশের বৌদ্ধ ও তাওধর্ম এবং য়ুরোপের মিষ্টিকগণ চিত্ত-সংযমের জন্য অভ্যাস করিত। বৌদ্ধযোগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা জাপানের পণ্ডিত ডি. টি. সুজুকী 'Zen Buddhism' নামক তিনটি বৃহৎ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের অপর নাম মায়াবাদ। মায়াবাদী বেদান্তীদের দেশ-বিদেশে অনেকে কটাক্ষ করেন। তিনি সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ জানেন যে, মায়াবাদ সকল ধর্মেই প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। সৃষ্টির যে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, উহা যে অনির্বচনীয়, তাহা প্রাচীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ, শঙ্কর, নাগার্জুন, গৌড়পাদ, বুদ্ধ প্রভৃতি আচার্য এবং প্রতীচ্যের আইনষ্টীন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, কান্ট, সোপেন হাওয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুর 'স্বর্গ ও নরক', মুসলমানের 'জাহান্নাম ও বাহিস্ত', খ্রীষ্টানের 'প্যারাডাইস ও পার্গেটরী' প্রভৃতি শব্দে জীবের উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি বর্ণিত। সর্বধর্মই মানুষের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের অস্তিত্ব মানিয়া লয়। বেদান্তের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরকে জৈনধর্মে ঔদারিক, তৈজস এবং কর্মণ্য শরীর, খৃষ্টীয় রহস্যবাদে 'Body', 'soul' এবং 'spirit', ইহুদী সাধুগণ 'নেফেশ, রুয়া এবং নেশামা', মুসলমানগণ 'নাফস্, দিল এবং রু' বলেন। সর্বভূতে আত্মানুভূতিই সকল ধর্ম ও দর্শনের আদর্শ। জৈনাচার্য শুভচন্দ্র তাঁহার 'জ্ঞানার্ণব' গ্রন্থে বলেন, 'তৎশ্রুতং তৎ চ বিজ্ঞানং, তৎ ধ্যানম্, তৎ, পরং তপঃ, অয়মাত্মা যদাসাদ্য স্বস্বরূপে লয়ং ব্রজেৎ।' নিজ আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে হয়, এ বিষয়েও সর্বশাস্ত্র একমত।

নানা শাস্ত্রে শুধু ভাবের নয়, ভাষায়ও এমন সাদৃশ্য আছে যে, এই-সবের তুলনামূলক অধ্যয়ন করিলে অবাক হইতে হয়। উপনিষদে যেমন আছে—'নেদং যদিদং উপাসতে', মিশরেও তদ্রূপ একটি শাস্ত্রবাক্য আছে, যথা—'Whatever degree your mind comes at, I tell you flat god is not that', ডক্টর জে.

এবেলশন্ তাঁহার 'Jewish Mysticism' গ্রন্থে ইহুদী শাস্ত্র 'জোহরে'ও এইরূপ কথা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জগতের সর্বধর্মাবলম্বী যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সকল ধর্ম ও দর্শনের সাম্যবাণীর ধ্যান করেন, তবেই এই উৎসব সফল হইবে। জগতের ঐক্যস্থাপনের জন্য ফরাসী-বিদ্রোহ, রুশ-বিদ্রোহ ও 'লীগ্ অব্ নেশন্' ব্যর্থকাম হইয়াছে। জগতে সাম্য স্থাপন করিতে মানবের চিন্তা-জগতের সমন্বয় সর্বপ্রথম আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন। সাম্য ও শক্তির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই ধর্মরাজ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার বাণীর আলোকে সকল ধর্মের—সকল শাস্ত্রের, সকল দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য ও তথ্য পরিস্ফুট। সকল ধর্ম ও সকল দর্শন কিঞ্চিৎ চর্চা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার বাণী কত দূর সত্য। সকল শাস্ত্রকে নিজের শাস্ত্রের মত বিশ্বাস করা, সকল ধর্মকে নিজের ধর্মের মত সম্মান করা, সকল ঈশ্বরাবতারকে নিজের ইষ্টদেবতার মত শ্রদ্ধা করাই ধর্ম-জীবনের প্রথম কর্তব্য। তাহা যিনি করিতে পারিবেন, তিনি বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান যাহাই হউক না কেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত ভক্ত,—অন্য সকলে তাঁহার অবমাননা করেন। ধর্ম-সমন্বয়ই ভারতের প্রকৃত সাধনা ও সিদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণে ভারতের আত্মা রূপগ্রহণ করিয়াছে। ভগবান বুদ্ধের ভিতর দিয়া ভারত-শক্তি সমগ্র এশিয়াকে এক সংস্কৃতিতে একত্রিত করিয়াছিল। তাই ভারতে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর তপস্যা ও সাধনায় এবং সপ্রেম আহ্বানে আবার ভারতের সনাতনী শক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া লোক-সংগ্রহে ব্যাপৃতা। ভারত জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টানধর্ম যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। পৃথিবীময় যে ধর্ম-সমন্বয়ের বন্যা আসিবে, ভারতে তাহার লক্ষণ পরিস্ফুট। চক্ষুষ্মন্ ইতিপূর্বেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। যিনি দেখিতেছেন না, তাঁহাকে বাহিরের চক্ষু বন্ধ করিয়া মানস-চক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী ধ্যান করিতে নিবেদন করি।

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো,
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালম্।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখাব্ধৌ,
সন্তাপ-সংস্মৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ১॥
[রে বিভ্রান্ত, ভোগসুখে কেন রে নিরত,
মোহবশে নিরন্তর ভ্রম' দীর্ঘপথ ?
সুখাব্ধিতে বিশ্রামের যদি মনোরথ,
ভজ ভব-দুঃখ-হর রামকৃষ্ণ-পদ॥ ১॥]

দুর্বার-ঘোর-ভবদাববিদহ্যমানো,
জঙ্গম্যসে মলিনবাসনয়া সুখাপ্ত্যৈ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ,
সন্তাপ-সংস্মৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ২॥
[জ্বলিতেছ দুর্নিবার ভব-দাবানলে,
ফিরিছ বাসনাবর্ত্মে সুখ পাবে ব'লে,
নীচাশ্রয় কেন, শান্তি যদি মনোগত,
ভজ ভব-দুঃখহর রামকৃষ্ণ-পদ॥ ২॥]

শাস্ত্রেষনাত্মসু কথং হি তব প্রবৃত্তি-
র্দুস্তর্কজালমিহ দেশিকবাগ্বিরুদ্ধম্।
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজ মন্দবুদ্ধে,
সন্দেহ-বিভ্রমহরং ভজ রামকৃষ্ণম্॥ ৩॥
[অনাত্মশাস্ত্রের বাক্যে কেন তব রতি,
গুরুবাক্যে প্রতিকূল কুতর্কে কুমতি,

কুসিদ্ধান্ত ছাড়ি মূঢ় জ্ঞানে হও রত,
ভজ রে সংশয়-হর রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৩ ॥

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তি-
স্তৃষ্ণাক্ষয়ো ভবতি চেন্ন সিসেব্যমানে।
বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতূন্,
সন্ত্যক্ত-কামকনকং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৪ ॥
[হেরি সদা অনুরাগ কামিনী-কাঞ্চনে,
ভোগে কোথা তৃষ্ণাক্ষয় ?—বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
ভববন্ধহেতু কাম,—শৃঙ্খল নিয়ত,
ভজ কাম-হেম-ত্যাগী রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৪ ॥]

ভার্য্যামশেষগুণভূষিত-ভক্তিযুক্তাং,
যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তথৈব।
দূরাৎ প্রণম্য জিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা,
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৫ ॥
[নানাগুণে অলঙ্কৃতা—ভার্য্যা ভক্তিমতী,
ভোগসুখে অনুরক্তা শতেক যুবতী,
মাতৃজ্ঞানে দূরে রাখি, হইলা প্রণত ;
ভজ কামগন্ধহীন রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৫ ॥]

সংস্পৃশ্য ধাতু-নিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ ;
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যো ভবেজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য-
স্তং ত্যাগপারগমোহ ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৬ ॥
[স্বর্ণ রৌপ্য ধাতুস্পর্শে কাঁপে কলেবর,
সংজ্ঞাহীন বক্র চারু অঙ্গুলি-নিকর,
বিলুপ্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি—সদ্যঃ জড়বৎ,
ভজ ত্যাগী-শ্রেষ্ঠ যোগী রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৬ ॥]

প্রেম্নঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং,
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।
তৎ প্রাপ্তু মিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্দ্র-চিত্তান্,
কুর্বন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৭ ॥
[পরিশুদ্ধ প্রেমরূপী বিমল পবিত্র,
সুখী জানে স্বার্থহীন মহান্ চরিত্র,
চাহ হেন প্রেমময় ভাব-রসাস্পদ,
ভজ ভক্তপ্রেমনিধি রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৭ ॥]

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো,
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতুশূন্যঃ।
যৎ প্রেম হেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং,
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৮ ॥
[স্নেহে মাতা, প্রেমে পিতা, সখ্যভাবে ভ্রাতা,
অহেতু করুণাসিন্ধু শুনি' জয়-গাথা।
অতুল যাহার প্রেম, ভক্তি কোকনদ,
ভজ সদা প্রেমসিন্ধু রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৮ ॥]

প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না-
স্বন্তর্হিতে ভবতি ভাব-বিকারযুক্তা।
আরাদ্গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভক্তে,
প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ৯ ॥
[পতি-সম্মিলনে যথা প্রফুল্ল ললনা,
বিচ্ছেদে বিরহবশে ক্ষুব্ধা আনমনা,
ভক্ত-সঙ্গ-সুখে সুখী—বিরহে আহত,
ভজ প্রেমমূর্তি গুরু রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ৯ ॥]

সংসার-দুঃখ-বিকৃতো ভজনানুরাগঃ,
শুদ্ধীকৃতঃ প্রিয়কথা-করুণা-কটাক্ষৈঃ।

আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা-
স্তং ধর্মমোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১০ ॥
[বিকৃত সংসার-দুঃখে, যাচে ধর্ম-বল,
করুণায় প্রিয়কথা ফল অবিরল,
আশ্বাসিয়া শিষ্যে দেন পৌরুষ-সম্পদ,
ভজ ধর্ম-মোক্ষদাতা রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১০ ॥]

যোগৈশ্চ সাধনশতৈঃ ফলমাপ্যতে যৎ,
যদ্বা সুখং ভবতি চিত্তনিরোধনেন।
যচ্ছন্নিধিং মুহুরুপেত্য পুমাঁল্লভেত্তৎ,
তং শান্তিশর্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১১ ॥
[যোগে আর শতবিধ সাধনে যে ফল,
চিত্তবৃত্তি-নিরোধে যে আনন্দ বিমল।
যাঁহার মুহূর্ত-সঙ্গ হেন ফলপ্রদ,
ভজ শান্তি-সুখদাতা রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১১ ॥]

নারায়ণং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং,
দৃষ্ট্বা শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাম্।
ভৃত্যায়তেঽপ্যখিলভূত-মহেশ্বরো য-
স্তং স্বাভিমানরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১২ ॥
[পুরুষে পুরুষে যেই হেরে নারায়ণ,
রমণীতে রমণীতে জননী দর্শন।
বিশ্বের ঈশ্বর সদা দাসভাবে নত,
ভজ অভিমান-শূন্য রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১২ ॥]

নাধীত-শাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা,
নাধীত-বেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ।
নাধীত-তন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্মবক্তা,
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৩ ॥

[অনধীতশাস্ত্র, সর্বশাস্ত্র-জ্ঞানে জ্ঞানী,
অনধীতবেদ, মুখে স্ফুরে বেদবাণী ;
অনধীততন্ত্র ক'ন কুলতন্ত্র যত,
ভজ মূর্ত্যতত্ত্ববোধ রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৩॥]

নির্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী,
নিষ্কর্মকোঽপি সততং পরকর্মকর্তা।
নির্দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং,
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥
[বাসনা-রহিত, নিত্য পরিহিতে ব্রতী,
পরকর্মপর যোগী নির্বাণ-মূরতি,
নির্দুঃখ, পরের দুঃখে ব্যথিত সতত,
ভজ দুঃখে অকাতর রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৪ ॥]

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতো নিজপার্ষদৈর্যো,
গায়ন্ হসন্ ভগবতঃ কথয়ন্ প্রসঙ্গৈঃ।
তারাগণৈরিব বিধুর্দ্যুতিমত্র ধত্তে,
তং স্বর্গশর্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৫ ॥
[ভক্তজন-পরিবৃত পার্ষদের সহ,
নৃত গীত হরিকথা চলে অহরহঃ।
তারাদল-মাঝে বিধু ;—দ্যুতি মধ্যগত ;
ভজ স্বর্গ-সুখ-দাতা রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৫ ॥]

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যপি শম্ভুভক্তৈঃ
কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষ্ণবশেখরৈশ্চ।
জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঃ,
সংজ্ঞায়তে চ তমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥ ১৬ ॥
[শাক্ত দেখে কালীরূপা, শৈব দেখে শিব,
বৈষ্ণবশেখর, কৃষ্ণ-প্রেমের ত্রিদিব ;

জ্ঞানীরা পরমহংস জানি ভক্তিনত :
ভজ রে পরমদেব রামকৃষ্ণ-পদ ॥ ১৬ ॥]

ভ্রমন্ নানা-যোনৌ, বহুবিধ-শরীরং পরিগতঃ,
সুখং নাল্পং লেভে, কনকযুবতীভোগবিষয়ৈঃ।
ইদানীং জ্ঞাত্বা ত্বাং, প্রণত-সুহৃদং শান্তিসুখদং,
বিরক্তোঽহং যাচে, তব চরণয়োর্ভক্তিমচলাম্ ॥ ১৭ ॥
[বহুদেহ ধরি' বহু যোনিতে ভ্রমণ,
কামিনী-কাঞ্চন ভুঞ্জি' সুখী নহে মন,
তুমি প্রণতের বন্ধু চিনেছি তোমায়,
যাচি শান্তি নিত্যা ভক্তি তব রাঙ্গা পায় ॥ ১৭ ॥]

গৃহীত্বা ভ্রান্তং মাং কুমতি-বিষয়াশাপরিবৃতং,
সদা রক্ষ ব্রহ্মন্, কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ।
কৃপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে,
বিবেকং বৈরাগ্যং পরমমপি মে দেহি ভগবন্ ॥ ১৮ ॥
[কুমতি, বিষয়ে আশা-মুগ্ধ মোর মন,
গহন কুপথে দুঃখ পাই অনুক্ষণ।
রক্ষা কর দুঃখ হ'তে কৃপাসার-দানে,
বিবেক বৈরাগ্য দাও, শোকদগ্ধ প্রাণে ॥ ১৮ ॥]

যো ভজেৎ পরয়া ভক্ত্যা রামকৃষ্ণং ভবান্তকম্।
ভববন্ধাদ্বিনির্মুক্তঃ সদ্যো ভবেন্ন সংশয়ঃ ॥
[প্রাণে পরা ভক্তিসুধা রামকৃষ্ণ ভজে,
সদ্য ভববন্ধমুক্ত—তাঁর পদরজে ॥]

কবিবর মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ কৃত পদ্যানুবাদ

আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে, তারই হবে—হবেই হবে। সত্য কথাই কলির তপস্যা।

*

আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপো ধন্বন্যা' ওসব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে।

*

জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধি, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।

*

কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ, বেশী কর্ম চলে না। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম-গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

*

কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোনমতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল ···তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখেছেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

*

সমাধি অবস্থায় দেখলাম কেশব সেন আর তার দল।···কেশব শিষ্যদে বলছে—ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো। মাকে বল্‌লাম, মা এদের ইংরেজী মত, এদের বলাবে যে···। তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল।

*

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে যে সকল লোকোত্তর মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে অমৃতত্বলাভের পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহারই জন্ম-শতবার্ষিকী-বাসরে বিশ্ববাসী আজ এক অভিনব আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। এই শুভলগ্নে সুদূর অতীতের ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত এক শাশ্বতবেদমন্ত্র হৃদয়-তন্ত্রে আজ স্বতঃই নূতন সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। একদিন প্রাচীন ভারতের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ—২।৫, ৩।৮)

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের সন্তানগণ! তোমরা শ্রবণ কর। অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে আদিত্যবর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে আমরা জানিয়াছি। জীবসমূহ একমাত্র তাঁহাকে জানিয়াই জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে চির-মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

বহু শতাব্দীর পর শান্ত স্নিগ্ধ দক্ষিণেশ্বর-তপোবনের মৌন গাম্ভীর্য ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ দেব-শিশুর কোমল কণ্ঠ হইতে বিগলিত করুণাধারার ন্যায় সেই মধুর অভয় বেদমন্ত্রই আবার নবীন ছন্দে উত্থিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল ওজস্বিনী ভাষায় তত্ত্বান্বেষী যুবক নরেন্দ্রনাথকে দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন—'আমি তাঁকে (ভগবান্‌কে) দেখেছি,—যেমন তোকে দেখছি, ঠিক এমনি ক'রে।' আত্মবিস্মৃত জগৎ সেই শান্ত সমাহিত যোগীর কণ্ঠনিঃসৃত বেদবাণী শ্রবণ করিয়া, বিপুল পুলকে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাঁহার পীযূষপূর্ণ উপদেশনিচয় জাহ্নবীর পূত পয়োধারার ন্যায়

শতধারে উৎসারিত হইয়া তৃষিতমানবহৃদয়ে অনন্ত তৃপ্তি ও শান্তি ঢালিয়া দিতেছে।

পুণ্যস্মৃতি দক্ষিণেশ্বর-মাতৃমন্দিরের একনিষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া, যে গভীর সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আজ নানাভাবে, নানা ছন্দে ভারতকে কেন্দ্র করিয়া, তাহা বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। অমানিশা-নিশীথে পথভ্রান্ত পথিকের নিকট উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ যেমন হতাশ প্রাণে নবীন আশা জাগাইয়া তোলে, মরুবক্ষে পথশ্রান্ত তৃষিত মানবহৃদয়ে দূরাগত নিঝ্‌রিণীর অস্ফুট কুলুকুলু ধ্বনি যেমন সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দেয়,—গভীর তমসাচ্ছন্ন ভারতের, তথা পাশ্চাত্ত্য-জগতের নিকটও শ্রীরামকৃষ্ণের এই তপস্যাপূত দিব্য আধ্যাত্মিক জীবন আজ উজ্জ্বল পথপ্রদর্শকরূপে বিরাজ করিতেছে,—আর তাঁহার অমৃতবর্ষী জীবন্ত উপদেশনিচয় জগৎকে অপার শান্তি ও আনন্দের অধিকারী করিয়া তুলিতেছে। আজ স্বতঃই মনে হয়, তাঁহার জন্ম ও সাধনা বিশ্বের বুকে এক নবচেতনার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস ভক্তহৃদয়ের চিরশান্তির উৎস-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সাধককুলচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই তীব্র ব্যাকুলতা—সত্য সন্ধিৎসু যুবকের সেই দিব্যোন্মাদনা—আজ এই শুভ দিবসে মানসপটে ভাসিয়া উঠিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ধূলিকণা তাঁর অবিরল প্রেমাশ্রুবর্ষণে এখনও পবিত্র ও ধন্য হইয়া রহিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে, বৃক্ষলতার প্রতি মর্মোচ্ছ্বাসে, বিহগনিচয়ের করুণকণ্ঠে, ঊর্মিবিহ্বল জাহ্নবীর অস্ফুট কলনাদে—জগন্মাতার দর্শনভিখারী পাগলপারা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আকুল আর্তনাদ আজও গভীর বেদনার সুরে জাগিয়া উঠিতেছে। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর এই ভক্ত সাধক পূতসলিলা ভাগীরথীর তটপ্রান্তে বসিয়া অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত বেদনার অর্ঘ্য অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া মাতৃচরণে উপহার দিয়াছেন। দিবাবসানে—'মা, এই যে আরও একটা দিন বৃথায়

চ'লে গেল ; কৈ মা, এখনও তো দেখা দিলি না, মা'—বলিয়া কতই না এই প্রেমিকহৃদয় আকুল আর্তনাদে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কত বিনিদ্র রজনী মাতৃনামে মাতোয়ারা এই সাধকের জীবনে কাটিয়া গিয়াছে,—কে তাহার সন্ধান করিয়া থাকে! তপঃক্লিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের এই তীব্র অনুরাগ ও কঠোর তপস্যা কেমন করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের গূঢ়রহস্যসকল তাঁহার নিকট প্রকট করিয়া দিয়াছিল,—আড়ম্বরবিহীন এই নীরব সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহার বিশাল হৃদয়ে কেমন করিয়া একদিন বিশ্বপ্রেম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল,—কেমন করিয়া লোক-কল্যাণকল্পে এই সিদ্ধসাধক তাঁহার সাধনালব্ধ অমূল্য রত্নরাজি জগৎকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন,—আজ যেন আমাদের নিকট সাধনার সেই জ্বলন্ত ইতিহাস ও তাঁহার মাধুর্যমণ্ডিত জীবনকাহিনী অতীতের কিংবদন্তীতে পরিণত না হয়।

হে ভক্ত সাধক, যদি নিজ জীবনে সেই চরম সত্য উপলব্ধি করিয়া চিরশান্তির অধিকারী হইতে ইচ্ছা কর, তবে এই মহামানবের সাধনপূত জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধীর অবিচলিত চিত্তে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হও ;—প্রাণের সমগ্র ব্যাকুলতা বিশ্বপিতার রাতুল চরণে অশ্রুজলে ঢালিয়া দিয়া মহাজন-প্রদর্শিত এই সাধনপথে বিচরণ কর। তবেই জীবনের সমস্ত পূজা সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে—জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই তীব্র ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতাই আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল ও উপজীব্য। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ-ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে ; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় ; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ? ডাকার মত ডাকতে হয়।···ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হয়। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।···কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে,—এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র

করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন-লাভ হয়।' তিনি আবার বলিতেছেন—'বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বালকের মত বিশ্বাস।...মনে খুব জোর জ্বলন্ত বিশ্বাস। এমন বিশ্বাস চাই যে, ভগবানের নাম করেছি, আমার আবার পাপ! হনুমান রামনামে বিশ্বাস ক'রে সমুদ্র ডিঙিয়ে গেল।...যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতকও করে...তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে জিনিস নাই।' আজ এই শুভ দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-বোধিদ্রুমমূলে বসিয়া যেন তাঁহারই শ্রীকণ্ঠোচ্চারিত এই মধুর বাণী হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি,—আর যেন দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥*

তবেই ঠিক ঠিক তাঁহার পূজা সার্থক ও জীবন্ত হইয়া উঠিবে,—তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকী কল্যাণপ্রসবিনী হইবে।

ঋষির দূরপ্রসারিত দৃষ্টি লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যে সমন্বয়ের উদার-বার্তা এই কলহমুখর জড়সভ্যতার যুগে জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্নরুচিসম্পন্ন হইয়াও কেমন করিয়া মানুষ নিজ প্রকৃতিসম্মত সাধনপথ অবলম্বন করিয়া সেই চিরসুন্দরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়,—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও তাঁহার সার্বজনীন শিক্ষার ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজ জীবনে সমস্ত ধর্মমত উদ্‌যাপন করিয়া এক মহাসামঞ্জস্যে উপনীত হইয়াছিলেন;—তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রত্যেক ধর্মের আবরণে

* এই যোগাসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাক্; ত্বক্-অস্থি-মাংস ধ্বংস হইয়া যাক্। তবুও বহুকল্পদুর্লভ সেই আত্মজ্ঞান লাভ-না-হওয়া-পর্যন্ত এই যোগাসন হইতে এ শরীর বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না।

একই চরম সত্য নিহিত রহিয়াছে। বিভিন্ন পথ বাহিয়া মানব সেই একই সত্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। শাস্ত্র তাঁহার এই উদার বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।—

(শিবমহিম্ন-স্তোত্র, ৭ম শ্লোক)

ঋক্-সামাদি বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত বা বৈষ্ণব শাস্ত্র,—প্রত্যেকেই স্ব স্ব মতকে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ বিভিন্ন নদনদী ঋজু-কুটিল নানা পথ বাহিয়া পরিণামে যেমন এক অনন্ত সিন্ধুসলিলেই মিলিত হইয়া থাকে, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু মানব বিভিন্ন সাধন-পথ অবলম্বন করিয়া চিরসুন্দর এক তোমারই উদ্দেশ্যে অনন্তকাল ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে-- তুমিই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও গম্যস্থল। অন্তিমে সেই প্রেমসিন্ধুসলিলে অবগাহন করিয়া তৃষিতমানবপ্রাণ চিরচরিতার্থতা লাভ করিবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কহিয়াছেন—'মহাসাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে এ সাগরে পড়্তে পারলেই হ'ল। ** যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে। *** ঈশ্বরলাভ করতে হ'লে একটা পথ জোর ক'রে ধ'রে যেতে হয়। আর সব মতকে এক-একটি পথ ব'লে জানবে; আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়, বিদ্বেষভাব না হয়।' তিনি আবার বলিতেছেন—'তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ God; কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ বলছে রাম, হরি, যিশু, দুর্গা। *** যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট, এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। আর এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরেজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'—তিন এক; কেবল নামে তফাৎ।'—শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতার সহিত স্ব স্ব ধর্মে অবস্থান

করিয়া সাধনসাগরে মগ্ন হইলে কালে সেই এক পরম সত্যেরই অধিকারী হইতে সমর্থ হইবে। ভারতের এই উদার আদর্শ—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' (১) (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬); 'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।' (২) (গীতা ৪।১১)—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা এই শতবার্ষিকীর দিনে যেন তাঁহার জীবন-বেদের সেই 'যত মত তত পথ' রূপ সমন্বয়বাণীর গভীর তাৎপর্য হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে পারি, আর প্রত্যেকের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বের বুকে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির অমিয়ধারার সৃষ্টি করিয়া তাঁহার যুগকল্যাণ-কার্যের যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারি।

এই ভারতবর্ষ ত্যাগের অপূর্ব লীলানিকেতন। তাই যুগে যুগে ভারতের আধ্যাত্মিক সৃষ্টির মূর্তবিগ্রহ সর্বত্যাগী বুদ্ধ ও শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতে ত্যাগের মহিমাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্' (ঈশোপনিষদ্, ১); 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।' (কৈবল্য ১।২)। (৩) ভারত ত্যাগের এই মহিমময় আদর্শ বিস্মৃত হইয়া ইহকালসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য জড়-সভ্যতার আপাতমধুর আদর্শের পানে যখন ছুটিতেছিল,—ভারতের সেই মৌন-সন্ধিক্ষণে ত্যাগের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ভোগ-মুখরিত কলিকাতার প্রান্তভাগে প্রকৃতির নগ্ন শিশুর মত ভারতের, তথা পাশ্চাত্ত্য জগতের সম্মুখে ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ পুনঃ প্রকট করিয়া বেদের সেই শাশ্বতবাণী সার্থক ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; জগৎকে দেখাইয়াছেন—ভোগের দ্বারা চিরশান্তির অধিকারী হওয়া

---

(১) সৎস্বরূপ তিনি এক,—ঋষিগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

(২) হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

(৩) সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা আত্মার অদ্বৈত-নির্বিকার ভাব রক্ষা কর; কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। সকাম কর্ম, প্রজাসৃষ্টি বা অতুল ঐশ্বর্য দ্বারা তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) লাভ করা যায় না; একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

সম্ভব নয়;—নিজ জীবনে সেই মহাব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া সকলকে ত্যাগের দিকে—শান্তির দিকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'ত্যাগ না হ'লে কেমন ক'রে তাঁকে লাভ করা যাবে? যদি একটা জিনিসের পর আর একটা জিনিস থাকে, তা হ'লে প্রথম জিনিসটাকে না সরালে, কেমন ক'রে আর একটা জিনিস পাবে? নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। * * * ঈশ্বর শুদ্ধমনের গোচর; তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। কাম-কাঞ্চনের লেশমাত্র থাকলে তাঁকে জানা যায় না। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি ত্যাগ করলে মন শুদ্ধ হয়—সেই শুদ্ধমনে তাঁর দর্শন হয়।' অধিকন্তু, তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা অন্তর-দেবতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাল্যাবধি অর্থকরী বিদ্যার প্রতি তিনি বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন এবং নিজ জীবনেও দেখাইয়া গিয়াছেন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, বিবেক-বৈরাগ্য, প্রেম-ভক্তিই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র উপায় ও জীবনের অফুরন্ত পাথেয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—'শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাস্ত্র প'ড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়; কিন্তু ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর তিনি জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভুলাতে পারবে; কিন্তু তাঁকে পারবে না। * * * শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে তারপর সাধন করতে হয়। এই সাধন ঠিক-ঠিক হলে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।' শ্রুতি বলিতেছেন—

> 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা নিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
> নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
> নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥'—
> (কঠ-উপনিষৎ, ১।২।২২-২৩)

> নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ
> তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা
বিশতে ব্রহ্মধাম ॥
(মুণ্ডক উপনিষৎ, ৩।২।৪)

অর্থাৎ, কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না; কেবল মেধা (ধারণা-শক্তি) দ্বারা কিম্বা বহুল শাস্ত্রশ্রবণেও আত্মাকে লাভ করা যায় না। পরন্তু, এই ঈশ্বর ভক্তিভরে আরাধিত হইয়া যাঁহাকে আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন; কারণ, তিনি (ঈশ্বর) তাঁহার নিকটই আত্ম-স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। যে লোক শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে বিরত নহে, সংযতেন্দ্রিয় ও সমাহিতচিত্ত নহে এবং যে লোক ভোগস্পৃহারহিতও নহে, সে লোক আত্মাকে জানিতে সমর্থ হয় না; বস্তুতঃ কেবল এক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই আত্মা বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না; এবং আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ কিম্বা সন্ন্যাস-রহিত তপস্যা দ্বারাও ইহার লাভ হয় না। পরন্তু, যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে—বল, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাসসহকৃত তপস্যা দ্বারা—যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই এই ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে।'

বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মস্পর্শী উপদেশের প্রতি ছত্রে ভারতের এই বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—ভারতের ত্যাগ ও বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা ও সার্বজনীনতা নূতন ছন্দে তাঁহার সাধনার স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শৈব কি শাক্ত, ব্রাহ্ম কি বৈষ্ণব, খৃষ্টান কি মুসলমান —সকল ধর্মের মূল সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে একমাত্র ত্যাগের উচ্চাদর্শে জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে,—ভোগের পঙ্কিল পথ ত্যাগ করিয়া 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, বলিয়া ঋষিগণ যে পথকে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই অমৃতাভিসারী সনাতন পথাবলম্বন করিয়া জীবনে চরম মতের দিকে চলিতে হইবে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—এতদ্ব্যতীত অমৃতত্বলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসজীবনের অপূর্ব মিলন-ভূমি।

একদিকে তিনি যেমন আদর্শ গৃহীরূপে জীবনযাপন করিয়া ভোগবিলাস-মগ্ন জগতের সম্মুখে বিবাহিত জীবনের অতি উজ্জ্বল ছবি জীবন্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—নারীত্বকে মাতৃত্বের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতে নারীর ন্যায্য স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; আবার তেমনি সন্ন্যাসধর্মের ভাস্বর ও পবিত্র আদর্শ জীবনে উদ্‌যাপিত করিয়া উহাও চিরসুন্দর ও মধুর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভোগাসক্ত মানব সংসারের বিপুল ভোগায়োজনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া ত্যাগের সুনির্মল আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের সনাতন সন্ন্যাসধর্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়া ত্যাগের পথ, তথা মুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসজীবনের কঠোর ব্রতোদ্‌যাপনকল্পে নির্মম-ভাবে অন্তরের নিগূঢ় বাসনারাশি উন্মূলিত করিয়া এই সন্ন্যাসীপ্রবর কিরূপ অবিচলিত চিত্তে ক্ষুরধার সন্ন্যাসমার্গে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সন্ন্যসীমাত্রেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি শ্রীমুখে সন্ন্যাসী-গণকে কতবার সতর্কবাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন—'তাই তো, মাড়োয়ারী যখন হৃদয়ের কাছে টাকা জমা দিতে চাইলে, আমি বললাম, তা তো হবে না; কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্য বটে, আর লোকশিক্ষার জন্যও। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত হয়, জিতেন্দ্রিয় হয়, তবু লোকশিক্ষার জন্য কামকাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে লোকের সাহস হবে। তবেই তো তারা কামকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে। এ ত্যাগশিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয়, তবে কে দেবে? *.* * চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন * * * সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু। তাঁকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।' তাই,—হে সন্ন্যাসী, তুমি যে গৈরিকরাগ-রঞ্জিত পতাকাহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণপদতলে তাঁহারই কর্মসাধনের জন্য দাঁড়াইয়াছ, সে বিজয়-বৈজয়ন্তী কখনও পৃথিবীর ধূলিকণায় ধূসরিত ও কলঙ্কিত হইতে দিও না। সংযম ও তিতিক্ষা, বিবেক ও বৈরাগ্য, বীর্য ও উৎসাহ, ভক্তি ও পবিত্রতা সম্বল করিয়া স্ব স্ব জীবনে আত্মজ্ঞান

লাভ করিয়া ধন্য হও; আর তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অকুতোভয়ে ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তাঁহারই মহিমা জগতে ঘোষণা কর। তাঁহারই মহামন্ত্রে দীক্ষিত তোমরা জ্ঞান-সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে জগতের অন্ধকার দূর করিয়া মানবকে চিরশান্তি ও আনন্দের অধিকারী করিয়া তোল। ধৈর্য ও ক্ষমা, শান্তি ও সত্য, দয়া ও সংযম তোমার নিত্য সহচর হউক—তোমার জীবন ধন্য ও মধুময় হইবে—তুমি নির্ভয় হইবে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥

এস, আজ এই পুণ্যদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ ভারতের একনিষ্ঠ সেবক বিশ্ব-বিশ্রুত সন্ন্যাসীকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মিলিতকণ্ঠে বলি—

পাশাংশ্ছিন্ধি ততঃ স্বকাংশ্চ সততং, যে ত্বাং নিবধ্নন্তি বৈ
সৌবর্ণ্যাংশ্চ তথা চমৎকৃতিমতো, লোহাদিযুক্তাংশ্চ বা।
রাগদ্বেষশুভাশুভং চ সকলা, দ্বন্দ্বাবলী দূয়তাং
সন্ন্যাসিন্! ভব বীরভাবভরিতঃ, সূদ্গীথ উদ্‌ঘোষ্যতাম্।—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

এই অদ্ভুত মানুষ পুরুষ যখনই যেখানে যাইতেন, তখনই সেখানকার চারিদিকে একটা ভাবজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইত। আমার মন এখনও সেই জ্যোতিঃসাগরে ভাসিতেছে। যখনই তাঁহার সহিত দেখা হইত, তিনি কেমন একটা অলৌকিক ও অব্যক্ত করুণা বিতরণ করিতেন। আমার মন এখনও তাহার যাদুপ্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। কেন? তাঁহার সহিত আমার কিসের মিল? আমি য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন, সভ্য, আপনসর্বস্ব অর্ধসন্দেহী তথা-কথিত বিচারপরায়ণ সুশিক্ষিত ব্যক্তি, আর তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত, আনকোরা, অর্ধ-পৌত্তলিক, বান্ধব-পরিশূন্য হিন্দু সাধু। কেন আমি তাঁহার নিকট গিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া আসিতাম? আমি ডিজরেলী, ফসেট, ষ্ট্যানলি, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি য়ুরোপীয় সমস্ত জ্ঞানী ও গুণীর বচন শুনিয়াছি, খৃষ্টের ভক্ত ও অনুরক্ত, উদারচিত্ত কৃশ্চান পাদরী ও প্রচারকদের আমি বন্ধু এবং গুণগ্রাহী, আমি সুসংস্কৃত ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠ কর্মী। আমি কেন তাঁহার কথা শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতাম? মাত্র আমি নয়, আমার মত কত কত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। বহুলোক তাঁহাকে দেখিয়া যাচাই করিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ বহু বহু লোক তাঁহার দর্শন করিতে ও কথা শুনিতে আসিতেছে। আমাদের কোন কোন অতি ধূর্ত পণ্ডিত মূর্খ তাঁহার মধ্যে কিছুই প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কোন ঘৃণিত খৃষ্ট মিশনারী তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন বা ভণ্ড বলিয়াছে। আমি তাহাদের সমালোচনা ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। তাই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই লিখিতেছি।

এই হিন্দু সাধুর বয়স চল্লিশের কিছু কম হইবে। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ। শরীর বেশ স্বাভাবিক সুগঠিত হইলেও যে ভয়ানক কঠোরতার মধ্য দিয়া তিনি আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে যেন তাঁহার

দেহ কিছু বিকল হইয়াছে। তবু, তাঁহার মুখখানি সদানন্দ, শিশুর মত কোমল,—অহমিকাশূন্য, বিনয়মণ্ডিত। এমন হাসি আমি আর কাহারও মুখে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হিন্দু সাধু সাধারণতঃ বাহিরের খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখেন, গেরুয়া পরেন, তাঁহাদের খাইবার কড়াকড়ি থাকে, সকলের সহিত মিশিতে চাহেন না, জাতিভেদ খুব ভাল করিয়াই মানেন এবং জ্ঞানী বলিয়া গর্ব করেন। হিন্দু সাধু সর্বদাই 'গুরুজী'। যাদু বিভূতি তিনি বিতরণ করেন, কিন্তু এই মানুষটির ঐ সব কিছুই নাই। সকলে যেমন খায় পরে, ইনিও তেমনি খান পরেন ; তবে সেদিকে মোটেই যত্ন নাই। প্রত্যহ তিনি জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘন করেন। 'গুরু' বলিলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। যদি কেহ তাঁহাকে বিশেষ কোনও সন্ধান দিতে বলে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং বলেন যে, কোনও যাদু বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি তাঁহার মোটেই নাই। কেহ তাঁহাকে মান দিতে চাহিলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। বিষয়াসক্ত ও পশুবৃত্তি মানুষের সঙ্গে তিনি এড়াইয়া চলেন। বাহিরে তাঁহাকে অদ্ভুত কিছুই মনে হয় না। তিনি যে ধর্মের কথা বলেন, তাহা মাত্র সুপারিশ বা ইঙ্গিত। তাঁহার ধর্মমত গোঁড়া হিন্দুধর্ম হইলেও একটু বিশেষ রকমের। রামকৃষ্ণপরমহংস কোনও বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিকও নহেন। তবু তিনি সবই। তিনি শিবপূজা করেন, কালীপূজা করেন, রাম বা কৃষ্ণের তিনি ভক্ত এবং বৈদান্তিক মতবাদও সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনি সকল ধর্মমত মানেন, সকল আচার-অনুষ্ঠান এবং সকল ধর্মেরই উপাসনা-পদ্ধতিরও সমর্থন করেন। সমস্তই তাঁহার নিকট নির্ভুল। তিনি সাকার উপাসক হইলেও নিরাকারের সিদ্ধ সাধক। এই নিরাকার ভগবানকে তিনি বলেন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। অন্যান্য হিন্দু সাধুর উপাসনায় যেমন খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে—পুষ্প, চন্দন, ধূপ, নৈবিদ্যের দ্বারা বাহ্য অর্চনার আয়োজন আছে, তাঁহার উপাসনায় তেমন কিছু বাঁধাবাঁধি নাই। তাঁহার ধর্ম হইল এক

মহাভাব। তাঁহার উপাসনা হইল অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি, এক অলৌকিক প্রেম ও বিশ্বাস, দিবারাত্র নিত্য তাঁহাতে জ্বলিতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্তরাগ্নি যেন বাক্য হইয়া তাঁহার আলাপে ও কথায় বাহির হইয়া আসিতেছে। দেহে দুর্বল হইলেও তিনি যেন অন্তরে চিরসবল। প্রায়ই তিনি সমাধিমগ্ন হন। এই সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আপনার আধ্যাত্মিক দর্শনাদির কথা বলিতে বলিতে বা সেইরূপ কিছু শুনিতে শুনিতে তাঁহার এই অবস্থা হয়। তবু সকল হিন্দু দেবতাকে সমভাবে তিনি শ্রদ্ধা কি করিয়া করিতে পারিলেন ? এই ঐক্যবোধের মূল সূত্রই বা কি ? তিনি বলেন—নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের পরিবর্তন নাই। এক-একটি দেবতা হইল এক-একটি শক্তি—সেই অখণ্ড সত্তার এক-একটি বহিঃপ্রকাশ।

পশুভাবকে তিনি ভয় করেন—এবং তাহার হাত হইতেও মুক্তি পাইয়াছেন। যে মাকে তিনি পূজা করিতেন—সেই কালী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক নারী হইল তাঁহারই মূর্তি। তাই তিনি প্রত্যেক নারীকে জননীর মান দিয়া আসিতেছেন। নারী দেখিলে, এমন কি, একটি ক্ষুদ্র বালিকা দেখিলেও তিনি মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করেন। পুত্র যেমন মাকে পূজা করে, অনেক নারীকে তেমনই তিনি পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহার নিষ্কলুষ ভাব এবং স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার আচরণ অপূর্ব ও শিক্ষাপ্রদ। ইহা য়ুরোপীয় আদর্শের একেবারে বিপরীত। এই ভাব জাতীয় মহা ঐশ্বর্য। হিন্দু নারীর সম্মান দেখাইতে জানে এই কথা সত্য—সত্য—অতি সত্য।···

···আর এক পাপ হইতে তিনি মুক্ত করিয়াছেন—ধনস্পৃহা। অর্থ দর্শনমাত্রে তাঁহার মধ্যে অদ্ভুত ভীতিভাব প্রকাশ পায়। তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রের মূল কথাই হইল—কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ। দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। এক হাতে সোনা ও এক হাতে মাটি লইয়া তিনি উভয় হস্তের দিকে তাকাইয়া বার বার সোনাকে মাটি এবং মাটিকে সোনা বলিতে বলিতে এ-হাত ও-হাত করিতেন। এই

করিতে করিতে স্বর্ণ-মৃত্তিকা-ভেদ তাঁহার ঘুচিয়া গিয়াছিল। নির্লোভ ত্যাগই হইল তাঁহার সেবাদশ।...

তিনি মাত্র হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করেন না। অনেকদিন ধরিয়া তিনি মুসলমান ধর্মমতে উপাসনা করিয়াছেন— তিনি দাড়ি রাখিতেন, মুসলমান খানা খাইতেন, অবিরাম কোরাণ হইতে বয়েৎ আওড়াইতেন। যিশু-খৃষ্টকেও তিনি গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করিতেন। যিশু নাম করিলেই তিনি নমস্কার করিতেন। আমাদের মনে হয়, তিনি দুই-একবার গির্জাতেও গিয়াছিলেন। এই সকল হইতে এই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাধুর ধর্ম-সংস্কারের উদার ভাব প্রকাশ পায়।

...তিনি কখনও লিখেন না, তর্ক করেন না, বা অন্যকে শিক্ষা দিবার চেষ্টাও করেন না। কেবল তাঁহার অন্তর হইতে বাণীরূপে আত্মা অবিরাম আত্মবিকাশ করিতেছে। তিনি গান করেন— চমৎকার। এক-একটি কথা বলেন, তাহাতে মনে হয়, এত বড় জ্ঞানী বুঝি আর হয় নাই। শাস্ত্র-পুরাণের এক-একটি কঠিন বচনের সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারে এমন ব্যাখ্যা তিনি করিয়া বসেন, যাহাতে বচন-গুলি সরল হইয়া যায়। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মূলনীতির ব্যাখ্যা এমন পরিষ্কারভাবে তিনি করেন যে, মনে হয় না, লোকটা অশিক্ষিত।

তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া রাখিতে পারিলে অপূর্ব জ্ঞান-গ্রন্থ হইত। তাঁহার মতামত যদি লিখিয়া রাখা যায়, তাহা হইতে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, অতীতের অনধীত জ্ঞান ও ভবিষ্য দৃষ্টির দিন বুঝি আবার ফিরিল। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কথার অনুবাদ করা বড় শক্ত।

হিন্দুধর্মের মাধুর্য ও গভীরতার জীবন্ত প্রমাণ হইল এই ধর্মপ্রাণ সাধু। তিনি পূর্ণভাবে দেহ জয় করিয়াছেন। তিনি আত্মারাম আনন্দময়, পবিত্রতার অবতার, তিনি ধর্মপুরুষ। এই সিদ্ধ হিন্দু যোগী যে সংসারের মিথ্যা ও মায়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাইয়া প্রত্যেক হিন্দুর অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান

বই তাঁহার অন্য চিন্তা নাই, অন্য কাজ নাই—ভগবান ছাড়া তাঁহার অতি সরল জীবনে কেহ আত্মীয়-বান্ধব নাই। ভগবানই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহার অকলঙ্ক পবিত্রতা, তাঁহার অব্যক্ত গভীর প্রেম, তাঁহার অনধীত অনন্ত জ্ঞান, শিশুর মতন তাঁহার প্রশান্ত নিশ্চিন্ততা, তাঁহার সর্বজীবে ভালবাসা, তাঁহার সর্বদ্রাবী ভগবৎপ্রেমের পুরস্কার আর কি হইবে?

আমাদের ধর্মাদর্শ অন্যরূপ হইলেও যতদিন তিনি জীবিত রহিবেন, পদতলে বসিয়া বিষয়বুদ্ধিহীনতা, পবিত্রতা ও ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে আমরা তাঁহার উপদেশ নিত্য শুনিব।

ব্রাহ্মভক্ত ও প্রচারক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের 'থিষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ' পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

'তুমি ঈশ্বর দেখতে চাও? আমি তোমাকে এখনি দেখিয়ে দিতে পারি।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'গুণদর্শনই ঈশ্বরদর্শন।'

শুধু গুণ দেখো। যে পরিমাণে গুণ বিকশিত, সেই পরিমাণে ঈশ্বর প্রকাশিত। জল কোথাও ধানের শিষে শিশির বিন্দু, কোথাও গেড়ে-ডোবা, কোথাও সরোবর-দীঘি, কোথাও হ্রদ, কোথাও নদী, কোথাও সমুদ্র। জল দেখো। কোনোখানে প্রদীপ, কোনোখানে মশাল, কোনোখানে বা আবার দাবানল। আগুন দেখো।

যেখানেই গুণ দেখেন, সেখানেই মাথা নোয়ান ঠাকুর। সে বীণকার মহেশ সরকারই হোক বা বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরই হোক।

কাশীতে এসেছেন। মথুরবাবুকে বললেন, "মহেশের বীণা শুনবো।'

কোনো একটা এঁদো বিশ্রী গলিতে মহেশের বাসা। সেখানে মথুরবাবুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ গেলে মথুরবাবুর মান থাকে না। তাই মথুরবাবু বললেন, 'বেশ তো, খবর পাঠাই মহেশকে, আমার বৈঠকখানায়ই সে আসর জমাক।'

মথুরবাবুর নিমন্ত্রণ পেলে মহেশ কৃতার্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠাকুর থ বনে গেলেন। বললেন, 'সে কী কথা। মহেশ কেন আসতে যাবে? আমি যাবো তার বাড়ি। তার বাড়ি তো এখন তীর্থ, সেখানে স্বয়ং সরস্বতীর আবির্ভাব। আমি সেখানে গিয়ে আমার প্রণাম রেখে আসবো। সেখানে তার বাজনাই তো শুনবো না, দেখবো বীণাপাণিকে। সে আসবে না। আমি যাবো। আমিই পিপাসু। আমিই তীর্থঙ্কর।'

তাই সেদিন বললেন মাষ্টারমশাইকে, 'আমার বিদ্যাসাগরকে দেখতে বড়ো সাধ হয়। একদিন নিয়ে যাবে তার কাছে?'

কতো গুণ! কতো দয়া!

একটা ঝাঁকামুটে কলেরা হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, তাকে কোলে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখে বন্ধ করেছে দুধ খাওয়া। ঘোড়ার কষ্ট দেখে চড়ে না আর ঘোড়ার গাড়ি। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে সাঁতরে পার হলো দামোদর। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অনৈক্য হতেই এক কথায় ছেড়ে দিলো চাকরি, কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ। আর কতো বড়ো পণ্ডিত, বিদ্যায় কী অগাধ অনুরাগ।

বিদ্যাই তো সব! বিদ্যা থেকেই ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম। বিদ্যা থেকেই বিনয়, অনহঙ্কার, শরণাগতি। বিদ্যাই ঈশ্বর-মন্দিরে শেষ তোরণ।

বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন মাষ্টারমশাই। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চান।'

'পরমহংস?' বিদ্যাসাগর অবাক মানলেন। 'কেমনতরো পরমহংস? গেরুয়া-টেরুয়া পরে নাকি?'

মাষ্টারমশাই বললেন, 'আজ্ঞে না। সে এক আশ্চর্য পুরুষ। সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী, আবার সংসারী হয়েও সন্ন্যাসীর শিরোমণি। লালপেড়ে কাপড় পরেন, গায়ে জামা রাখেন, পায়ে বার্নিসকরা চটি জুতো। গাছতলায় ধুলোমাটিতে পড়ে থাকেন না, রাসমণির কালী-বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে বাস করেন, তক্তাপোশে বিছানা পেতে দিব্যি মশারি খাটিয়ে শোন্—'

'তাহলে বৈশিষ্ট্য কি?'

'একেবারে বালকের মতো। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না, সর্বক্ষণ মা নামে মাতোয়ারা।'

'নিয়ে এসো একদিন।'

খালের পোল পেরিয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়েছে ঘোড়ার গাড়ি। এবার পড়বে বাদুড়বাগান। এর পরেই বিদ্যার সমুদ্র।

ভাবাবেশ হলো ঠাকুরের। এখন আর অন্যকথা ব'লো না, শুধু বিদ্যার কথা বলো। যে জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অক্ষয় পুরুষকে জানতে শেখায়, সেই বিদ্যা।

ফটক পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কোনো দোষ হবে না?'

'না, দোষ হবে না।' বললেন মাষ্টারমশাই, 'আপনার কিছুতে দোষ নেই। আপনার দরকার নেই বোতামে।'

'নেই!' নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর।

এই বিদ্যাসাগর! পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতো, গায়ে হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। প্রসন্ন প্রশস্ত মুখ, উন্নত ললাট, শুভ্র দাঁত। খর্বদেহ সংহত তেজঃপুঞ্জ!

বিদ্যাসাগরকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।'

'আমি সিদ্ধ?' থমকে গেলেন বিদ্যাসাগর। 'কৈ, আমি তো সাধন-ভজন করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, ঘুরি না তীর্থে-ঘাটে, আমি —আমি সিদ্ধ হলাম কি করে?'

ঠাকুর বললেন, 'সিদ্ধ হতে হলে সাধন-ভজন করতে হয় না, যেতে হয় না মঠে-মন্দিরে।'

'তবে?'

'সিদ্ধ হলে কি হয়? আলু-পটল যখন সিদ্ধ হয় তখন কি হয়?' সহাস্য বয়ানে জিগ্যেস করলেন ঠাকুর, 'বলো কি হয়? নরম হয়। তোমার হৃদয়ও পর-দুঃখে দ্রবীভূত হয়েছে। তুমি নরম হয়েছো। সুতরাং তুমি সিদ্ধ।'

পরও যা পরমও তাই। তুমি পরের দুঃখে কাঁদছো, তার মানে তুমি ঈশ্বরের দুঃখে কাঁদছো। নইলে যে সত্যি পর তার মধ্যে তুমি তোমার আপনজনকে দেখছো কি করে? যে আর্ত সেই তোমার পরমাত্মীয়, তোমার ঈশ্বর। পরোপকারই ঈশ্বর সাধনা।

'কিন্তু জানেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'কলাই বাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তুমি কি বাটা ডাল? তুমি আস্ত ডাল। তুমি একটা গোটা মানুষ। যারা শুধু পণ্ডিত তারাই দরকচা-পড়া। যেমন খুব উঁচুতে উঠেও শকুনের ভাগাড়ের দিকে নজর তেমনি শুধু পণ্ডিতগুলো উঁচুতে উঠেও বিষয়েই আবদ্ধ। কিন্তু তুমি তো শুকনো ডাঙা নও, তুমি সাগর। শুষ্ক পণ্ডিত নও, তুমি বিদ্যার অম্বুনিধি। বিদ্যা থেকেই দয়া, বিদ্যা থেকেই ভক্তি, বিদ্যা থেকেই বৈরাগ্য।'

একঘর লোক শুনছে মুগ্ধ হয়ে।

'তাই', বললেন ঠাকুর, 'আজ বড়ো আনন্দের দিন। আজ সাগরে এসে মিললাম। এতোদিন শুধু খাল-বিল, নদ-নদীই দেখেছি, আজ আমার সমুদ্র দর্শন।'

'সাগরে যখন এসে মিললেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'তখন কিছু লোনা জল নিয়ে যান।'

'লোনা জল কেন? তুমি ক্ষীর-সমুদ্র।'

'আর তুমি? তুমি অমৃতের পারাবার। গুণী না হলে কি গুণ দেখে? ভালো না হলে কি ভালো বলে?'

'তোমার মধ্যে দেখছি আমি ঈশ্বরের শ্রী, সমস্ত রূপিণী বিদ্যামূর্তি।'

আসলে মানুষের শুধু দুটো দুঃখ। এক দুঃখের নাম অহঙ্কার, আরেক দুঃখের নাম পরশ্রীকাতরতা।

ঠাকুর বললেন, 'অহঙ্কার যখনই মনে এই জিজ্ঞাসা আসবে তখনই জাগবে দীনতা। অহঙ্কারের উৎখাত হবে।'

যদু মল্লিক বললো, তুমি হরি-হরি করতে পারো, আমি কেন টাকা-টাকা করতে পারবো না? টাকার মধ্যে কি ঈশ্বর নেই?'

ঠাকুর বললেন, 'বল্ ঈশ্বরের টাকা তোর টাকা নয়। তোকে অবলম্বন করে ঈশ্বর বিত্তরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই এ তোর কৃতিত্ব নয়, এ ঈশ্বরের কৃপা। যখন নিজের সাফল্যে ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কৃপা দেখবি তখন আর কিসের অহঙ্কার?'

তেমনি পরশ্রী মানে পরমের শ্রী। পরমের শ্রীকে দেখে কি কেউ কাতর হয়? এক আকাশ তারা বা এক মাঠ ফুল কি মানুষকে দুঃখিত করে? কখনো না—উল্লসিত করে। গহন পার্বত্য অরণ্যে একটি কলস্বরা নির্ঝরিণী আবিষ্কার করলে মানুষ করতালি দিয়ে ওঠে। ভোরে-জাগা এক গাছ পাখির কাকলি শুনে কূল-ভাঙা গান জাগে হৃদয়ে। কোথাও তিনি বিত্তের শ্রী, বিদ্যার শ্রী, শক্তির শ্রী, দীপ্তির শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন। তাই পরশ্রীতে কাতর না হয়ে আনন্দিত হও। পরশ্রী-কাতর নয় পরশ্রী-আনন্দিত।

'তাই যদু মল্লিকের মধ্যে আমি টাকা দেখি না, বৈভবরূপী বিভুকে দেখি। শ্রীদর্শনই ব্রহ্মদর্শন।'

'কী ব্রহ্ম?' জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

'ঐটিই মজা।' বললেন ঠাকুর, 'আর সব বস্তু মুখে আনা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

'আর সব বস্তু মুখে বর্ণনা করা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অবর্ণনীয়। কোনো রসনার সাধ্য নেই তার স্বাদের ব্যাখ্যা করে। তার সংজ্ঞা দেয় বা তার রূপরীতি জানায়-বোঝায়। সব তন্ত্র-মন্ত্র, শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গিয়েছে, তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, বলা হয়েছে, নির্ণয়-নিরূপণ হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্চারিত, অকথিত, অনিরূপিত। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

যে বোঝাবার নয় তাকে বোঝানো। যাকে রসনায় আনবার নয় তাকে বসানো হলো হৃদয়ে।

'কিছু খাবার দিলে কি ইনি খাবেন?' অনুচ্চ স্বরে মাষ্টারমশাইকে জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

শুনতে পেয়েছেন ঠাকুর। সরল খুশীতে বলে উঠলেন: 'দাও না।'

ব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগর অন্তঃপুরে ঢুকলেন। নিয়ে এলেন এক থালা মিষ্টি। বললেন, 'এ খাবার বর্ধমান থেকে এসেছে।'

'যেখান থেকেই আসুক, মধুর সব সময়েই মধুর।' ঠাকুর হাত বাড়িয়ে নিলেন সেই থালা।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন ঈশ্বর কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন ?'

'নিশ্চয়ই।' খেতে খেতে বলছেন ঠাকুর: 'তাঁর যেখানে যেমন খুশি। পিঁপড়েতেও শক্তি আবার হাতিতেও শক্তি। একজন পালিয়ে যায়, আরেকজন হারিয়ে দেয়। নইলে তোমার কাছে আসি কেন ? অন্যের তুলনায় তোমার দয়া বেশী, বিদ্যা বেশী, হৃদয় বেশী—তাই। নইলে তোমার তো আর শিং বেরোয়নি বা লেজ গজায়নি। আকাশের দিকে তাকাই কেন ? না, সেই তো বৃহতের শেষ সীমা।'

ঠাকুর থামলেন। একটু হেসে বললেন, 'এ-সব যা বলছি, কিছুই অজানা নয়। তবে কি জানো ? তোমার খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কতো কি রত্ন আছে তা বরুণ রাজাই জানে না।

'অনেক বাবু আছেন যাঁরা বাড়ির চাকর-বাকরেরই নাম জানেন না, বলতে পারেন না বাড়িতে কোথায় কি জিনিস আছে। আজে-বাজে জিনিস নয়, এমন কি দামী দামী জিনিস। যার জিনিস নেই সে গরীব নয়, যার জিনিস থেকেও জিনিসের জ্ঞান নেই সে-ই যথার্থ গরীব।'

ঠাকুরের খাওয়া হলো।

ঠাকুর বললেন, 'একবার যাবে রাসমণির বাগান দেখতে ?'

'যাবো বৈকি।' বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এলেন আর আমি যাবো না ?'

ঠাকুর ছি ছি করে উঠলেন। বললেন, 'আমার কাছে নয়, আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। যাবে গঙ্গাতীরে রাসমণির বাগান দেখতে।'

'সেকি কথা ?'

'ওহে, আমি হচ্ছি জেলে ডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, বড়ো নদীতেও যেতে পারি।' বললেন ঠাকুর, 'আর তুমি হচ্ছো জাহাজ। কি জানি, যদি যেতে গিয়ে চড়ায় ঠেকে যাও।'

'না, ঠেকবো কেন ? এখন তো ভরা বর্ষা।'

'হ্যাঁ, যদি নবানুরাগের বর্ষা নামে তাহলে আর ভয় নেই। তখন সর্বত্র উত্তাল-জলের উচ্ছলতা। তখন সব চড়া সব অহং-ঢিপি জলে ডোবা। তখন নেই আর মান-অপমান, নেই আর আমি-তুমি। তখন সব একাকার।'

ঠাকুর উঠলেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন।

ঠাকুর বললেন, 'যদি জানলে ভালবাসা এসেছে তখনই জানবে ঈশ্বর এসেছেন।'

শিব-শক্তি-রহস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তচিন্তামণি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের বিশ্বব্যাপী আনন্দের দিনে আজ পণ্ডিত শীলরের অমূল্য উপদেশবাণী আমার স্মৃতি-পথে উদয় হইতেছে। প্রতীচ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য শীলর বলিয়াছেন,—'তোমাদের একান্ত ভালবাসার সামগ্রী, তোমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকো, তাঁহারই রত্নগর্ভে তোমাদের মহান শক্তির বিপুল উৎস সকলের সন্ধান মিলিবে।—(Hold to your dear and precious native land. There are the roots of your strength—Schiller.)

আমরা বাঙালী। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। বাংলার আকাশ বাঙালীর সাধকের নিত্যহোমে প্রধূমিত, বাংলার বাতাস শ্রীভগবানের স্তোত্র-গুণকীর্ত্তনে সদা মুখরিত, বাংলার মাটি দেবীর আরাধনার পশু-বলিতে রুধিরাক্ত, বাংলার পল্লীপ্রান্তর শক্তি-সাধনার লীলাক্ষেত্র।

বাংলার শক্তি কোথায়? বাঙালীর সাধনার স্বরূপ কি? কোন্ দেবতার উপাসনা হইতে পীযূষধারা পান করিয়া বাঙালী আজিও বীর্যবান? কোন্ আদর্শের উদ্দীপনায় বাংলার প্রাণশক্তি এখনও মুখরিত হইয়া উঠে? বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন্ ধর্মের সেই মূর্তিমান বিগ্রহ কে?—এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ববাসী আজ অঙ্গুলি-নির্দেশে অভ্রান্তরূপে দেখাইয়া দিতেছে,—ঐ সাক্ষাৎ অপার করুণামূর্তি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,—যিনি সংসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকবর্গের বিশ্বাসগত মতবৈচিত্র্য ও সাধনাগত আচার-বিভেদের সত্যতা স্বীকার করিয়া সমপ্রয়োজনে সম্মিলিত আত্মনিয়ন্ত্রিত শক্তিরাশির উপর ধর্মরাজ্য-স্থাপনের উপদেশদানে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে আশা ও ভরসার সঞ্চার করিয়া আজ জগদ্গুরুরূপে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বব্যাপী এই যে জন্মোৎসব, ইহা

তাঁহাকে জগদ্‌গুরুরূপে বিশ্ববাসীর স্বীকারোক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সর্বকারণভূতা শক্তিই শ্রীগুরু ("শ্রীগুরুঃ সর্বকারণভূতা শক্তিঃ" —শ্রুতি)। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে, মন্নাথ জগন্নাথ, মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু। সর্বকারণভূতা শক্তি শ্রীগুরুই যুগে যুগে দিব্যোঘ দ্বার দিয়া অবনীতলে মানুষী তনুতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, বুদ্ধিবাদী পাষণ্ডকুলের বিনাশ জন্য, সম্প্রদায়-রক্ষার জন্য, সম্প্রদায়-সঙ্করের নিরোধ জন্য, মন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ প্রতিপাদন জন্য, তথা ব্রহ্মবিদ্যা রক্ষার নিমিত্ত নবীন সম্প্রদায় প্রবর্তন জন্য, সর্বকারণভূতা শক্তি শ্রীগুরু যুগে যুগে দিব্যোঘ দ্বার দিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ("বৌদ্ধ পাষণ্ড-বিনাশার্থং সম্প্রদায়ার্থং এব চ। সম্প্রদায়-সঙ্করাণাং নিষেধার্থং মহেশ্বরী। সম্প্রদায়স্থাপনার্থং ব্রহ্মণ্য-রক্ষণায় চ। মন্ত্রশাস্ত্রস্য সিদ্ধার্থং আবির্ভবতি পার্বতী")। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবকাল, তাঁহার দীক্ষা-শিক্ষা, সাধনা-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, তথা তাঁহার উপদেশ ও সম্প্রদায়-সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ধরাধামে, শ্রীগুরুর অবতরণ বিষয়ে উদ্ধৃত শিব-বাক্যের যাথার্থ্য সত্যসত্যই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভেদ। শক্তি লীলাতে অবতার। ঘুঁটির ভিতর মাছের মতন মানুষের ভিতর তিনি অবতরণ করেন। মানুষী তনুতে আপনার অবতরণ বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,—'এবার গুপ্তভাবে আসা। ছদ্মবেশে রাজ্য দেখবার জন্য আসা।'— কোথা হইতে আসিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, 'সপ্তর্ষিমণ্ডল ছাড়িয়া দিব্যধামেরও উপর জ্যোতির্ময় অখণ্ডের রাজ্য। সেখান হইতে।'

মানুষী তনুতে, বাঙালীর পর্ণকুটীরে জন্ম, বাংলার জল-মাটিতে পরিপুষ্ট, বাংলার দীক্ষা-শিক্ষা-সাধনায় প্রবুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সঙ্গীতটি এইজন্য বিচার-বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই শিব-শক্তি ইহার গ্রহ-স্বর। শিবশক্তি তাঁহার জীবন-সঙ্গীতের অংশে অংশে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত, এবং শিবশক্তিতেই তাহার চরম বিশ্রান্তি।

বস্তুতঃ শিক্ষা-দীক্ষায়, সিদ্ধি-সাধনায়, ভাবে-বিভাবে, আচার-অনুষ্ঠান-উপদেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-সঙ্গীতটি এই শিবশক্তির সহিত ওতপ্রোতরূপে একান্তভাবে বিজড়িত।

সর্বকারণভূতা শক্তি শ্রীগুরুর ন্যায় কুলাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্প্রদায় রক্ষার বিষয়ে বলিয়াছেন,—'যত মত তত পথ। সকল ধর্মই সত্য।' সম্প্রদায় সংস্কারের নিষেধ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'ও কথা এখানকার নয়,' 'ও আমাদের ঘরের নয়,' ইত্যাদি। ধর্মজগতে অধ্যাত্ম-সাধনায় 'বিশ্বাস' ও সম্প্রদায়' ব্যতীত যে কিছুই হইবার নয়, ইহা সাধকমাত্রই অবগত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার উপদেশাবলীতে এই দুইটির উপর যে বিশেষ জোর দিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। 'ইহা এইরূপই' এই যে নিশ্চিন্ত অবধারণ, তাহারই নাম 'বিশ্বাস'। ইহা মানসিক বিশিষ্ট ছন্দ বিধায় আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মাত্র। কিন্তু 'সম্প্রদায়টি' গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বহিরানুষ্ঠানসাপেক্ষ। সম্প্রদায়গত আচারটি বিহিতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মানসিক ছন্দের, তথা বহিঃপরিস্থিতির পরিণাম ঘটাইয়া অনুকূল আবহাওয়া, আকাশ-বাতাসের সৃষ্টি করিয়া থাকে—এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'আচার-পালনাৎ সত্যমতঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।'

অনেকের ধারণা, অবতার পুরুষ স্বয়ং সিদ্ধ। তাঁহার আবার দীক্ষা-শিক্ষা, সিদ্ধি-সাধনা কি? কিন্তু এই সকল কথা বিচারসহ নয়। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট, শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপনী মুনির নিকট, যীশুখ্রীষ্ট যোহনের নিকট, শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট, কৃষ্ণচৈতন্য কেশব ভারতীর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন, যাঁহারা পারোবর্যবিৎ, গুরুকরণ করিয়া যাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা বহুশ্রুত ও বিবিধ সাধনায় সিদ্ধ, ইষ্টোপাসনায় মন্ত্রসাধনায় মাত্র তাঁহারাই বহুজনসুখায় জগদ্ধিতায় শ্রীগুরুরূপে পথের সন্ধান দিবার অধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিহিতভাবে গুরুকরণ করিয়া, বহুবিধ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, জগদ্‌গুরুরূপে আজ বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে একটি বিশেষত্ব এই যে, এই অবতারে স্ত্রী গুরু, দৈবীভাবের সাধন ও মাতৃভাবের প্রচার। স্বামী অভেদানন্দ বলিয়াছেন—'অবতারকুলের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই নারীকে স্বীয় শ্রীগুরুরূপে বরণ করিয়া এবং বিশ্বে শ্রীভগবানের মাতৃভাব প্রচার করিয়া, জগতে অধ্যাত্মরাজ্যে নারীর মর্যাদা ও মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন।'

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনে শিক্ষক-রূপে বিভিন্ন গুরুর আবির্ভাবের কথা থাকিলেও তিনি যে নারীকেই আপনার প্রকৃত ও প্রধান গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনেতিহাস ও শাস্ত্রসাহায্যে সহজেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, বহু গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করিলেও ঠিক ঠিক সাধকের শ্রীগুরু মাত্র একজনই হইয়া থাকেন। শ্রুতি দেবী বলেন, 'গুরুরেকঃ।' সদাশিবের উপদেশ, 'গুরুরেকঃ কুলাগমে।' পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'ওরে, দুটো পতি কি হয় রে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, ভৈরবী যোগেশ্বরী, যিনি একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে অবস্থান করিয়া, বিভিন্ন সাধনায় তাঁহাকে সাহায্য করিয়া, উৎকট উৎকট সাধনসমূহে স্বয়ং উত্তর-সাধিকার আসন গ্রহণ করিয়া, আপন মন্ত্রপুত্রকে সিদ্ধির পর সিদ্ধিলাভে সহায়তা করিয়াছেন এবং পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শিষ্যের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র গুরু, 'রামকৃষ্ণ'-নাম তাঁহারই দান, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় দীক্ষা-শিক্ষা-সাধনা ও সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল।

'চতুর্বেদ-মূর্তি' ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীভবতারিণীর সজীব বিগ্রহরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন, 'চতুর্বেদেশ্বরী প্রোক্তা শ্রীমহাভবতারিণী।' সত্যসত্যই বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র-মন্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ, ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য

অবনতমস্তকে স্বীকার করিতেন। তিনি কেবল বহুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা নহে। 'মার্গ' ও 'দেশী' ভেদে যাবতীয় সাধনা মুমুক্ষুগণের সমাজে প্রচলিত ছিল, তৎসমুদয়ে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও 'খ্রীষ্টীয়ান' ও 'ইসলাম্' ধর্মের সাধনা করিয়াছিলেন কি না, জানা নাই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারও 'সমাধি' ও 'মহাভাব' যে হইত, ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। তিনি সর্বপ্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই প্রথম পল্লীতে পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের কথা নির্ভয়-হৃদয়ে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভাব লইয়া বসিয়া থাকিবে? প্রচার করতে বেরুবে না?'

ভৈরবী ব্রাহ্মণী যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা লীলাপ্রসঙ্গ-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দও উক্ত গ্রন্থের 'গুরুভাবের' পূর্বার্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 'ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর কাল' ধরিয়া ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে বিবিধ শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনা প্রদান করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ নাম যে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দান, একথাও স্বামী অভেদানন্দ বলিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পূর্ণাভিষেক' প্রদান করেন যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ণাভিষেকাখ্য সংস্কার এককালে সম্পাদ্য হইলেও শক্তি শাম্ভবী মান্ত্রী ভেদে ত্রিবিধ স্তরে ইহা বিভক্ত। শেষোক্ত স্তরে এই সংস্কারে শ্রীগুরু কর্তৃক শিষ্যের নামকরণ একটি অব্যভিচারী নিয়ম। এই নামটি দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী বা চতুরক্ষরী করিবার বিধান আছে। আপনার সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করান ও শিষ্যকে বিহিতভাবে নূতন নামে ভূষিত করিবার পর শ্রীগুরু স্বীয় গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত আপনার নামঘটিত 'পাদুকা' মন্ত্রটি প্রদান করিবার অব্যভিচারী নিয়ম ও পদ্ধতি গ্রন্থে তথা অন্যান্য শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এবার নিত্যানন্দের খোলে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ নিত্যানন্দের নামটি 'নিত্যানন্দরাম' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, 'নিত্যানন্দরাম' ও 'কৃষ্ণচৈতন্য' এই দুইটি নাম হইতে 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুইটি শব্দ গ্রহণ করিয়া শিষ্যকে 'রামকৃষ্ণ' এই চতুরক্ষরী নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে নাম রচনা করাও বিদ্বৎসমাজে কিছু নূতন নহে। 'তাণ্ডব' নৃত্যের 'তা' এবং 'লাস্য' নৃত্যের 'লা'টি লইয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের 'তাল'-পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপেই 'অহোরাত্র' শব্দের আদ্যন্ত বর্জন করিয়া জ্যোতিষী শাস্ত্রে 'হোরা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতামহ ৺মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশলতার নাম সকলের সহিত 'রামকৃষ্ণ' নামের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে ধারণা করিয়া থাকেন, 'রামকৃষ্ণ' নামটি পিতৃদত্ত নাম ; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা বিচারসহ নহে। কারণ, দেখিতে পাই যে, পরমহংসদেবের খুল্লতাত ৺রামকানাই মহাশয়ের দুইটি পুত্রের মধ্যে একটির নাম 'রামতারক', কিন্তু কনিষ্ঠটির নাম 'কালিদাস।'

পরমহংসদেবের নাম ছিল গদাধর। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। জন্মকুণ্ডলীদৃষ্টে জানা যায় যে, পরমহংসদেবের রাশ্যাশ্রিত নাম—'শম্ভুনাথ।' ইহাকেই স্মরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন,—'এ কি বসান শিব? এ যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, একেবারে 'পাতাল ফোঁড়া' শিব!'

সে যাহা হউক, ভৈরবী ব্রাহ্মণীই যে গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে ভূষিত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আসিয়াছিলেন অন্ততঃপক্ষে সেই সময়ে—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুরে পূজারীর পদে ব্রতী হইয়া পূজা করিয়াছিলেন। পঞ্চবটী ক্ষেত্রটি তাঁহারই রচনা। তিনি বৃন্দাবন হইতে ধূলি আনিয়া যে পঞ্চবটীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, একথা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিষ্ণুঘরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর যে উপাসনা, তাহা

বাহ্যাভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। বহির্যাগে যাহা করণীয়, তাহা মন্দিরমধ্যে সুসাধ্য হইলেও অন্তর্যাগের সমূহ ব্যাপার তথায় সুসম্পন্ন হইবার নহে। কারণ, ইহা বহুক্ষণব্যাপী সাধনার অঙ্গীভূত। ইহা আপনা-আপনি শিক্ষণীয় নহে। কারণ, গুরূপদিষ্ট মার্গে চলিতে না পারিলে এই অন্তর্যাগ সাধনায় সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তার পর এই সাধনা সর্বনাশ-বিবর্জিত হইয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শ্রীগুরু ব্যতীত অন্য কেহ এই সাধনাকালে মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত থাকিবে না। বিশেষতঃ গভীর নীরব নিথর নিশীথে নির্জনে সাধ্য, পশুভাবে প্রতিষ্ঠিত, বৈষ্ণবাচারের এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলক। এই জন্যই পঞ্চবটীর প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ, শ্রীরাধাগোবিন্দজীর উপাসনায় কুণ্ডলী-যাগের বিধি-ব্যবস্থা আছে। তাহার জন্য নির্জন স্থান আবশ্যক হইয়া থাকে। অন্তর্যাগ অভ্যন্তরে মনশ্চক্ষুর সাহায্যে মানস উপচারে স্বশরীরাভ্যন্তরে ইষ্টের উপলব্ধিমূলক অপরোক্ষ উপাসনা।

এই অপরোক্ষ উপাসনার সহিত ষট্‌চক্রসাধনার অতি নিবিড় সম্বন্ধ। বেদাদি আচার-সপ্তকের মধ্যে বৈষ্ণব আচারের দ্বারা স্বাধিষ্ঠান-চক্র ভেদ করিতে হয়। অপরোক্ষ উপাসনায় যাহা 'রাকিণী' দেবী, বহির্যাগে তিনিই শ্রীরাধা, 'কুণ্ডলী পৃথিবী দেবী, রাকিণী স্বাধিদেবতা। তদ্দেহগামিনী দেবী বাহুকামিনী।'

আধারপদ্মে 'কুণ্ডলী পৃথিবী দেবী।' উর্ধ্বে স্বাধিষ্ঠান ভেদ করিতে হইলে রাকিণী দেবীর শরণ গ্রহণ করিতে হয়। পরে স্বাধিষ্ঠানের রাধাকৃষ্ণের যুগল শক্তি সাহায্যে সাধককে মণিপুরচক্র ভেদসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত কৃষ্ণ 'প্রকৃতি-যমুনাতীর-তরুগত', তথা 'গোপীজনপরিমিলিত', 'কুলীন' ও 'শ্যাম'।

এইরূপে সাধককে আচারের পর 'আচার' গ্রহণ করিয়া সপ্ত আচারের সাহায্যে সপ্ত চক্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। আচার-সপ্তকের মধ্যে বেদাদি আচার-চতুষ্টয় পশুভাবে স্থিত এবং শেষের তিনটি 'বীর' ও 'দিব্য'-ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পশুভাবের সাধনা

প্রবৃত্তি মার্গের সাধনা। বীরভাবের সাধনা প্রবৃত্তির সংযম এবং দিব্যভাবে পরমনিবৃত্তি।

এই সকল সাধনা তান্ত্রিকী সাধনা। তোতাপুরী আসিবার বহু পূর্বে সম্ভবত ১৮৫৫।৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কোন সময়ে আসিয়া পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণী আপন শিষ্যকে গোপনে এই সকল তান্ত্রিক সাধনা করাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী যেমন সর্বাম্নায়-সিদ্ধ ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপ সকল আম্নায়-গত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ স্বীকার করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণীর নিকট বিহিতভাবে দীক্ষাভিষেক গ্রহণ করিয়া—বিষ্ণুক্রান্তার ৫০খানি তন্ত্রের যাবতীয় সাধনা করিয়াছিলেন। এই সকল তন্ত্রে সবিকল্প তথা নির্বিকল্প সমাধিলাভের উপদেশ ও প্রক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণীর সাহায্যে এই সকল তন্ত্রের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণও যে সবিকল্প তথা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সহজানুমেয়। এই জন্যই শ্রীমৎ তোতাপুরী একটু বেদান্ত শুনাইতে শুনাইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ মুখের কথা হইতেও ইহার যাথার্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন,—'আমার তখন ভারি ব্যামো। * * গঙ্গাপ্রসাদ সেন বললেন, স্বর্ণ-পট-পটি খেতে হবে; কিন্তু জল খেতে পারবে না। সকলে ভাবিত হয়ে পড়ল দেখে, আমি রোক্ ক'রে বললাম, আর জল খাব না। পরমহংস!—আমি পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস। দুধ খাব।'

অতএব দেখা যাইতেছে, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট লইয়া যাইবার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অবস্থায় পূর্ণারূঢ় হইয়াছেন। নির্বিকল্প সমাধি তখন তাঁহার করতলগত। গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিকিৎসার কাল ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, ইহার পূর্বেই ব্রাহ্মণী আসিয়া—আপন মন্ত্র-পুত্রকে নানাবিধ তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। নির্জন পঞ্চবটীতে বৈষ্ণবাচার্যে ষট্চক্র ভেদের সাধনা তাহার মধ্যে একটি। এই সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহস্রারপদ্মে পরদেবতার সহিত

মিলন জন্য কামগন্ধবিরহিত অহমিদং ইতি সবিকল্প জ্ঞান বিবর্জিত, প্রকাশ-বিমর্শ-সামরস্য-স্বরূপিণী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, পশুভাবে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবাচারে শ্রীরামকৃষ্ণ যদি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় বীরভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন?—কিন্তু এখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ, পূর্বে বলিয়াছি যে, অন্তর্যাগে যে ষট্‌চক্রের সাধনা, তাহা বেদাদি সপ্ত আচারের সাহায্যেই সাধিত হইবার বিধান যামলাদি তন্ত্রনিচয়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

আরও এক কথা—জ্ঞানের পর বিজ্ঞান আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম-জ্ঞানাপেক্ষা ব্রহ্মবিজ্ঞানকেই বারম্বার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এরূপ বলিবারও যথেষ্ট কারণ কাছে। যোগাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান, নিজ স্বরূপের অবরোধ, বিস্মৃত আত্মস্বরূপ-জ্ঞানের পুনর্লাভ ঘটিলেও উপাসনার আবশ্যকতা আছে। কারণ, যোগাদির দ্বারা লভ্য যে পুরুষার্থ বা মুক্তি, তাহা পুনরাবৃত্তি-রহিত নহে। সাংখ্য-যোগাদির সাহায্যে প্রাপ্ত মুক্তিতেও পুনরায় সংসারে আসিতে হয়। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম-জ্ঞান অপেক্ষা ব্রহ্মবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দেবতালাভ করাইয়া দেয়। এই দেবতালাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ঈশ্বর মুক্ত পুরুষকেও আবার নাগপাশে বন্ধন করিয়া সংসারকাননে প্রেরণ করেন। শাস্ত্রে আছে, সাংখ্যযোগাদি-সংসিদ্ধাম্ শ্রীকণ্ঠস্তদহম্মুখে। সৃজত্যেব পুনস্তেন ন সদৃশু-মুক্তিরীদৃশী।' অর্থাৎ প্রলয়ের পর সৃষ্টিসময়ে শিব সাংখ্যযোগাদিসংসিদ্ধ পুরুষদিগকে আবার সৃষ্টি করেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাহায্যে দেবতালাভ না হওয়া পর্যন্ত ভববন্ধনের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই। অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত উপাসনা ব্যতীত পুনরাবৃত্তি-রহিত মুক্তিলাভের নান্যঃ পন্থা।

সে যাহা হউক, এই সকল কথার আলোচনা হইতে বেশ অনুমান হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব বিষয়ে সম্প্রদায়-গতভাবে স্বয়ং কোন বিশেষ মতবাদ পোষণ করিতেন। সৃষ্টিদেবতা ও

উপাসনাতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ধৃত মতবাদকে আমরা শ্রীরাম-কৃষ্ণ-সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। এখন প্রশ্ন—সেই সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার কি?

সৃষ্টি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সিদ্ধান্ত আপন সম্প্রদায়গতভাবে প্রচার করিতেন, তাহা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'সচ্চিদানন্দ যে কি বস্তু, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন,—অর্ধনারীশ্বর। কেননা দেখালেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই আমি। তারপর থেকে আর এক থাক নেমে, আলাদা আলাদা পুরুষ আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।'

সৃষ্টিবিষয়ক এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ সম্প্রদায়গত উপাসনা। সৃষ্টিকে লয়মুখে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ সম্প্রদায়গত এই সিদ্ধান্তটি যেরূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হয়, তাহা এই,—

পঞ্চ স্থূলভূত। পঞ্চ সূক্ষ্মভূত। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। গুণবৈষম্যে উৎপন্ন বুদ্ধি-মন-অহঙ্কারভেদে অন্তঃকরণত্রয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা 'প্রকৃতি'। চিত্ত বা 'পুরুষ'। পরব্রহ্ম বা পরশিবের সঙ্কুচিত ধর্মবিশেষরূপে প্রসিদ্ধ নিয়তি, কাল, রাগ, কলা ও অবিদ্যা। জগৎ ব্রহ্মের ভেদ-বুদ্ধির জনক 'মায়া'। ইহাদের মধ্যে অভেদ জ্ঞান-জনয়িতৃ 'বিদ্যা'। বিশ্বকে 'ইদম্'-রূপে দ্রষ্টা ব্রহ্মাই 'ঈশ্বর'। জগৎকে 'অহং'-রূপে দ্রষ্টা ঈশ্বরই 'সদাশিব'। পরব্রহ্ম বা পরম শিবের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই 'শক্তি'। এই শক্তিযুক্ত পরম শিবই প্রথম তত্ত্বরূপ—'অর্ধনারীশ্বর' সচ্চিদানন্দ।

এই সকল তত্ত্বসমবায়ে পরিদৃশ্যমান জগৎই পরম শিবের শরীর। ঈশ্বর স্বীয় লীলাবিলাসে যখন নিয়ত্যাদি অবিদ্যান্ত কঞ্চুকপঞ্চের দ্বারা আবৃত হয়েন, তখনই তিনি 'জীব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যা প্রভৃতি কঞ্চুকপঞ্চবিমুক্ত জীবই পরম শিব। অতএব বলিতে পারা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধান্তে স্বীয় স্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞান লাভ, আত্মস্বরূপের অবরোধ বা উপলব্ধিই পরমপুরুষার্থ।

যোগাদির দ্বারা লব্ধ মুক্তি পুনরাবৃত্তি-রহিত নহে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দীক্ষাদিদানের মন্ত্রোপাসনার নির্দেশ করিয়াছেন। মণি ওষধির ন্যায় মন্ত্রের শক্তি অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের বিষয়ীভূত নহে। বিশ্বাসভূয়িষ্ঠ ইহার প্রমাণ। বিশ্বাস ও সম্প্রদায় সাহায্যে মন্ত্রোপাসনায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র গুরুপরম্পরা উপদেশের দ্বারা প্রাপ্ত আচার-বিশেষের নাম 'সম্প্রদায়'। এইরূপ সম্প্রদায়ের দ্বারা গুরু, মন্ত্র ও দেবতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপনই সর্বসিদ্ধির হেতু। গুরু মন্ত্র-দেবতা পবিত্র-মন ও আত্মার ঐক্যনিষ্পাদন হইতে প্রত্যাগাত্মার জ্ঞান হইয়া থাকে। স্বরূপানন্দের অভিব্যঞ্জনা এই জ্ঞানলাভের লক্ষণ। আনন্দই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তিই আনন্দময়ী। এই আনন্দময়ীর কৃপা ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না। বিশ্বজননী দ্বার না ছাড়িয়া দিলে জীব স্বধামে পরম শিব হইতে পারিবে না। জগন্মাতার কৃপালাভ করিবার জন্যই তাঁহার অর্চনা উপাসনার প্রয়োজন। ইহাই নিজ সম্প্রদায়গতভাবে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত।

জগজ্জননীর এই যে উপাসনা, তাহা মন্ত্রোপাসনা। এই উপাসনায় জপ করিতে হয়। জপের মুখ্য সাধন—মন্ত্র। মন্ত্র দীক্ষাভিষেকসাপেক্ষ। দীক্ষা শ্রীগুরুসাপেক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শ্রীগুরুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে দীক্ষাদি প্রদান কারয়া নিজ সম্প্রদায়গত ধারা রাখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিমান মুমুক্ষু, তোমার ব্যাকুলতা থাকিলে সন্ধান নিশ্চয়ই মিলিবে।

……উনবিংশ শতাব্দীর ভারত অনুকরণ-সিদ্ধ—আত্মভোলা, কৃত্রিম। গীতা বলিলেন, স্বধর্মে নিধনও ভাল, পরধর্মে পাপ। ভারত সেই গভীর বাণী ভুলিয়া দেশকে য়ুরোপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিল। আপন ধর্মে আপনি থাকিয়া যদি মৃত্যুও হয়, তাহাতে আনে নবজন্ম, পরের পথে সিদ্ধির অপর নাম সিদ্ধ আত্মহত্যা। যদি নিজেদের সম্পুর্ণ য়ুরোপীয় করিয়া গড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, আমাদের সহজাত বুদ্ধিশক্তি, আমাদের জাতির স্থিতি-স্থাপক-শক্তি, আমাদের আত্মশোধন, আত্মগঠন ও আত্মসংশোধনশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইত।

…জাতির প্রাণবায়ু এখনও সচল। বাংলা ও পাঞ্জাবের ধর্ম-আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং বঙ্গের নব-সাহিত্য এই প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয়। পরদেশী ভাব ও সভ্যতার পেষণে পড়িয়াও এখনও দেখিতেছি, ভারতের প্রাণ-শক্তি, ভারতের বিশিষ্ট প্রকৃতি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। যতদিন পর্যন্ত জাতির বুদ্ধি জাতীয় ধর্মের অনুকূল না হইতেছে, ততদিন ভারতের মুক্তি নাই।

তামসিক অজ্ঞ ও অচল অবস্থায় পরিণত হইলেও রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম এই পরানুকরণ-গতিকে বাধা দিয়াছে। ইহার ফল জাতীয় সত্ত্বা জাগিবার অবসর পাইয়াছে। ভারতের চিত্তে জাগিয়া উঠে প্রথমতঃ ধর্ম ; এই ধর্ম-পথেই ভারতের বিজয়।

ইহার লক্ষণ বেশ দেখা গেল। যখন দেখিলাম, একজন অশিক্ষিত হিন্দু সন্ন্যাসী, আত্মজ্যোতিতে জ্যোতির্ময় এক রহস্য-পুরুষ, বিদেশী সভ্যতার সংস্রব মাত্রশূন্য এক অতি সরল সাধুর চরণতলে গিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত যুবক মাথা নোয়াইতেছে, সেইদিনই বুঝিলাম জয় হইয়াছে। ঠাকুর বলিলেন, নরেন মহাবীর, সে বিশ্বকে

দুই মুঠিতে ধরিয়া উহার রূপ পরিবর্তন করিয়া দিবে। তাই বিবেকানন্দ যেদিন নামিলেন, সেদিন প্রথম বিশ্ব বুঝিল। আবার ভারত জাগিয়াছে মাত্র পুনর্জীবন লাভের জন্য নহে, ভারত জাগিয়াছে বিশ্ব জয় করিবার জন্য।

...প্রতি বৎসরই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উৎসবে কলিকাতার অন্তর আলোড়িত হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ভারতে দক্ষিণেশ্বরের ঋষির জন্ম এ যুগের একটি বিশেষ ঘটনা, প্রতি বৎসর এই বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ বিশ্বাস করে এক কারণে, কেহ বিশ্বাস করে অন্য কারণে। ভক্তের চোখে তিনি শেষ অবতার। ঐতিহাসিকের চোখে তিনি হিন্দুর ধর্মপুরুষ। দলের লোক অনুভব করেন যে, তিনি সকল দলেরই প্রিয়, কোনও দলের সহিত তাঁহার বৈষম্য নাই। দার্শনিক দেখেন, তিনি বেদান্তের শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বের মূর্ত বিকাশ। আর কর্মী?—তাহারা তাঁহার আবির্ভাব দেখিয়া আপনাদের সকল সংগ্রাম যে দৈবসমর্থিত, তাহা বিশ্বাস করে, আর তাহাতে প্রায় প্রেরণা।

গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতন দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই। যে ভাবসম্পদ তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রথমে কার্যে পরিণত করিতে হইবে; যে আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই যদি না করি, তাহা হইলে আরও পাইবার দাবি করিব কি করিয়া? আর বেশী পাইয়াই বা কি করিব?

ভারতে প্রত্যেক জাতীয় জাগরণের প্রারম্ভে ধর্ম-জাগরণ হইয়া থাকে। যে ভারতরঙ্গ সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছে, তাহার আরম্ভে শ্রীশঙ্করাচার্য, শেষে বঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব, পাঞ্জাবে শিখ গুরুগণ, মহারাষ্ট্রে শিবাজী এবং দক্ষিণে রামানুজ ও মাধবাচার্য। এই প্রত্যেকটি ধর্মমতের মধ্য হইতে এক একটি জাতির শক্তি, সাম্য ও আত্মবোধ জাগিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণে ভারতের সকল ধর্মগুরুর মিলন। ইহা হইতেই মনে হয় যে, অতীতে যে সকল আন্দোলন মাত্র ছিল,

প্রাদেশিক ও খণ্ডিত, তাহা অখণ্ড ও সার্বজনীনরূপে প্রকাশ পাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে সর্বমতের সমন্বয় হইয়াছে।

যে অনন্ত তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আমরা চলিয়াছি সাগরাভিমুখে, মাত্র তাঁহারই অলৌকিক বুদ্ধি সেই তরঙ্গের খবর জানে। আমাদের পিছনে যে শক্তি রহিয়াছে, আমাদের ভবিষ্যৎ যে কোনও শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহার প্রমাণ হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এত বড় আবির্ভাবের ফলে ঘটে বড়-বড় ঘটনা। অনেকের অগ্নিপরীক্ষা হইবে, এই পরীক্ষায় খাঁটি সোনাও কম মিলিবে না।

কিন্তু জয় বা পরাজয় যাহাই হউক না কেন, আমাদের কাম্য শীঘ্রই লাভ হোক অথবা সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলুক, তিনি যে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যে এইখানে আমাদেরই সঙ্গে রহিয়াছেন, ইহাতেই প্রমাণ হয়—

বিধির তূর্য উঠিল বাজিয়া
পলায়ন নহে পলায়ন।
সিংহাসনের সম্মুখে রাখিয়া
চিত্ত খুঁজিছে নারায়ণ।
ওঠ্ ওঠ্ ওরে! ডাকে ভগবান,
দ্রুত করি চল্ চিত্ত,
ভগবান চলে—ভগবান চলে—
চরণ কর রে নৃত্য।

॥ অবতারবাদ ও রামকৃষ্ণতত্ত্ব ॥

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। 'আমরা অমৃতের পুত্র,' সাধনার সাহায্যে সকল সন্দেহান্ধকারের পরপারে গমনপূর্বক এই মহিমাদীপ্ত মহাসত্যকে ভারতের ঋষিরাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন, তমসার পরপারবর্তী দিব্যদেশে যিনি বাস করেন, সেই সূর্যসন্নিভ পরমপুরুষকে আমি জানিয়াছি—ইহাই ভারতের ঋষি-বাণী। আশা ও আশ্বাস, বীর্য ও বিশ্বাস, গর্ব ও গৌরবে পরিপূর্ণ এমন বরাভয়বাণী আর কোথাও শোনা যায় নাই। মানুষ! তোমরা অমৃতের পুত্র—এই ধ্বংস-ধর্মী দেহের অন্তরালে যে অনন্ত ও অক্ষয় আত্মা বাস করিতেছে, তাহাই তোমার সত্যকার সত্তা। ভ্রান্তিভরে নিজেকে দেহের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইতেছ কেন? ভারত জগৎকে যুগের পর যুগ এই জাগরণ-সঙ্গীত—এই অভয়ামৃতবাণী শুনাইয়াছে। আত্মার অমৃতত্ব উপলব্ধি ও অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত আনন্দময় পরম পুরুষের সহিত পরিচয়—ভারতের সকল শিক্ষা ও সাধনার লক্ষ্যস্থল ইহাই। এই উপলব্ধি ও পরিচয়ের শিক্ষক ও সাধক যাঁহারা, তাঁহারই ঋষি। এই শিক্ষা ও সাধনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ যাঁহদের মধ্যে, তাঁহারাই ঈশ্বরাবতার। ঋষি সাধনার সাহায্যে যাহা লাভ করেন, ঈশ্বরের মধ্যে তাহা স্বতঃই স্ফূর্ত। অবতার দুই প্রকার;—অংশাবতার ও পূর্ণাবতার। অংশাবতার অসংখ্য। দিব্য-ভাব ও দিব্য-শক্তির প্রকাশ যাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছে, উদার আর্যধর্ম তাঁহাকেই অবতার বলিয়া শ্রদ্ধাবনত শিরে বরণ করিয়া লইয়াছেন। জৈনধর্মের প্রথম প্রবর্তক পরহংসপ্রবর ঋষভদেব ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মমতে উভয়েই বিষ্ণুর অংশাবতার। রাম ও পরশুরাম উভয়েই অবতার, রাম পূর্ণ, পরশুরাম অংশ।

গৌড়দেশীয় বা বাংলার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে ধরেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়কেই 'অবতার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবতারগণ যাঁহা হইতে নির্গত হন, সেই সর্বশক্তিমূলাধার পূর্ণতম তত্ত্বই অবতার। অপর সম্প্রদায় এই অবতারবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা কৃষ্ণকে পূর্ণাবতার জ্ঞান করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ-লীলা-সমুদ্রে যাঁহারা গভীরভাবে ডুবিয়া গিয়াছেন, সেই একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ণতম তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাঁহারা ততদূর অন্তরঙ্গ নন, তাঁহারাও তাঁহার পূণাবতারত্ব মানিয়া থাকেন। যাঁহারা বাহির হইতে বিচার করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীঠাকুর একজন শ্রেষ্ঠ সাধক বা মহাপুরুষ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট নিজের সত্য তত্ত্ব বা পূর্ণতমত্ব বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন। একান্ত অনুরক্ত ভক্তদিগকে সম্বোধনপূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরও নিজেকে নির্দেশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন —'অবতার যাঁর কর্মচারী, এবার তিনি খোদ্ এসেছেন।' যিনি অভিমানশূন্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত এই সহজ ও সরল সত্য কথাকে কেহ যদি প্রচণ্ড আত্মাভিমানের অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে জানিব, তিনি অবতারবাদ ও রামকৃষ্ণতত্ত্ব উভয়েরই অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

আত্মবিস্মৃত হইয়া বা সত্য তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া জীবগণ যখনই জড়সর্বস্ব হইয়া পড়ে, চিদানন্দ রাজ্যের সুসমাচার শুনাইয়া স্বধর্ম-সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান তখনই আবির্ভূত হন। মানুষরূপে আসেন বলিলাম না, কারণ, 'নর-বপু কৃষ্ণের স্বরূপ'। সুতরাং মানবমূর্তিতে আবির্ভাবই স্বাভাবিক। তবে তিনি অন্যরূপেও আসিয়া থাকেন। নৃশংসতম সংশয়বাদের প্রতিমূর্তি হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করিবার জন্য যেমন আসিয়াছিলেন নৃসিংহরূপে। ঠিক প্রয়োজনের অনুরূপ রূপ পরিগ্রহপূর্বক পরমপুরুষ শ্রীভগবান প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়া, কার্য ও বাক্যের দ্বারা মানুষের প্রষুপ্ত প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলেন।

রাক্ষসগণের অত্যাচারে যখন ধর্ম বিপন্ন, তখন শ্রীভগবান রামরূপে আবির্ভূত হইয়া হিংসার প্রতিমূর্তি রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া যজ্ঞাত্মক আর্যধর্মকে রক্ষা করিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে আসিয়া বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকাকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র বাণী ও লীলার দ্বারা শ্রীভগবান ধর্মচ্যুত মানুষকে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মাত্মক শাশ্বত স্বধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বল-দর্পিত ক্ষাত্রশক্তিকে দমন করিয়া, ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহিমা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়-সাধনের দ্বারা তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে ব্যক্ত করিয়া তুলিলেন।

মায়ার কার্য—ভুলাইয়া দেওয়া এবং মায়ামুগ্ধ মানুষের স্বভাব—ভুলিয়া যাওয়া। শ্রীভগবান ললিত লীলা-লোক হইতে মলিন মায়ামঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া, উন্নতোজ্জ্বল আদর্শ ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীর দ্বারা যে শিক্ষা-দীক্ষা দান করেন, মানুষ ক্রমশঃ তাহা বিস্মৃত হইতে থাকে। ঐশী শক্তির অংশস্বরূপ এক-একজন ঋষি বা প্রেরিত পুরুষ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়া এই বিস্মৃতির আবরণকে সরাইয়া ফেলিতে এবং মানুষের আত্মোপলব্ধিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মানুষের দুর্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র হৃদয় শ্রীভগবান শেষে একদিন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন।

পৌরাণিক যুগের প্রান্তভাগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রাণশূন্য ও জ্ঞানহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া পড়িল। অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে ও অন্তরতম সত্তাকে ভুলিয়া গিয়া লোকে শুধু দেবতার বাহিরের দেহকে পূজা করিতে লাগিল। ভক্তিবিহীন অর্চনা ও শ্রদ্ধাবিহীন আহুতি দেবতার আশীর্বাদের পরিবর্তে বহিয়া আনিল শুধু অভিশাপ। বলি-প্রদানের সত্য তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, বহির্মুখ ব্যক্তিগণ ঐ ব্যাপারকে নির্মম পশ্বাঘাতে পরিবর্তিত করিয়া তুলিল। চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত হইল হৃদয়হীন জড়বাদের রাজত্ব। এই জড়বাদকে ধ্বংস করিবার জন্য কপিলাবস্তুর রাজগৃহে শাক্যসিংহের আবির্ভাব। এই আবির্ভাব জগতের ইতিহাসের এক অপূর্ব ব্যাপার।

কয়েক শতাব্দী পরে আবার ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইল। উপলব্ধি, অনুভূতি, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ধর্মের অন্তরঙ্গ অঙ্গগুলির স্থান অধিকার করিল কর্কশ তর্ক-বিচার। কঠোর তর্ক-বিচারের তাড়নায় বিশ্বাস নির্বাসিত হইল, শ্রদ্ধা-ভক্তি দেশ ছাড়িয়া পলাইল। দেশের তখন অতিশয় দুরবস্থা। পাঠান-শাসন শেষ সীমায় উপনীত—রাজশক্তির দুর্বলতায় চতুর্দিকে অনৈক্য, অপ্রীতি ও হিংসাদ্বেষের প্রাধান্য। এই দারুণ দুঃসময়ে চিরানন্দময় চৈতন্যরাজ্যের সুসমাচার প্রচারপূর্বক লোকের অধ্যাত্মচেতনাকে জাগ্রত করিতে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। কর্কশ তর্কজালকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সকল সংশয়কে ধ্বংস করিয়া, প্রেমের প্লাবনে দেশকে ডুবাইয়া দিল, বিশ্বাসের উজ্জ্বল রশ্মিরাশিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইল। শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেশে জগৎকে কৃষ্ণময় দেখিলেন, পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতাদিকে কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া অদ্বৈতানুভূতির পরিচয় দিলেন, বিগ্রহের মধ্যে দেবতার জ্বলন্ত প্রকাশ দর্শনে ভাবে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। জড়ত্বের যবনিকা উত্তোলনপূর্বক তিনি দেখাইলেন—চিন্ময় বৃন্দাবনের চিরসুন্দর সচ্চিদানন্দকে। এই চৈতন্যলীলা বাংলাকে এবং বাঙালীকে ধন্য করিল। নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ বাসুদেব ও বৈদান্তিক-শিরোমণি প্রকাশানন্দকে প্রেম-মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভক্তিবাদের যে বিজয়-বৈজয়ন্তী শ্রীচৈতন্য উত্তোলন করিয়াছেন, বাংলার ইতিহাসকে তাহা চিরদিন অপূর্ব মহিমালোকে উদ্ভাসিত রাখিবে।

বাংলা দ্বাদশ শতকের ও ইংরেজি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা বিশ্ব জুড়িয়া আবার ব্যাপ্ত হইল বিপুল অন্ধকার। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সহিত প্রত্যক্ষবাদের প্রবাহ আসিয়া ধর্মক্ষেত্র ভারতকেও ছাইয়া ফেলিল। জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের ও ব্যাস-বশিষ্ঠের সন্তান হিউম ও স্পেন্সার, বেন্থাম ও মিল পড়িয়া সংশয়বাদের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া প্রত্যক্ষাতীত পরমার্থকে অস্বীকার করিয়া বসিল। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে যতটুকু জানা যায়, তাহার অতীত কোনও বস্তু বা ব্যাপার তাহাদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-মোহাবৃত দৃষ্টির নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইল।

অতীন্দ্রিয়ের সহিত যাহাদের ছিল নিবিড়তম আত্মীয়তা, চিজ্জগৎ যাহাদের নিকট ছিল প্রত্যক্ষের অপেক্ষাও পরিচিত, তাহারা হইয়া পড়িল জড়সর্বস্ব। কঠোর জড়বাদ বিশ্বাসের প্রতি হিরণ্যকশিপুর ন্যায় বজ্রকণ্ঠে গর্জিয়া বলিল—কোথায় তোর ঈশ্বর? পরমাণুবাদ মানিয়া না হয় ইলেকট্রন পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইলাম, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে মানিয়া লইব কোন্ প্রমাণে?

'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' এই আশ্বাসপ্রদ অভয় বাণীকে সার্থক করিয়া, ঈশ্বরবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পুরুষোত্তম শ্রীভগবান আবার পৃথিবীতে পদার্পণ করিলেন। ঐশ্বর্যের মধ্যে আসিলেন না, আসিলেন শ্রীচৈতন্যের মতই শান্ত-মধুর মূর্তিতে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে। তবে নিমাই-এর মত পণ্ডিত হইয়াও আসিলেন না, আসিলেন সর্বপ্রকার পার্থিব প্রাপ্ত শিক্ষাকে পরিত্যাগপূর্বক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের প্রতিমূর্তিরূপে। বর্তমান যুগের সংশয়বাদ যাহা ডেকার্টের 'innate ideas' বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানটুকুকেও মানিতে প্রস্তুত নহে, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া মানুষের চিৎস্বরূপত্ব ও ঈশ্বরের সহিত অভিন্নত্ব যিনি প্রমাণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে এইভাবে আবির্ভাবই উপযোগী। আত্মা অনন্ত জ্ঞানময়। এই অনন্ত জ্ঞানময়ত্ব ঈশ্বরের মধ্যে স্বতঃই অভিব্যক্ত। কিন্তু জীব মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। হিউম প্রভৃতি জড়বাদীরা experience বা অভিজ্ঞতার অতীত কোনও ব্যাপারকে স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু এই যে সর্বশাস্ত্রমন্থিত স্বতঃসিদ্ধ অনন্ত জ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত প্রকাশিত, ইহা সকলপ্রকার প্রাপ্ত শিক্ষা ও পার্থিব অভিজ্ঞতার অতীত নয় কি? এই সহজাত শাস্ত্রজ্ঞান শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতারত্ব বা ঈশ্বরত্বের অন্যতম প্রধান প্রমাণ। শুধু শাস্ত্রজ্ঞান নয়, পরস্পরবিরোধীবৎ প্রতীয়মান শাস্ত্রসমূহের সমন্বয়ভূমি শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ ও নৈষ্কর্মবাদ—সকল মতবাদের সমন্বয়-ক্ষেত্র তিনি।

অংশাবতারগণ এক-একটি মতবাদকে প্রচার করিয়া থাকেন।

আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্যের নাম করিতে পারি। তিনিই পূর্ণাবতার—যিনি সকল ধর্মমতের সমন্বয়সাধক। যাঁহার কণ্ঠ হইতে গীতোক্ত জ্ঞানামৃতধারা নির্গত হইয়াছিল, সেই শাশ্বত ধর্ম-গোপ্তা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় বিভিন্ন মতের সমন্বয়-সাধনে আর কেহই সমর্থ হন নাই। শুধু ভিন্ন ভিন্ন মতের নয়, কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ উভয়েই কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই চতুর্বিধ সাধন-পথের অন্তর্নিহত ঐক্যকে কার্য ও বাক্যের দ্বারা প্রমাণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণাবতার ত্রিবিধ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম—তাঁহার নিজেরই মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃত বাণী—'অবতার যাঁর কর্মচারী, এবার খোদ তিনিই এসেছেন।' দ্বিতীয়—তাঁহার স্বতঃ-প্রকাশিত সর্বশাস্ত্রজ্ঞতা। তৃতীয়—সকল মতের ও পথের সমন্বয়সাধন। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বৈদান্তিক, ব্রাহ্ম প্রতি বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার মধ্যে স্ব স্ব আদর্শের অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখিতে পাইত। এমন কি, কর্তাভজা ও বামাচারীরাও নিজ নিজ বিশ্বাসের আলোকে দেখিয়া তাঁহাকে নিজেদের ইষ্ট জ্ঞানে ভক্তিযুক্ত হইত।

শ্রীভগবান রামকৃষ্ণরূপে বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াই আসিয়াছিলেন। ভোগই যে-যুগের একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু, সে-যুগে ত্যাগের পূর্ণতম প্রতিমূর্তি হইয়া না আসিলে চলিবে কেন? অর্থই যে-যুগের উপাস্য দেবতা, সে-যুগে শ্রীভগবান এমন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া আসিলেন, যাহা স্বতঃই ধাতুর স্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেব-দেহের প্রত্যেক পরমাণুটিতে চিদানন্দময়ী ব্রহ্মশক্তি স্পন্দিত হইয়া উঠিত। মধুরতম সঙ্গীতের সুরে সাধিত বীণা-তন্ত্রীর মত তাঁহার অনন্ত জ্ঞানভাস্বর অন্তর দিব্য ভাবতরঙ্গে অবিশ্রান্ত দুলিয়া উঠিত। যেমন তত্ত্বজ্ঞান ও সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়সাধনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তেমনই গভীর ভাব-ভক্তির ললিত লহরী-লীলায় তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সমকক্ষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেক ভাবভঙ্গীতে ছিল অপূর্ব ব্রহ্মানুভূতি, প্রত্যেক

কার্যকলাপে ছিল ইন্দ্রিয়াতীত চিদানন্দ রাজ্যের দিব্যগন্ধামোদ, শাশ্বত সত্যলোকের সমুজ্জ্বল জ্যোতি।

রামকৃষ্ণলীলার বাহিরের ব্যাপারগুলি দেখিলেও বুঝা যায়, অসাধারণ সাধক বা মহাপুরুষমাত্র তিনি নহেন। ঐশী-শক্তির পূর্ণতা না থাকিলে এরূপ বিশ্বব্যপী প্রভাব প্রসারিত করা কখনও সম্ভব হয় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এক-একজন মহাপুরুষ এক-একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রভাবের গণ্ডীও একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, জগৎ জুড়িয়া তাহা ছড়াইয়া পড়ে না। এই বিশ্বব্যাপী প্রভাবকে রামকৃষ্ণের পূর্ণাবতারত্বের অন্যতম প্রধান প্রমাণরূপে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করিয়া এই যে সার্বজনীন ও সার্বভৌম সাড়া সমগ্র জগৎ জুড়িয়া উত্থিত হইতেছে, ইহা হইতেও আমরা তাঁহার প্রভাবের পরিমাণ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। অসাধারণ সাধক বা মহাপুরুষের নাম ও স্মৃতি কখনও এরূপ বিশ্বব্যাপী উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারে না।

॥ বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্র ॥

বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতে এই দুইজনের মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন আর কেহ ছিল না। তর্কশাস্ত্রে ও বেদান্তে বাসুদেব ছিলেন অতুলনীয় এবং শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান গুরু প্রকাশানন্দ ছিলেন অদ্বৈতবাদে অদ্বিতীয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোককে বশীভূত করা অপেক্ষা দুইজন মহাশক্তিশালী ব্যক্তিকে বশীভূত করাতেই অধিকতর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্রের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরিমেয় প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্রের হৃদয়-রাজ্যকে যিনি জয় করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্ববিজয়ী, এই সত্য সকল সংশয়ের অতীত। উভয়েই ছিলেন শিক্ষিত-শিরোমণি এবং উভয়েরই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রখর প্রতিষ্ঠা ও পাবকোপম বক্তৃতা-শক্তি বিশ্বাবাসীকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীতে বহু প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও বাগ্মী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান যুগে personality বা ব্যক্তিত্বে বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্রের সমকক্ষ আর কেহই নহেন। ইঁহারা যেখানে গিয়াছেন, ইঁহাদের জ্ঞানে ও গুণে, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে, ভাবে ও ভাষায় মুগ্ধ হইয়া চুম্বকের প্রভাবে আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় শত শত নরনারী প্রবল ব্যগ্রতা ও আগ্রহের সহিত ছুটিয়া আসিয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসীর চিরন্তন ভক্ত ভারতে নয়, আমেরিকার মত প্রগতিবাদী দেশে যেখানে 'কালা আদ্‌মি' সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হয়, সেখানকার শুধু সাধারণ নরনারী নয়, ঐশ্বর্যাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায় বিবেকানন্দের অপূর্ব তেজোদীপ্ত ও মহিমামণ্ডিত মূর্তি দেখিয়া কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা ভক্তিমতী ভগিনী নিবেদিতার My Master as I saw Him নামক অপূর্ব গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অবগত হইতে পারি। রামকৃষ্ণে নিবেদিত-জীবন বিবেকানন্দের বিজয়বার্তার দ্বারা রামকৃষ্ণের মহিমাগাথাই উদ্‌ঘোষিত হইতেছে, এই সত্যে সন্দেহ করিবে কে? যে স্পর্শ সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের জ্বলন্ত বিগ্রহ বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দে পরিণত করিয়াছিল, সে স্পর্শ সাধারণ সাধকের নহে, অসাধারণ সাধকেরও নহে, সে স্পর্শের মধ্যে রহিয়াছে ভাগবতী-শক্তির পরিপূর্ণ প্রভাব, ঈশ্বরত্বের শাশ্বত মহিমা-জ্যোতি।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় "আমার গুরু" নামক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ নিজের জীবনে ঠাকুরের প্রভাবের বার্তা ব্যক্ত করিতে গিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—

'If there has been anything achieved by me by thoughts, or words, or deeds, if from my lips has ever fallen one word that has helped anyone in the

world, I lay no claim to it, it was my master's. But if there has been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me, it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, all that has been life-giving, strengthening, pure and holy, has been his inspiration, his words and he himself.'

অর্থাৎ—যদি চিন্তা, বাক্য ও কর্মে আমার দ্বারা কিছু সম্পাদিত হইয়া থাকে, যদি আমার জিহ্বা হইতে এমন একটিও বাণী বাহির হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা জগতের একটিও জীব উপকৃত হইয়াছে, তাহা হইলে জানিবে, সে কার্য ও বাণী আমার গুরুর, তাহার উপর আমার নিজের কোনও দাবী-দাওয়া নাই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা হইতে কখনও অভিশাপ-বাণী বাহির হইয়া থাকে কিম্বা আমার অন্তর হইতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-বিষ ঝরিয়া পড়িয়া থাকে, জানিবে, তাহা আমার নিজের, তাহার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। আমার মধ্যে যাহা কিছু দুর্বল, তাহা আমার; যাহা কিছু প্রাণপ্রদ, শক্তি-সঞ্চারক, নির্মল ও পবিত্র, তাহা তাঁহারই বাণী ও প্রেরণার পরিণতি, এমন কি, তাহা তিনি স্বয়ং।

গৌরাঙ্গলীলার প্রকাশানন্দের সহিত রামকৃষ্ণলীলার বিবেকানন্দের কতকগুলি বিষয়ে অপূর্ব সাদৃশ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের অলোকিক ভক্তির অপূর্ব অভিব্যক্তিকে উপেক্ষাভরে "ভাবকালী" বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া ভাবিতেন। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রবীণ প্রকাশানন্দ সেই সর্বহারা নবীন সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিয়া, সন্ন্যাসীর উপযুক্ত পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া নিজেই তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া বসিলেন এবং যাহাকে ভাবকালী নামে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকে ব্রহ্মাদিরও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিলেন। এক দিনেই ভাবভক্তির একান্ত বিরোধী কঠোর মায়াবাদী সন্ন্যাসী নৃত্যগীতমত্ত

ভক্তে পরিবর্তিত হইলেন। প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রবোধানন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ব্রাহ্মভাবাপন্ন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদৃপ্ত নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় নানা সন্দেহে আন্দোলিত। তাঁহার মনের উপর তখন স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ ও স্টুয়ার্ট মিলের প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বড় জোর না হয় তো কান্টের অতীন্দ্রিয়বাদ, ডেকার্টের অহংবাদ কিম্বা বেন্থামের হিতবাদ পর্যন্ত মানিলেন, কিন্তু তার বেশী আর নয়। হয়তো একটা কিছু আছে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত অনুভূতির বহির্ভূত—নরেন্দ্রের মনের ভাব কতকটা এইরূপ।

নরেন্দ্রনাথ প্রখরতম প্রতিভা লইয়া সংসারে আসিয়াছিলেন। জেনারেল এসেম্বলীর অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত মিষ্টার উইলিয়ম হেস্টিংস যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন—'In all the German and English Universities there is not one student so brilliant as he' সেই অদ্বিতীয় প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী নরেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন ঠাকুরের নিকট শিক্ষা ও শান্তি পাইবার আশায়। তিনি আসিয়াছিলেন ঠাকুরের আদি ভক্তগণের অন্যতম আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের উপদেশে। ডাক্তার রামচন্দ্রও প্রথমে ছিলেন নাস্তিক। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে তাঁহার জীবনে যুগান্তর আসিয়া পড়িল এবং বিশ্বাস ও ঈশ্বরানুরাগের জ্যোতিতে তাঁহার সমগ্র অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহার মহিমা প্রথম প্রচার করিতেন, ভক্ত রামচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী ও তাঁহার লিখিত ঠাকুরের জীবনী শত শত ব্যক্তিকে যুগাবতার রামকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—'যদি প্রকৃত সত্য লাভ করতে চাও, তবে ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের কাছে যাও।'

ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টি সন্দেহান্দোলিত নরেন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞান ও

বৈরাগ্যের বিশ্বাস ও ঈশ্বরানুরাগের জ্বলন্ত বিগ্রহ বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দকে দেখিতে পাইল। কোনও সাধক বা মহাপুরুষের মধ্যে এরূপ দূর-প্রসারিত দিব্যদৃষ্টি দেখা যায় নাই। ঠাকুরের নিকট আত্মগোপন করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। যেমন কাচনির্মিত আধারের অভ্যন্তরবর্তী পদার্থকে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, তেমনই অন্তরতম প্রদেশের ভাবরাশিও তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িত। এ বিষয়ে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের জানা আছে।

প্রথম পরিচয়ের দিনই চির-পরিচিতের ন্যায় ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত ধরিয়া স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—'তুই এতদিন কেমন ক'রে আমায় ভুলে ছিলি—তুই আসবি ব'লে আমি কতদিন ধ'রে পথপানে চেয়ে ব'সে আছি।'

এই অনন্ত জ্ঞানদীপ্ত অপূর্ব দিব্যদর্শনের মহিমা নরেন্দ্রনাথ তখন উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া সেই অদ্ভুত উন্মাদের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। একটা অনির্দেশ্য অনিবার্য আকর্ষণ দিনের পর দিন নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। "যাইব না" মনে করিয়াও সেই পাগলের নিকট যাওয়া হইতে তিনি নিজেকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না।

নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অভ্যাস ছিল কোনও সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—'আপনার কি ঈশ্বর-দর্শন হয়েছে?' রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তিনি উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকিয়া শুধু বলিয়াছিলেন—'নরেন্দ্র! তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যোগী।' নরেন্দ্রনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরের এই অদ্ভুত উন্মাদকেও জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?'

ঠাকুর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া মৃদু-মন্দ হাসিয়া শান্তস্বরে কহিলেন—'হাঁ, দেখেছি। তোমাকে যেমন প্রত্যক্ষ দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে দেখেছি। তুমি দেখতে চাও? তুমি আমার কথামত চললে তোমাকেও দেখাতে পারি।'

নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত! এ কি বাণী, যাহার ফুৎকারে কাণ্টের অতীন্দ্রিয়বাদ, স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ ও মিলের প্রত্যক্ষবাদ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কথাগুলি পাগলের প্রলাপ না সত্য? ঠাকুরের বলিবার সরল সহজ ও সুস্পষ্ট ভঙ্গী এবং তাঁহার মুখমণ্ডলের শান্তোজ্জ্বল জ্যোতি নরেন্দ্রনাথের মনে এক অনির্বচনীয় ভাব জাগাইয়া তুলিল।

তার পর একদিন ঠাকুর কিরূপে নরেন্দ্রনাথের সকল সংশয় দূর করিলেন, তাহা সকলেই জানেন। ঠাকুরের ভুবনপাবন পদস্পর্শে নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি হইতে দৃশ্যমান জগৎ সাহসা অদৃশ্য হইল এবং ক্রমশঃ তাঁহার আমিত্বও মুছিয়া যাইতে লাগিল—দেশকালের পরিবর্তে জাগিতে লাগিল একটা অনির্বচনীয় অখণ্ড অনন্ত সত্তা। বিস্ময়-বিহ্বল ভীতচকিত নরেন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'ওগো, তুমি আমার এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।' তখন প্রেমমূর্তি ঠাকুর তাঁহার স্নেহশীতল হাতখানি নরেন্দ্রনাথের বুকের উপর রাখিবামাত্র সেই ভাব দূর হইল এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এই ঘটনার দ্বারা নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরের স্বভাবের অসীম মাধুর্য এই বোধকে দিন দিন বাড়াইয়া দিতে লাগিল। শ্রীভগবান যে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে সত্য নরেন্দ্রনাথ তখনও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ ঠাকুরকে ভগবানভাবে ভজনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার নিজের মনের সন্দেহ কিছুতেই মিটিত না।

এই সন্দেহ মিটিল সেই মহা-মুহূর্তটিতে, ঠাকুর যখন তাঁহার পার্থিব-লীলসম্বরণপূর্বক নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলেন, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। ঠাকুরের লীলসম্বরণে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতেছেন—ঠাকুর কি একজন অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ, না গিরিশ প্রভৃতি ভক্তগণের বিশ্বাসানুযায়ী তিনি সত্য-সত্যই ভগবান কিম্বা তদপেক্ষাও বৃহত্তর—

তিনি সকল অবতারের সমষ্টিস্বরূপ পূর্ণতম তত্ত্ববস্তু? নরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছেন—যদি ঠাকুর নিজেই আমার এই সন্দেহ মিটাইয়া দেন তবেই, নচেৎ অপরের মুখের কথায় আমি মানিব না। নরেন্দ্রনাথের অন্তরের কথা জানিয়া ঠাকুর চোখ মেলিয়া চাহিলেন এবং কহিলেন—'নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হ'ল না? যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিকে নয়।'

বিস্ময়স্তম্ভিত নরেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া একটিও বাক্য বাহির হইল না। অন্তর্যামী ঠাকুরের বাণী তাঁহার সন্দেহের হিমাদ্রিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন—ত্রেতার রাম এবং দ্বাপরের কৃষ্ণ সম্মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ণতম তত্ত্বের মূর্তপ্রকাশ রামকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

নরেন্দ্রনাথের সকল সংশয়কে ধ্বংস করিয়া কিছুক্ষণ পরেই ভগবান রামকৃষ্ণ মহাসমাধিযোগে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুরের অনন্ত কৃপাভাজন সর্বপ্রধান অধ্যাত্ম-সন্তান নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দে পরিণত হইয়া কি ভাবে ও ভাষায় স্বদেশে ও বিদেশে পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত বলিয়া পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। আজ শতবার্ষিকীর দিনে তাঁহার সেই বজ্রগম্ভীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িতেছে—

'The son of a poor priest born in one of the wayside villages of Bengal, unknown and unthought of, is worshipped literally by thousands in Europe and America to-day and will be worshipped by thousands more to-morrow.'

যদি য়ুরোপ ও আমেরিকার হাজার হাজার লোক ঠাকুরকে পূজা করে, তাহা হইলে ভারতে কত লোক তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেছে এবং করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিবেকানন্দ দিব্য-দৃষ্টিবলে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এমন দিন আসিবে—যে-দিন সমগ্র বিশ্ববাসী পূর্ণাবতার ভগবান রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অবনতমস্তকে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সেই মহাদিনের সূচনা এই সার্বভৌম ও সার্বজনীন শতবার্ষিকী।

সে সময়ের শিক্ষিত সমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব ছিল শুধু অনন্যসাধারণ নয়, অতুলনীয়। তখনকার শিক্ষিতগণের মধ্যে এমন লোক অল্পই ছিল যে, কোন-না-কোন সময় কেশবের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় নাই। শত শত নরনারী অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিত এবং তাঁহার একটিমাত্র কৃপাকটাক্ষ পাইলেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিত। তাঁহার সুন্দর আকৃতি ও সুমধুর প্রকৃতি দর্শনে সকলেই মোহিত হইত এবং তাঁহার উদ্দীপনার বাণী শুনিবার জন্য অসীম আগ্রহের সহিত অসংখ্য নরনারী ছুটিয়া আসিত। শুধু ভারতের নয়, তাঁহার শান্তসুন্দর মূর্তি ও আবেগময়ী ওজস্বিতার উচ্ছ্বাস বৃটেনের বাগ্মিবর্গকেও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার একখানি চিত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় স্বামীর একখানি আলেখ্য উঁহাকে প্রীতি-উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপ সর্বজন-সম্মোহন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অপরিমেয় প্রভাবশালী কেশবচন্দ্রের জীবনে যিনি অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ঠাকুর কি বৃহৎ বস্তু ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কতখানি ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। যিনি বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের স্রষ্টা এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিয়ন্তা ও উপদেষ্টা, তাঁহার শক্তির সীমা-নির্ধারণ সম্ভব নহে।

কেশবচন্দ্রের ন্যায় চরমপন্থী ব্রাহ্ম শিক্ষার্থী হইয়া যাঁহার চরণতলে বিনীত শিষ্যরূপে উপবিষ্ট থাকিতেন, তাঁহার জীবন ও বাণীর, মতের ও উক্তির অসাম্প্রদায়িক উদারতা ও আকর্ষণী-শক্তির পরিমাণও বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। অনন্ত ভাব-সমুদ্র-সমন্বয়-মূর্তি ভগবান রামকৃষ্ণ কাহারও ভাবে আঘাত করিতেন না। যে যে-ভাবের সাধক, সে সেই-ভাবসূত্র ধরিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিতেন। ফল এই হইত, ঠাকুরের শিক্ষার প্রভাবে সেই ভাব ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে

করিতে অন্য ভাবের সহিত সম্মিলিত হইত। নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহাকেও তিনি নিরাকারবাদের দিক দিয়াই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও বাণীর প্রভাব শেষে নিরাকার ও সাকারকে একাকার করিয়া দিল। সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী সর্বান্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন যে, স্বভাব সংস্কার ও সুদীর্ঘ সময়ের শিক্ষা হইতে সঞ্জাত ভাবকে ভাঙিয়া উপদেশ দিতে গেলে ভিত্তিবিহীন গৃহের মত সেই উপদেশে কোনও কাজ হইবে না। যে যে-ভাবের ভাবুক, সে সেই-ভাব অবলম্বনপূর্বক তাহাকে শিখাইলে তবেই সে-শিক্ষা কার্যকরী হইতে পারে।

ঠাকুরের সংসর্গ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, এ সত্যে সন্দেহ করিলে অসত্যকেই মানিয়া লইতে হয়। বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সর্বাগ্রে ঠাকুরের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রথম প্রতিভাবলে ঠাকুরকে চিনিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনে-মনে তাঁহাকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অনন্ত জ্ঞান বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির লীলাভূমি, সমন্বয়ের জীবন্ত ও জ্বলন্ত বিগ্রহ ঠাকুরের জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করিয়াই কেশবচন্দ্র 'নববিধান' গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এ সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। কেশব-শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ এই সত্যকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। আমাদের কথা নয়—নববিধানের প্রসিদ্ধনামা প্রচারক কেশবের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত মুসলমান সাধকগণের জীবন-চরিত 'তেজ-কর তোল্-আউলিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদক সত্যনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় 'ধর্ম-তত্ত্ব' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—'ভগবানের মাতৃভাব-সম্বন্ধীয় ভাব ব্রাহ্মসমাজ পরমহংসের জীবন হইতে প্রাপ্ত হন। বিশেষভাবে আমাদিগের আচার্য তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিতে এবং শিশুর সরলতা ও অভিমান লইয়া আবদার করিয়া প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞানপ্রধান শুষ্ক তর্কযুক্তিতে পূর্ণছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শ

ব্রাহ্মধর্ম হইতে শুষ্কতা দূর করিয়া উহাকে অধিক প্রিয়তর এবং ভক্তিময় করিয়া তুলিল।'

এই সরল সহজ সুস্পষ্ট সত্য কথার উপর টীকা-টিপ্পনী আবশ্যক করে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মসমাজ ভগবান রামকৃষ্ণের নিকট কতদূর ঋণী। ঠাকুরের শিক্ষা ও সংসর্গে কেশবের জীবনে এতদূর পরিবর্তন আসিয়াছিল যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরাকারবাদী হইয়াও মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে চিন্ময়ী মাতাকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

॥ পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী ॥
অসংখ্য অসাধারণ সাধকের বহু অবতারতুল্য
মহাপুরুষের জন্মদাতা

এই সত্যে সংশয় করিবে কে যে, ঠাকুরের জীবন ও বাণী হইতে অসংখ্য শক্তিশালী সাধক ও বহু অবতাররূপে পূজিত মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন? বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্রের পরেই ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মপিপাসু শিক্ষিতগণের মধ্যে ইঁহার প্রভাবও ছিল অনন্যসাধারণ। বহু প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র, মনোরঞ্জন, শ্যামসুন্দর ও অরবিন্দ প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-নেতার জীবনে বিজয়কৃষ্ণের প্রভাব ছিল। এই বিজয়কৃষ্ণ শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'আমি এক এক ভাবে ও মতে সিদ্ধ সাধুপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু সকল ভাবে ও মতে সিদ্ধ কেবল পরমহংসদেবকেই দেখিয়াছি, আর কাহাকেও দেখি নাই; জগতের ইতিহাসে ইহা নূতন।'

মহাত্মা নৃত্যগোপালের নামও অনেকে শুনিয়াছেন—যিনি জ্ঞানানন্দ নাম ধারণপূর্বক মহানির্বাণ মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়কৃষ্ণ ও নৃত্যগোপাল উভয়েই শিষ্যগণের দ্বারা ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত

এবং এই জ্ঞানের ধর্ম-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে ঠাকুরের জীবন ও বাণীর প্রভাবে। এইরূপ বহু প্রসিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা ঠাকুরের অপরিমেয় প্রভাবের পরিচয় প্রদান করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে এই প্রবন্ধ একখানি প্রকাণ্ড পুঁথিতে পরিণত হইয়া পড়িবে।

সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, বর্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধনামা পদ্মলোচন, শক্তিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি তখনকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ অবতারের সকল প্রকার নিদর্শন ঠাকুরের মধ্যে দেখিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুরের জন্মগ্রহণের কিছুদিন পূর্বে তাঁহার প্রতি ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে গিয়াছিলেন। গয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গদাধর একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমি তোর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবো।' এই স্বপ্নদর্শনের কিছুকাল পরে ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রপঞ্চে প্রকটিত হলেন। সেই স্বপ্ন স্মরণপূর্বক অসামান্য সৌভাগ্যশালী ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গদাধর।

পরমহংসের লক্ষণ যে শাস্ত্রকাররা নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মানব-চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন। সেই নির্দেশের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, মানব-সমাজে পরমহংসের আবির্ভাব ও স্থিতি অসাধারণ ঘটনা। বর্তমান যুগে সমগ্র হিন্দুস্থানে "পরমহংসদেব" বলিতে যাঁহাকে বুঝায়, তিনি সেই অসাধারণের পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়াই শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্তদিগের নিকট "পরমহংস" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞবর ওলডেনবার্গ গৌতম বুদ্ধের ও যীশুখৃষ্টের আবিভাবকালের বর্ণনায় যথাক্রমে বলিয়াছিলেন—

(১) বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন—

"Voices are raised full of bitter lamentation over the degeneracy of the age, the insatiable greed of men, which knows no limit, until death comes and makes rich and poor alike."

(২) "Christianity founded its Kingdom in times of the keenest suffering, amid the death struggle of a collapsing world"

শতবর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষের—বিশেষ বাংলার—আত্মিক দুর্দশার অন্ত ছিল না। মুসলমান-শাসন যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন কোন কোন বাদশাহ ও প্রাদেশিক শাসককে ত্যাগ করিলে, সাধারণতঃ ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী মুসলমান শাসকরা হিন্দুস্থানে—বিরাট হিন্দু-সমাজের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া বিপ্লবে-বিপন্ন-হওয়া রাজনীতিকোচিত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। বিজয়ের বাত্যা দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—

"The East bowed low before the blast
In patient deep disdain :
She let the legions thunder past,
And plunged in thought again."

সমাজে আমাদিগের স্বরাজ অক্ষুন্ন ছিল। পাঠগোষ্ঠীতে শিক্ষক —আর্থিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া—শিক্ষাদান করিতেন; বেণুবনের মধ্যে দেবায়তনে আরত্রিকের বাদ্যধ্বনি ভক্ত নর-নারীকে আকৃষ্ট করিত। ধনীরা জনগণের কল্যাণকর কার্যে অর্থনিয়োগ করিয়া পুণ্যার্জন করিতেন; সমাজ তাহার শাসন-পালন কার্য সাধারণ ও নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করিত।

অধিকারভেদ-ব্যবস্থাবর্জিত যে ইসলাম আপনার গণতান্ত্রিকতার গর্ব করিয়া থাকে, সে ধর্মমত হিন্দু-সমাজের বন্ধন ও শাসন ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। এমন কি, হিন্দুস্থানের হিন্দু অধিবাসীরা যে চিরাগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্পকার্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, সার জর্জ বার্ডউডও তাহা মনুসংহিতার নির্ধারণ-ফল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু শিল্পীরা যে শিল্পের অনুকরণ করিয়াছে, তাহাতেই আপনাদিগের বিশিষ্ট্যবিকাশ করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ-নির্দেশে তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"Tiis is really owing to the homogeneous unity given to the immense mixed population of India by the Code of Manu. It is a population of literally 'teeming millions' nearly all of one way of life and thought."

যখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে এদেশে মুসলমান-শাসন তাহার চিতাশয়ন রচনা করিতেছিল, তখন অনাচারপ্রাবল্যে দেশের লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন ও দেশবাসী বিব্রত হয়। ফলে শিক্ষার অভাব ঘটে—লোক ভুলিতে থাকে, হিন্দুর ধর্ম যে তাহার জীবনের সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার কারণ হিন্দুর ধর্ম খৃষ্টানের religion মাত্র নহে; ইহা ধর্মের

সঙ্গে কর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত করিয়া মানুষের কর্তব্য স্থির করিয়া দেয়।

এই অবস্থায় এদেশে ইংরেজ-শাসনের প্রবর্তন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাই সর্বাগ্রে ও সর্বাপেক্ষা অধিক ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করে। ইংরেজ তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা হেতু আর সকল জাতিকে যেমন আপনার তুলনায় নিম্নস্তরের মনে করে, তেমনই অন্য ধর্মমতকেও স্বীয় ধর্মমতের তুলনায় হীন মনে করে। প্রথম ভাবটির পরিচয় আমরা কিপলিং-এর কবিতায় প্রাপ্ত হই। তিনি শ্বেতকায়দিগকে বলেন :

"Take up the White Man's burden—
Send forth the best ye breed—
Go, bind your sons to exile
To serve your captives' need ;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild—
Your new-caught sullen peoples,
Half devil and half child."—

দ্বিতীয় ভাবটি ধর্মযাজক হিসাবের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে বিকাশ পাইয়াছে :

"From Greenland's icy mountains,
From India's coral strand,
Where sunny Afric fountains
Roll down their golden sand,
From many a mighty river,
From many a palmy plain,
They call us to deliver
Their land from error's chain."

এই মনোভাব লইয়া বিজেতা ইংরেজ এদেশে আসিল এবং

এদেশের ধর্ম সভ্যতা সাহিত্য সংস্কার সবাই অবজ্ঞাভাজন বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। জড়বাদ-বিড়ম্বিত, ইহকালসর্বস্ব জাতির ধর্মসম্পর্কশূন্য শিক্ষা, হিন্দু সমাজের মূল শিথিল করিতে প্রয়াস করিতে লাগিল। কাঞ্চন-কৌলীন্যের আকর্ষণ দেশের লোককে এমনই আকৃষ্ট করিল যে, অনেকে স্বধর্মের স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্টাও করিলেন না—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—উক্তির যাথার্থ বিবেচনা করিলেন না।

খৃষ্টান ধর্মযাজকরা এদেশের লোকের উপর 'দয়াপরবশ' হইয়া এদেশের ভাষা আপনাদিগের প্রচারকার্যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজ ধর্মযাজকরা প্রচার করিতে লাগিলেন—'কেন না ঈশ্বর জগৎকে এমত প্রেম করিলেন যে, তিনি তাঁহার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন যে, যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে মরিবে না, পরন্তু অনন্ত জীবন পাইবে।' রাজশক্তির সাহায্যপুষ্ট প্রচারকার্য হিন্দুকে স্বধর্মের নিন্দা শুনাইতে লাগিল।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম দণ্ডায়মান হইল—ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ ও হিন্দুর আচারত্যাগে আগ্রহশীল ছিল না; রামমোহন বিলাতেও উপবীত ত্যাগ করেন নাই। তিনি জাতিভেদ বর্জন করেন নাই। কিন্তু তিনি হিন্দুর একেশ্বরবাদকেই প্রাধান্য প্রদান করিলেন—অধিকারভেদ ও পারম্পর্যের স্বরূপ বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। সেই জন্য কোন কোন য়ুরোপীয় মনে করিলেন—ব্রাহ্ম-মত Christianity without Christ. ব্রাহ্মসমাজেও মতভেদ আরম্ভ হইল। কেশবচন্দ্র রামমোহনের "আদি ব্রাহ্মসমাজ" ত্যাগ করিলেন। তিনি এদেশে শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ও ইংলণ্ডে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেন। বড়লাট ঘটক হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত কুচবিহারের রাজার বিবাহ স্থির করিলেন; সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে এত সম্মান দেখান যে, তাঁহার কন্যা কুচবিহারের মহারানী প্রাসাদে অতিথি হইলেন এবং আহারের সময় কোথায় তাঁহার আসন

নির্দিষ্ট হইবে জিজ্ঞাসায় সম্রাজ্ঞী বলিলেন, তাঁহার কন্যা প্রিন্সেস বিয়েট্রিসের আসন যে স্থানে নির্দিষ্ট হয় সেই স্থানে মহারানীর আসন নির্দিষ্ট হইবে। এই কেশবচন্দ্র সাধনায় যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই হিন্দুর আচার ও সংস্কারনির্দিষ্ট মার্গ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি ততই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন—তিনিও অধিকারভেদ স্বীকার করিলেন। তিনি হিন্দুর প্রকৃতিগত সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ইহা হিন্দু ব্যতীত অপরের পক্ষে উপলব্ধি করা এত দুঃসাধ্য যে, কেশবচন্দ্রের গুণানুরক্ত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মানসিক শক্তিও বিপন্ন হইয়াছিল ('His mental strength was in imminent danger.') বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস ও রামানন্দ ভারতীরই মত হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন এইরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির বোধের অতীত।

যে সময় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসন্তানগণ যে উদার ধর্মমত বিততশতশাখ বৃহৎ বনস্পতির মত ত্রিতাপতপ্ত মানবকে যুগে যুগে অবারিত আশ্রয় ও স্নিগ্ধ ছায়া প্রদান করিয়া আসিয়াছে, সেই ধর্মে বিশ্বাস হারাইতেছিলেন, সেই সময় রামকৃষ্ণের আবির্ভাব যে বিশেষ কারণে হইয়াছিল, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাসে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? তিনি হিমালয়ের গুহায় বা নির্জন বনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন নাই; কোলাহল-মুখরিত ইংরেজসৃষ্ট রাজধানী কলিকাতার উপকণ্ঠে দেবমন্দিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যে পাণ্ডিত্য পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত অনুশীলন করা যায় না, সে পাণ্ডিত্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু যে জ্ঞান উৎসমুখমুক্ত নির্মল ও পাবনী জলধারার মত স্বতঃ উদ্গত হয়, তাহাই তাঁহার নিকট লোককে আকৃষ্ট করিত। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, তিনি যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকিতেন—সাধু-সন্ন্যাসীরা তীর্থে যাতায়াতের পথে তথায় আসিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলনে রামকৃষ্ণের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে

মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ, রামকৃষ্ণের জীবনে পরিবর্তনের (শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে revolution বলিয়াছেন) কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; যে ভাব বাল্যকাল হইতে লক্ষিত হইয়াছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ফুরণ হইয়াছিল। ত্যাগ ও সংযম যে তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সংসার কোনদিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই—দৌর্বল্য তাঁহার অজ্ঞাত ছিল এবং ব্রহ্মতন্ময়তা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল।

হিন্দু সাধুরা কখনো প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের বিশ্বাস—মানুষের মন যখন স্বতঃই দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হয় না, তখন তাহাকে দীক্ষাদান ক্ষারে বীজ-বপনের মত নিষ্ফল হয়। রামকৃষ্ণ হিন্দু সাধুর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল যাঁহারা মুক্তিমার্গের অনুসন্ধানে তাঁহার নিকট গমন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকেই উপদেশ দিতেন। সে উপদেশও বেদী হইতে প্রদত্ত হইত না, আলোচনার মধ্য হইতে বাহির হইয়া জ্ঞানান্বেষণকারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিত।

কেশবচন্দ্র যখন হিন্দুর সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয় হয়। কোন সূত্রে এই পরিচয় সংসাধিত হয়, তাহা জানা যায় না। তাহা জানিবার প্রয়োজনও হয়ত নাই। কেশবচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণের বা রামকৃষ্ণের জীবনে কেশবচন্দ্রের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহাও ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই যে কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিতকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনায় বুঝা যায়। প্রতাপচন্দ্র সরলভাবেই লিখিয়াছেন, বেলঘরিয়ায় একটি বাগানে যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস একখানি জীর্ণ ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়িতে আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া—'We did not take much notice of him at first.' কিন্তু তিনি যেন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন ও মধ্যে-মধ্যে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। 'What he said, however, was so profound and beautiful that we

soon perceived he was no ordinary man.'—তিনি সাধারণ মানুষ নহেন। দর্শন যে আকর্ষণে পরিণত হইয়াছিল—সত্যসন্ধ কেশবচন্দ্র যে রামকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তখনই ভগবানের মাতৃরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। 'Now the sympathy, friendship and example of the Paramahansa converted the Motherhood of God into a subject of social culture with him.' এই কথাই আমি ভূপেন্দ্রনাথ বসুর কাছে শুনিয়াছি।

যে যাহাই হউক, কেশবচন্দ্র—ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে, সর্বত্র সমাদৃত—নব-ভারতের ইন্দ্রালয় বিলাতেও সম্মানিত—কেশবচন্দ্র যখন রামকৃষ্ণের অসাধারণত্ব স্বীকার করিলেন, তখন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইল। সে সমাজে তাঁহার উপদেশ প্রচারের—যে উদ্‌ভ্রান্ত সমাজকে আত্মস্থ করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—সেই সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠার দ্বার এইরূপে মুক্ত হইল। হিন্দু-ধর্মের ভিত্তির উপর বিশ্বধর্মের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লক্ষিত হইল। 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি'—তেমনই সকল ধর্মমতই যে এক ঈশ্বরের অভিমুখগামী, সেই সত্য মানুষ ভুলিয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় বলিয়াই ধর্মের নামে নৃশংসতার ও অধর্মের অনুষ্ঠান করে। সেই সত্য রামকৃষ্ণ বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের পরবর্তী। রামকৃষ্ণের প্রেরণা বিবেকানন্দ-আধারে কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা আর ভারতবাসীকে বলিয়া দিতে হইবে না। সেই প্রেরণা যেমন বিদেশে বেদান্তবাণী প্রচারের কারণ হইয়াছিল, তেমনই স্বদেশে কর্মযোগের চরম পরিণতি লোক-সেবায় মানুষকে নিযুক্ত করিয়াছে।

বহু বিদেশী কোবিদ যে ভাবে রামকৃষ্ণের উপদেশের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, দুই সম্প্রদায় তাঁহাকে যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—আর কেহ তেমন পারেন নাই। সেই দুই সম্প্রদায়—বিদেশী সত্যানুসন্ধানকারীরা, আর যাঁহারা

তাঁহার সহিত পরিচয়ের ও তাঁহার উপদেশলাভের সৌভাগ্যার্জন করিয়াছিলেন।

বিদেশীরা দূর হইতে তাঁহার উপদেশের ও উক্তির কিরণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন—যে সঙ্কীর্ণতা ও দ্বেষ স্বদেশে শ্রেষ্ঠদিগের অনুসরণ করে, তাহা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—প্রভাবিত বা অভিভূত করা পরের কথা। এ বিষয়ে বাইবেলের উক্তি মনে পড়ে—'A prophet is not without honour, save in his own country and in his own house', ম্যাক্সমূলার, রোমা রোঁলা, লর্ড জেটল্যাণ্ড তাঁহার প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

আর যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অন্যতম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন:

এই পবিত্র পুরুষ হিন্দুধর্মের গভীরতার ও মাধুর্যের জীবন্ত নিদর্শন। তিনি দেহ (অর্থাৎ সর্ববিধ দৈহিক প্রয়োজন) সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছেন। তিনি কেবলই আত্মায় ও ধর্মে পূর্ণ, সদানন্দ ও সদাপূত। হিন্দু সন্ন্যাসীরূপে তিনি জগতের অসারত্ব ও অসত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। His testimony appears to the profoundest heart of every Hindu. ভগবান্ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন চিন্তা নাই, অন্য কোন কার্য নাই, অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, এ জীবনে কোন বন্ধু নাই। তাঁহার পক্ষে ভগবান্ই যথেষ্ট অর্থাৎ তিনিই সর্বস্ব। His spotless holiness, his deep unspeakable blessedness, his unstudied endless wisdom, his childlike peacefulness and affection towards all men, his consuming all-absorbing love for God are the only reward.

প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষভাবে জানিয়া এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, তিনি অতিরঞ্জনের বিরোধী ছিলেন। রামকৃষ্ণভক্ত যে সব সন্ন্যাসী মার্কিনে প্রচারকার্যে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি প্রতাপচন্দ্র বিশেষ সদয় ছিলেন না; কারণ, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর

সর্বত্যাগের আদর্শের অনুসরণনিষ্ঠা তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইতেন না। সেই প্রতাপচন্দ্র রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুভূতির ফল। তিনি বলিয়াছেন, তিনি য়ুরোপীয়-ভাবাপন্ন, অর্ধ-অবিশ্বাসী, 'তথাকথিত' শিক্ষিত যুক্তিবাদী; তাঁহার সহিত এই দরিদ্র, নিরক্ষর, অমার্জিত, অর্ধ-মূর্তিপূজক, নির্বান্ধব হিন্দু সন্ন্যাসীর ঐক্য কোথায়? অথচ তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনেন। তিনি যখন যে স্থানে গমন করেন, তখনই তথায় সমুজ্জ্বল পরিবেষ্টনের সৃষ্টি করেন।

যাঁহারা তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আমি তাঁহার প্রভাবের ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি—"বসুমতীর" প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই গৃহীর ব্যবসায়ীর আবরণের মধ্যে যে আত্মিকভাব ও উদারতা ছিল, তাহা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি, তিনি যখন দারিদ্র্যের ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় পরমহংসদেবের অন্য একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি উপেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করুন যেন তাঁহার আর্থিক উন্নতি হয়; তাহাতে সেই সাধু বলিয়াছিলেন, "ও ত সে আশীর্বাদ চায় না। ওর কেবল আকাঙ্ক্ষা—ওর যে ছোট দুয়ার আছে, সেটি বড় হয়।" অর্থাৎ তাঁহার ব্যবসা বিস্তার লাভ করে। তাহা যে হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন এবং সেই জন্য তাঁহার একজন কর্মচারী (তিনি আপনাকে পরমহংসভক্ত বলিয়া অভিহিত করিতেন) বলিতেন, 'বসুমতী' ব্যবসা রামকৃষ্ণের সদাব্রত। তাঁহার এক বালক কর্মচারী পুস্তক চুরি করিয়া পুলিস কর্তৃক মামলা-সোপর্দ হইলে উপেন্দ্রনাথ আদালতে যাইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছেন, তিনিই তাহাকে সেসব পুস্তক দান করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে প্রতারিত করিলে তিনি তাহার প্রতিকার করিতে অস্বীকার করিয়া অনায়াসে ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। এসব উদারতার, মানুষের প্রতি প্রেমের, দুর্বলের প্রতি অনুকম্পার,

সংসারে নির্লিপ্ততার ও লোভ হইতে নিষ্কৃতির পরিচয়, সে-সব কি তাঁহার গুরুর প্রভাবেই প্রস্ফুরিত হয় নাই ?

শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "ঠাকুরের মাহাত্ম্য—তিনি তাঁহার আশীর্বাদ ও বিভূতি তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য-দিগকেই দিয়াছিলেন।" তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আমি স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করি।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমি দেখিয়াছি দূর হইতে। তিনি যখন মার্কিনে ধর্মসম্মিলনে গমন করেন, তখন বাংলা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য আদর ও সম্মান প্রদান করে নাই। কিন্তু তথায় তিনি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে রেল-স্টেশনে ও সভায় যে সম্বর্ধনা করা হয়, সেই অনুষ্ঠানদ্বয়েই আমি উপস্থিত ছিলাম। মার্কিনের আন্তর্জাতিক সম্মিলনে যখন নানা ধর্মের প্রতিনিধিরা ভারতীয় ধর্মের অর্থাৎ হিন্দুধর্মের নিন্দায় সভাস্থল মুখরিত করিলেন, তখন এই তরুণ সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতিভাসমুজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি সভাপতির উপর স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনাদিগের মধ্যে কয়জন হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন?" নির্বাক প্রতিনিধি-গণ স্তম্ভিত হইলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক যে শ্রদ্ধার ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে যে বিশ্বাস তিনি তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন—তাহাতে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে গাণ্ডীবীর আচরণই মনে হয়। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এখন আমাদিগের কর্তব্য কি?" উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি বাংলায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, তবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে—যে দেশে রেলে ষ্টীমারে নারী লাঞ্ছিত হয়েন, সে দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে সর্বাগ্রে তাহার প্রতিকারোপায়ের অনুশীলন করা কর্তব্য।

পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের মধ্যে একজনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। তিনিই বর্তমানে মঠের সভাপতি। তাঁহার কার্যে আমার প্রশংসা ও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা

তিনি জানেন বলিয়াই আশা করিতেছি, আমি যদি আমার মত ব্যক্ত করি—এই পুণ্যপূত পদলাভে তাঁহার অধিকার ও যোগ্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও বলা যায়—এই পদের দায়িত্ব ও গাম্ভীর্য নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে—তবে তিনি কখনই আমাকে অপরাধী বা ধৃষ্ট বিবেচনা করিবেন না। এ যেন স্বচ্ছন্দে ত্রিভুবনবিহারী গরুড়কে পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সারগাছির সে সদানন্দ সন্ন্যাসীর কাছে গল্প শুনিতে কালের পরিমাপ ভুলিয়া যাইতাম—যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না—সেই স্বামী অখণ্ডানন্দের ব্যক্তিত্ব যেমন অসাধারণ, তাঁহার মনুষ্যত্ব তেমন মুগ্ধকর। তিনি সেবাব্রতে দিনযাপন করিতে কত বার কত দেশে বিপন্ন হইয়াছেন, তাহার বিবরণ তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গি অসাধারণ যে-কোন লেখক বা বক্তা তাহা লাভ করিলে পাঠক শ্রোতার চিত্ত অনায়াসে জয় করিতে পারেন। তাঁহার সরলতা ও জনপ্রেম তাঁহার গুরুর আদর্শে পুষ্ট ও তাঁহার আশীর্বাদে সার্থক হইয়াছে। তিনি এখনও দীর্ঘকাল বিবেকানন্দের কল্পিত সেবামন্দিরের পৌরোহিত্য করুন—মনীষার পঞ্চপ্রদীপ ভক্তির গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া সাধনার শিখার তলায় আরতি করুন—ইহাই তাঁহার গুণমুগ্ধদিগের একান্ত কামনা।

আজ রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। সে সকলের প্রয়োজন, উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নহে। কিন্তু যাঁহারা সেই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগের নিকট দেশবাসী এ আশা অবশ্যই করিতে পারেন যে, তাঁহারা পরমহংসদেবের উপদেশের মূল তত্ত্ব যেন সর্বদাই সম্মুখে রাখিয়া তাহার দ্বারা আপনাদিগের কার্য নিয়ন্ত্রিত করেন। আর, তাঁহার ভক্তগণ যে দেশে ও যে কার্যেই কেন থাকুন না, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, হিন্দুস্থানে,—হিন্দুসংস্কৃতির বক্ষে—হিন্দুধর্মের অঙ্কেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল এবং তাহাই স্বাভাবিক।

আর আজ আমরা যেন মনে করিতে পারি যে, হিন্দুস্থানে—যে দেশে প্রথম সামরব শ্রুত হইয়াছিল—যে দেশে সভ্যতার আলোকে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল—যে দেশ আপনার স্বতন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং যে দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম উদারতায় অপরাজেয়, সেই দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি—আমরা হিন্দুর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই যে, সভ্যতার আদি যুগ হইতে এ দেশে সাধকের ও ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছে ও এ দেশের পুণ্যভূমি তাঁহাদিগের সাধনায় পূত। আমরা যেন অনুভব করি—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

তখন শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ বুঝাইবার জন্য ভারতবর্ষে মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ভারতবর্ষের শাশ্বত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে, সমগ্র দেশে আর্য জাতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সম্প্রদায়ে-উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—হিন্দুধর্মের অসংখ্য বর্ণ-বিভাগ ঘটিয়াছিল ; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আচার-ব্যবহার রীতিনীতি লইয়া কলহ ও বিদ্বেষের বাহ্য অনৈক্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া দেশের মধ্যে কঠিন সমস্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। এজন্য বিদেশীরা আমাদের দেশের লোককে বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করিত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মানব-দেহ ধারণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, নানা অনৈক্যের মধ্যেও হিন্দুধর্মের প্রকৃত ঐক্য বিদ্যমান। তাঁহার মানবদেহ ধারণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মনুষ্যলোকের স্থায়ী কল্যাণের জন্য তিনিই সনাতন ধর্মের মূর্ত প্রতীক। সময়ের প্রভাবে এই ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই তিনি তাঁহার লোকাতীত বিচিত্র জীবনের সাহায্যে ঐ ধর্মে বিশ্বজনীন প্রভাব সঞ্চার করিয়া উহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

সর্বদা একথা স্মরণপথে রাখিও যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কল্যাণ-কল্পে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—নাম ও যশের জন্য নহে। তিনি যে শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা প্রচার করিও। তাঁহার নামের জন্য ভাবিও না—উহা স্বতই প্রচারিত হইবে।

সন্তানগণকে সাহায্য করিবার জন্য—অধঃপতিত ভারতকে উন্নতির শিখরে উত্থিত হইবার সুযোগদানের জন্যই তিনি আবার আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে বসিয়াই ভারতের উন্নতি ঘটিবে।

ছয় বৎসর ধরিয়া চেষ্টার পর আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে,

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু পুণ্য মানব নহেন—পবিত্রতাই তিনি স্বয়ং। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বেদ ও উপনিষদের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। তাঁহার নিজের জীবনে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, শুধু হিন্দু নহে, সমগ্র মানব জাতি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কিভাবে ধর্মময় জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

এমন প্রেম, এমন জ্ঞান, এমন রিপুজয় এবং সমদর্শিতা আমি কোথাও কাহারও মধ্যে দেখি নাই। ভগবান স্বহস্তে আমাদের ঠাকুরকে গড়িয়াছিলেন। ভগবানের সমগ্র শক্তি তাঁহাতেই সমর্পিত হইয়াছিল। আমার ধারণা, যিশুখৃষ্ট চৈতন্য এবং আপনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) একই।

—মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম)

গুরুদেব আমাদের প্রত্যেককেই এমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাবিত, তাহাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী স্নেহ করেন। যতই দিন যাইতেছিল, আমার গুরুদেবের মহত্ব ও গৌরব ততই উপলব্ধি করিতেছিলাম। তিনি মানবদেহধারী ভগবান, তাঁহাতেই যাবতীয় দেব-দেবী বিদ্যমান। —স্বামী অদ্ভুতানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে গুরুদেবের সহিত কত মহানন্দেই না কাটিয়াছিল। তাঁহার সহিত কী অসঙ্কোচ ব্যবহারই না আমি করিয়াছি। একদিন অর্ধবৃত্তাকার পশ্চিমের অলিন্দে আমি তাঁহার দেহে তৈলমর্দন করিতেছিলাম। কোন একটা কারণে আমি তাঁহার উপর রাগ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৈলের বোতল দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমি দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম, আর তাঁহার কাছে আসিব না। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমি যদু মল্লিকের বাগানবাড়ির কাছে আসিলাম। সেখান হইতে আর অগ্রসর হইবার আমার শক্তি হইল না। সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য "র"-কে পাঠাইলেন। আমি ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, 'কি দেখলি? যেতে পারলি?'

একদিন আমার মনে পাপচিন্তা প্রবেশ করিল। আমি গুরুদেবের কাছে যাইবামাত্র, দূর হইতে তিনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'ওরে, তোর মনে পাপ ঢুকে তোর মনকে চঞ্চল করে তুলেছে।' বলিতে বলিতে তিনি আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদচ্ছলে—অস্পষ্ট ভাষায় কি যেন উচ্চারণ করিলেন; পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার মনের সে ভাব কাটিয়া গেল।

আর একদিন, কলিকাতা হইতে আমি ফিরিবার পর তিনি বলিলেন, 'ওরে, তোর দিকে আমি চাইতে পারছি না কেন? কোন অন্যায় কাজ কিছু করেছিস?' আমি বলিলাম, 'না।' কিন্তু একটা মিথ্যা কথা যে বলিয়াছিলাম তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কোন মিছে কথা বলেছিস্?' তখন আমার মনে পড়িল, সত্যিই আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম।

বিবেক-বৈরাগ্যের মুক্তপ্রকাশ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণে দেখিয়াছিলাম। ধর্মগ্রন্থে শাস্ত্রে বিবেক-বৈরাগ্যের কথাই আমরা পড়িয়া থাকি। কিন্তু উহাদের মুক্তপ্রকাশ তাঁহাতেই দেখিয়াছিলাম। মিশ্রিত বা জাগ্রত কোন অবস্থাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ কোন প্রকার মুদ্রার স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনাদর্শ সাহায্যে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, ত্যাগধর্ম ব্যতীত ভগবানকে পাইবার কোনও উপায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ দেখিয়া তাঁহারই আদর্শে জীবনকে গঠিত করিয়া তোল।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও বাঁচিয়া আছেন কি না, এই প্রশ্ন স্বামীজিকে করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা কি পাগল হয়েছ? তিনি বেঁচে না থাকলে কি আমরা গৃহধর্ম ত্যাগ ক'রে এ রকম জীবনযাপন করতে পারতাম? তিনি আছেন। শুধু সমস্ত মন দিয়ে তাঁকে ডাক, তাহলেই তিনি পূর্ণ প্রভাবে তোমার কাছে আবির্ভূত হয়ে তোমার মনের সব সন্দেহ, সব সংশয় দূর ক'রে দেবেন।' স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করার পর স্বামীজি কি তাঁহার দেখা পাইয়াছেন? 'হ্যাঁ, তবে যখন তাঁর খুশি হয়েছে, তিনি আমাদের

কাছে দেখা দিয়েছেন, তখনও তাঁর দেখা পেতে পারে। কিন্তু হায়! তাঁকে দেখবার কার আগ্রহ আছে? ক'জনের প্রাণে সে আগ্রহ জেগেছে?

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

জীবন্ত উপনিষদ সম্মুখে থাকিতে অন্য কোন্ উপনিষদ তুমি শিক্ষা দিবে? গুরুদেবের জীবনই জাগ্রত দীপ্তিময় উপনিষদ। শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের জীবনধারায় প্রমাণ না করিলে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও হইত না। সেইরূপ উপনিষদের প্রকৃত তত্ত্ব গুরুদেবের মধ্যেই জাগ্রত, কিন্তু তিনি কোনও দিন উপনিষদ বা অন্য কোন শাস্ত্র পাঠ করেন নাই। অথচ মজা এই যে, অতি সূক্ষ্মতম জটিল সত্যগুলি তিনি কত সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তুমি যদি বেদ অধ্যয়ন করিতে চাও ত তোমাকে ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক টীকাকার নিজ নিজ ধারণা অনুসারে যে সকল টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা মনে রাখিতে হইবে। অসংখ্য টীকাকার বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই শেষ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমাদের গুরুদেব অতি সহজ ও সরল ভাষায় বেদের সকল তত্ত্ব কেমন চমৎকার বুঝাইয়া দিয়াছেন। তোমার সম্মুখে যখন সজীব উৎসধারা অবস্থিত, তখন জলের জন্য কূপখননের প্রয়োজন কোথায়?

—স্বামী প্রেমানন্দ

আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামকৃষ্ণদেব মানুষ না দেবতা, না স্বয়ং ভগবান। তবে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, তিনি একেবারে জ্ঞান ত্যাগ ও প্রেম। তাঁহার ভিতর কোনও প্রকার অহং-জ্ঞান ছিল না। যতই দিন যাইতেছে এবং অধ্যাত্ম-জগতের প্রকৃষ্ট সন্ধান পাইতেছি, যতই গুরুদেবের চরিত্রের বিশালতা গভীরতা এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি, ততই আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে যে, ভগবানের সহিত তাঁহার তুলনা করা, অর্থাৎ আমরা সাধারণতঃ যেভাবে ভগবানকে

বুঝিতে চাই সেভাবে তুলনা করিতে গেলে তাঁহার অনন্তত্বের খর্ব করা হইবে। আমি দেখিয়াছি, তিনি ভগবানের প্রেম, সকল নর-নারীকে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সৎ-অসৎ নির্বিচারে সকলকেই বিলাইতেন। মানবের দুঃখ-কষ্ট ঘুচাইয়া, ঈশ্বরদর্শনের সুযোগ দিয়া, তাহাদিগকে শাশ্বত শান্তিপ্রদানের জন্য তাঁহার একান্ত উৎকণ্ঠা কী অপূর্ব! গুরুদেবের মত বর্তমান যুগে আর কেহই যে মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণকামী ছিলেন না, একথা আমি সর্বপ্রযত্নে বলিব।

—স্বামী শিবানন্দ

গুরুদেবের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া এবং তাঁহার অতুলনীয় চরিত্র এবং জীবনকথা সম্বন্ধে ধ্যান করিয়া আমি সবিস্ময়ে ভাবিতেছি যে, তাঁহাতে মানবত্ব ও দেবত্বের অনুপম সমাবেশ। যদি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিতাম, তাহা হইলে কখনই বুঝিতে পারিতাম না, একই ব্যক্তিতে এমন বিচিত্র ও বিভিন্ন আদর্শ ও কল্পনার সমাবেশ ঘটিতে পারে। আমার দৃঢ় ধারণা তিনি মানবরূপে ভগবান। মানবদেহ ও মনের আধারে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ঐশ্বরিক সম্পূর্ণতার পরম দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিশ্বের যাঁহারা শিক্ষাগুরু, সেই অত্যল্প সংখ্যক মানবদেহধারীদিগের মধ্যে তিনিও একজন।

ভারতের জাতীয় সমস্যার সমাধানের জন্যই গুরুদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বজনগণ যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা পরিপূর্ণ করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। জগতের ও ভারতের ধর্ম-বিরোধ-সমস্যা গুরুদেবই সমাধান করিয়া গিয়াছেন। জগতের কল্যাণকল্পে অশ্রুতপূর্ণ সাধনার দ্বারা তিনি ভারতের সনাতনী-শক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

—স্বামী সারদানন্দ

পরমহংসদেবের কাছে যাঁহারা যাইতেন, সকলেই ধার্মিক ও সাধুস্বভাব ছিলেন। যে সকল ভক্ত যুবক তাঁহারই কাছে গিয়া পরে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার

ভালবাসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার প্রেম কোন শর্তাধীন ছিল না। তাঁহার এ ভালবাসা তাঁহারই পরম দয়ার দ্যোতক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি পাপীর পরিত্রাতা ভগবানরূপেই দেখিয়াছিলাম। যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয়ত খুব লঘুচিত্ত ছিলেন, কিন্তু আমার মত চপলমতি ও লঘুচেতা লোকের তুলনায় তাঁহারা ঋষিতুল্য। আমি জীবনের সোজা সরল পথে কখনও চলিতে চাহিতাম না। কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও আমি তাঁহার গভীর স্নেহ ও দয়ার পাত্র হইয়াছিলাম। হায়! আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ-প্রেমের অন্ত ছিল না! দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দেবীর জন্য যে সকল ফল ও মিষ্টান্ন উপহৃত হইত, তাহা হইতে তিনি কিছু কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আমার জন্য কলিকাতায় আমার বাড়িতে লইয়া আসিতেন এবং স্বহস্তে তিনি উহা আমাকে খাওয়াইতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার জন্যে যে পায়স হইয়াছিল, তাহা হইতে কিছু তিনি আমাকে খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি যখন আমার মুখে পায়স তুলিয়া দিয়াছিলেন তখন আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি বয়স্ক পুরুষ। নিজেকে তখন শিশুর মতই মনে হইয়াছিল। আমার তখন অনুভূতি হইতেছিল যে, স্বয়ং বিশ্বজননীই আমাকে খাওয়াইতেছেন। এখন তিনি ইহধামে বিরাজিত নাই। কিন্তু যখনই আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা মনে পড়ে, আমার অন্তরতম প্রদেশ ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়ে। পতিত মানবাত্মার প্রতি এমন স্বর্গীয় প্রেম কোনও দেহধারী মানুষের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে, ইহা আমি কল্পনা করিতেও পারি না। কারণ, সে-দৃশ্য আমার পক্ষে অসহনীয় হইত। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী কত বিচিত্রই ছিল! তিনি আমাকে কোনও কাজ করিতে নিষেধ করেন নাই। আমার গুরুজনগণ আমাকে যে কার্য করিতে নিষেধ করিতেন, শৈশবকাল হইতেই আমি ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতাম। পরমহংসদেবের শিক্ষা-প্রণালী আমার পক্ষে অব্যর্থ ফল প্রসব

করিয়াছিল। যখনই কোন মিথ্যা কথা বলিবার প্রবৃত্তি জাগিত, অথবা কোনও পাপ-প্রবৃত্তি আমাকে প্রলুব্ধ করিত, অমনই আমার মানসাকাশে গুরুদেবের মুখ ভরিয়া উঠিত। অমনই আমি সে কার্য হইতে বিরত হইতাম। শ্রীরামকৃষ্ণ চিরদিনই আমার অন্তরাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তাহা আমার গুণের জন্যে নহে, তাঁহারই দয়া ও প্রেম আছে বলিয়া। আমার সমস্ত পাপ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ধর্ম যে কি, তাহা আমাকে বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সে আজ একশত বৎসর আগেকার কাহিনী। সেদিন পুণ্য প্রভাত। মানব-বুকের পুঞ্জিত বেদনা স্তূপীকৃত হয়ে স্পর্শ করিল দেবতার চরণ। বৈকুণ্ঠের পদ্মাসন উঠিল দুলে। দেবতা এলেন মর্ত্যে মানব-মূর্তিতে। এমনি করিয়াই তাঁহাকে আসিতে হয় তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে। যুগে যুগে। কালে কালে। কখনো আসেন কারাগারে, কখনো আসেন রাজপ্রাসাদে ; এবার আসিলেন কামারপুকুরে পল্লীগৃহে। চন্দ্রাদেবীর কোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবার এলেন ধর্মের বিরোধ মিটাইতে। ধর্মের নাম করিয়া যে বজ্রমুষ্ঠি বিশ্বমানবের ধর্মপ্রাণতার আঘাত করিয়া তাহাকে বিকৃত করিতেছিল, কঠিন করিয়া তুলিতেছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর এলেন তাহাই দূরীকরণ করিতে। তাই প্রত্যেক ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান মানিয়া, তাহারই মধ্যে উপাসনা করিয়া সেই এক উপাস্যকেই তিনি বারে বারে প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বমানবের নমস্য হইলেন।

সেই চির-নমস্যকে জগদ্‌গুরুরূপে শতবর্ষের শুভ উৎসবে বিশ্বমানব আজ প্রণাম করিতেছে। জাতি ধর্ম দেশাচার কেহই আজ গভীর বাধা দিয়া তাহার দুর্বার গতিকে রোধ করিতে পারিবে না। কারণ, তিনি তো একটা দেশের, বা একটা জাতির জন্য—বিশ্বমানবের জন্য। পরধর্মে দ্বেষবুদ্ধি যখন ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্যাকুলতাকে অহল্যার মত পাষাণ করিয়া দিয়াছিল সে কঠিন অভিশাপগ্রস্ত বিকৃত বাসনার তপ্ত শ্বাস অজগরের নিশ্বাসের মত শুধু ছড়াইতেছিল জ্বালা। ধর্মের নাম করিয়া মাথা তুলিয়াছিল বিভেদের বিন্ধ্যগিরি। দেবতার অম্লান দীপ্তিকে অহমিকার উচ্চচূড়ায় আড়াল করিয়া সে স্পর্ধিত দম্ভে বিভোর। ভুলিয়াছিল বিশ্বমানবের সুকুমার বৃত্তিগুলি নিরন্তর হাহাকারে খুঁজিতে থাকে মিলনকে, বরণ করিতে চাহে সততায় শুভ বুদ্ধিকে,

নিখিল মানব-চিত্তের ক্ষুব্ধতা মিটাইতে, তৃষিত অন্তরকে স্নেহবারি অঞ্জলি ভরিয়া ঢালিয়া দিতে, শ্রীভগবান মানব-মূর্তিতে আসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হইয়া লীলা করিলেন। বিশ্ব-মানব তাঁহার দুয়ারে হাত পাতিল। ধর্ম-পাষাণরূপিণী অহল্যার অভিশাপ বিমোচন হইল।

মানুষের সাথী মানুষ। কর্মের সাথী ধর্ম। তাহাকে বিভেদ করিয়া চারিদিকে দুর্গ পরিখা নির্মাণ করার অর্থ—বন্ধনের নাগপাশ দিয়া দেবতাকে ক্লিষ্ট করা। মুক্তি-গরুড়কে তখনই প্রয়োজন হয়।

সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীশ্রীঠাকুর যেন সেই মুক্তি-গরুড়। অথচ তিনিই ধর্মের প্রতীক। পরশমণি যেমন লোহাকে সোনা করিতে পারে, ধর্মজগতের স্পর্শমণি শ্রীশ্রীঠাকুরও তেমনি করিয়া সংশয়বাদী নিরীশ্বর মতাবলম্বীর বুকে বিশ্বাসের হিমাচলকে অভ্রভেদী করিয়া দিতে পারিতেন। যাঁহারা তাঁহার পূত জীবন অনুশীলন করিয়াছেন, ইহা তাঁহারাই অবগত আছেন।

ধর্মে যেমন নিষ্ঠা না থাকিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না, তেমনি পরধর্মকে অবিশ্বাস করিলেও দেবতার অবমাননা করা হয়। যিনি মুক্তি-প্রতীক, তাঁর গণ্ডীবন্ধন কিসের? অসীমের আবার সীমা কি? সীমা ত মনের—আমার জ্ঞানের। আর এই মোহগ্রস্ত চিত্ত আপনার উত্তেজনায় আপনি উদ্দীপ্ত হইয়া যখনই শক্তি প্রয়োগ করে অপরের দলনে—বিশ্বদেবতার বুকে ব্যথা তখনই বাজে, আপন ধর্ম, আপন অনুষ্ঠান।

মানুষের ব্যক্তিগত পুকুর। তাতে আপন গোষ্ঠিবর্গের ঘর-করা চলিতে পারে। তরঙ্গ নাই, হাঙ্গর-কুমীর নাই। স্নিগ্ধ সলিল সুস্বাদে ভরা। শুধু দেয় অনাবিল তৃপ্তি। কিন্তু দেশ-জাতিকে বাঁচিতে হইলে প্রয়োজন সমুদ্রের। তাতে উত্তাল তরঙ্গ আছে। হাঙ্গর-কুমীর আছে। প্রাণবিনষ্টকারী অনেক কিছুই আছে। তথাপি তাহার বুক দিয়াই চলে বাণিজ্যের পোত। তাহারই গর্ভে থাকে বিশ্ব-মানবের সম্পদ—সৌভাগ্যসম্ভার। তাহাকে না পাইলে জাতির আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বিপদের বুকে সম্পদ লুকান আছে। মৃত্যুর পিছনে থাকে নবজীবনের গান।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিক্ষা-দীক্ষা ভাবধারা দিয়া মানুষকে সেই মন্ত্রেই আজ উজ্জীবিত করিয়াছেন, ধর্মজীবনে মানুষ নূতন আস্বাদ পাইয়াছে। আকণ্ঠপূরিত অমৃতবারি পান করিবার উৎসধারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্গুলি-নির্দেশে মানবকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

বহুদিন যে দুষ্প্রাপ্যকে মানুষ খুঁজিয়াছে, ভাবিয়াছে বিশ্বদেবতার অনন্ত শুভবুদ্ধিধারা হয়ত এইখানেই ঘটিয়াছে ; সেই ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দুর্দিনে, মেঘাচ্ছন্ন রবি অকস্মাৎ দীপ্ত-মূর্তি প্রকাশ হইয়া সব মলিনতাকে নিমেষে নাশ করিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্গুলি উত্তোলনে বুঝাইলেন ; "যত মত তত পথ", তাঁর লীলা-সহচররা সেই অমৃত-বাণী দিকে দিকে প্রচার করিয়া, বিরোধের বিকৃত পথ হইতে ভ্রষ্ট শান্তিকে পুনরায় স্বগৃহে আনয়ন করিয়া, "স্বাগতম" দিয়া বরণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী, এঁরা যেন সেই বৌদ্ধযুগের ভিক্ষু সন্তান, অথবা খৃষ্টযুগের অমৃত-বাণী-প্রচারকের দল। তথাপি তাঁহাদের মাঝে ছিল স্বমত-প্রতিষ্ঠার সাধনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদের বুকে আছে শুধু ধর্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনা। স্বমত পরমত নাই। ধর্মবুদ্ধিই শুভ। মানবের কল্যাণ। বিশ্বের শান্তি তাহার মাঝেই প্রতীক হইয়া উঠে। শুধু এই অমূল্য তত্ত্ববাণী দিয়া সমগ্র বিশ্ব-মানবের মোহ শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুচাইয়াছিলেন। তাই তাঁর শতবার্ষিকীতে আজ বার-বার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলি, 'হে গুরু! হে ইষ্ট! হে মানবদেহধারী ভগবান! তোমার সাক্ষাৎ অপার করুণা-কণা উপলব্ধি করিয়া অন্তর যেন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যায়। তুমি শুধু এই আশীর্বাদ আমাদের নমিত মাথায় দাও দেবতা !'

জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও-সব বিচারের কথা।…মা-সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত।

*

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায় তাঁকে জানবার জন্য বই পড়া।

*

গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। গীতা-গীতা দশবার বলতে গেলে ত্যাগী-ত্যাগী হয়ে যায়।

*

বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মলমূত্র এই সব। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়?

*

টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত—ভগবান্ লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

*

বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়।…সাত চোঙার বিচার এক চোঙায় যায়—বিশ্বাস চাই, বালকের মত বিশ্বাস।

*

শুধু পণ্ডিত হ'লে হয় না। যার সংসার অনিত্য ব'লে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়।

*

শাস্ত্র পড়ার দোষ—তর্ক বিচার এই সব এনে ফেলে, বইয়ে-শাস্ত্রে বালিতে-চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু নিয়ে বালি ত্যাগ করেন।

*

শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থ টুকু নিতে হয়—যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে, তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা।

যদি সাপে কামড়ায়, "বিষ নাই" জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি "আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত" এই কথাটি রোখ ক'রে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।...যে "আমি বদ্ধ" বার-বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন "আমি পাপী—আমি পাপী" এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

ভগবানের জন্মোৎসব—তার আবার শতবার্ষিকী? সাধারণ বুদ্ধিতে বন্ধ্যার পুত্র-সম্ভবের ন্যায়, জন্ম-মরণ-বিহীন ভগবানের জন্ম যখন অসম্ভব, তখন জন্মোৎসব বা শতবার্ষিকী যেন কেমন-কেমন বোধ হয়। মানবের চিন্তাধারা যতদূর প্রচারিত হউক না কেন, অঘটনঘটনকারিণী মহামায়ার গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং মহামায়ার প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হয়। কারণ, মহাপ্রলয়ে যিনি আপনারই রূপান্তর বহুবর্ণবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় আধার-বরণে বিলীন করিয়া অব্যক্ত-ভাব ধারণ করেন, আবার ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে প্রকট করা বা আপনিই জীবজগৎরূপে রচিত হওয়া যাঁহার পক্ষে সম্ভবপর, তখন আত্মরতি বা জীবকল্যাণ উদ্দেশ্যে, অথবা নিজ সৃষ্টির পরিদর্শন মানসে তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহরূপে (যেমন একই জল এককালে তরল ও ঘন) আবির্ভাব কদাচ অসম্ভব নহে।

ভগবান যদি কৃপা করিয়া আত্মপরিচয় দান না করেন, অজ্ঞ মানব কিরূপে তাঁহার মহিমা অবধারণে সমর্থ হইবে? তাই প্রভু কহেন, অবতার পুরুষ ঈশ্বরের অংশ বা প্রতিনিধিস্বরূপ (যেন নায়েব) বিশেষ বিভূতি নিয়ে ধর্ম সংস্থাপন করতে আসেন। কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানকে অর্থাৎ তিনি যখন স্বয়ং আসেন, তখন অতি গোপনে, কোন ঐশ্বর্য (বিভূতি) থাকে না, কেবল মাধুর্য। এই হেতু এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে শুভাগমনে ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। কেবল মাধুর্য। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক ইহাই অবধারণ করুন।

বহুলোকহিত বরং বহুজনসুখায় প্রভুর পুণ্য আবির্ভাব অনুধ্যানে ভক্ত কবি গিরিশচন্দ্র গাহিয়াছেন:

দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে, কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কে রে ওরে দিগম্বর, এসেছে কুটীরঘরে॥

ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে ॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী, সাধ ধরি হৃদিপুরে ॥

ঠাকুরের রূপমাধুরী—রূপ কি? আপাদমস্তক প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুবিন্যাসই রূপ। চিত্তপ্রসাধনকারিণী শ্রী যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং জগৎকে যিনি সুন্দর করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীমান্ ও রূপবান্ হইবেন না, ইহা কল্পনার অগোচর। তাই বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন :

বাঁকা শ্যাম-রূপে নয়ন ভুলিল,
মন ভুলালে বাঁশী।

ভাগ্যক্রমে বাবুরাম ভায়ার (স্বামী প্রেমানন্দ) সঙ্গে যাইয়া দেখি—নারদেবের আকৃতি মধ্যবিধ, তবে বাহুদ্বয় যেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। করতল-দুটি পরস্পর সংলগ্ন, যেন কোন অদৃশ্য দেবতার উপাসনারত। বক্ষঃস্থল বিশাল ও আরক্তিম, বর্ণ গৌর হরিদ্রা ও অলক্ত-মিশ্রিত; তবে রৌদ্রতাপে তাপিতের ন্যায় ঈষৎ মলিনাভ, ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে, কপালে যে সিন্দুর-টিপটি, উহারই সমবর্ণ। চক্ষু দুটি টানা হইলেও হরিকথা শুনিতে-শুনিতে শিবনেত্র। চমক ভাঙিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ-গোবিন্দ বলিয়া নেত্র মার্জন করিতেছেন। মধ্যবিধভাবে কেশশ্মশ্রুবিশিষ্ট হইলেও পারিপাট্যবিহীন, পরিধানে লালপেড়ে ধুতি, কোঁচা না করিয়া এলোথেলোভাবে স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত। উদরে প্লীহা-চিকিৎসার দাগ যেন কবচের মতন অঙ্গশোভায় উৎকর্ষ করিয়াছে। গঠন এককালে দৃঢ় হইলেও কঠোর তপস্যায় এখন যেন শিথিল ও কোমল; চন্দ্রালোকে গৃহাভ্যন্তর যেমন মৃদু উজ্জ্বল হয়, রূপ-জ্যোতিতে ঘরটি

সেইমত হইয়াছে। মুখকমল প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ। ভক্তসঙ্গে অমনিভাবে একাসনে বসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কথাগুলি মিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। ফুলের তোড়া বা ধূপ জ্বালানো না থাকিলেও অনুভব করিলাম, অঙ্গসৌরভে ঘরটি সুবাসিত, অনেকটা পদ্মগন্ধের মত। দেখিবামাত্রই যেন কতকালের আপনার বলিয়া প্রেরণায় মাথাটি আপনা হতেই শ্রীপদে লুটিয়ে পড়িল : প্রভুও আমাকে তাঁহার আপনার জানিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "এসেছ, বোসো।" ধ্যানমঙ্গল সে-রূপ চিত্রপটে ফুটে নাই, তবে আশ্রিত অন্তরে পরিস্ফুট।

পুরানো হইয়াও যিনি নিত্যই নতুন, তাঁর কার্যকলাপ সবই নূতন। কে কোথায় দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, ঐশ্বর্য (বিভূতি) কিঙ্করের মত অনুগমন করিলেও সযতনে উপেক্ষা! মাধুর্যে আত্মবিস্মৃত বালক নিরক্ষর হইয়াও সমগ্র অক্ষরের (শাস্ত্রের) সার্থকতা-প্রতিপাদক। অভিমাননাশ-বাসনায় সাধারণের শৌচস্থান মার্জন। ঐকান্তিক অনুরাগে মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর দর্শন। বিশ্ববিমোহিনী মায়া বিজয়ে কামিনীকাঞ্চন বলিয়া তাহার নূতন নামকরণ। ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় নিদ্রিতাবস্থায়ও মুদ্রাস্পর্শনে অঙ্গবৈকল্য। চতুরাশ্রমের মর্যাদা রক্ষণে দারপরিগ্রহ করিয়াও পত্নীকে এবং সমগ্র নারীজাতিকে ভগবতীর মূর্তি-জ্ঞানে ভক্তি-পূজা। গুরূপদিষ্ট সাধনপ্রণালীতে অল্পকালমধ্যেই শিবত্বলাভ। সন্ন্যাসগ্রহণে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মে এমন বিলীন যে, জীবকল্যাণ জন্য ষষ্টি প্রকারে গুরু বাহ্যাবস্থায় আগমন, এ জন্য ন্যাংটা, বিস্মিত হইয়া নাম দেন দৈবীমায়া। সনাতন-ধর্মের বিবিধভাব এবং তদ্‌বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানে সচ্চিদানন্দকে অশেষবিধভাবে উপভোগপূর্বক সাঙ্গ সকল ধর্মকে সম্মিলিত করিয়া "যত মত, তত পথ" এই অভিনব সত্যপ্রচারে বিভিন্ন ধর্মভাব-সমন্বিত জগতে শান্তি আনয়ন। সর্বেশ্বর হইয়াও জীবদায়ে দায়ী—প্রভু দীনভাবে নিত্য কত না ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য।

যিনি এমন, সেই প্রভু যে আর একটি এমন অভিনব কল্যাণকর

ভাব প্রকাশ করিবেন, যদাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান্ মানব সর্বভূতে ভগবান দর্শনে কৃতার্থ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

রামকৃষ্ণ মিশন—তাই বুঝি প্রভু একদিন অপরাহ্নে দিব্যভাবে আপন মনে কহিতেছেন—(কাছে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ ও আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না), জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-পূজন। দুঃশালা, জীবে দয়া, এত অহঙ্কার ? সৃষ্ট জীব তুই, তোরে কে দয়া করে, তার ঠিক নেই, তুই আবার জীবে দয়া করবি ? নিস্তব্ধ। পরে না না, জীবের সেবা, ক্ষণপরে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, তবে ত হবে। ধীমান নরেন্দ্রনাথ প্রভুর ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া আমাকে কহেন, "ভাগ্যে ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছিলেন, তাই আজ নূতন আলোক পেলাম। মনে রাখ, যদি বাঁচি, আর প্রভু কৃপা করেন - এই মহাবাক্যটি কার্যে পরিণত করতে পারলে ধন্য হব।" প্রতীচ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই মহাবাক্য অবলম্বনে প্রভুর শ্রীপদে আত্ম-বলিদাতা শ্রীমান শরৎচন্দ্রের (সারদানন্দের) ভারসহ শিরে এই কল্যাণকর রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন, এবং শরৎচন্দ্রও উহা সানন্দে আজীবন বহন করিয়াছেন। কিন্তু হায়! একের অভাবে আমরা ভাগ্যদোষে আদর্শচ্যুত হইয়া সেবার স্থলে দয়ার ভাবে ভাবিত হইয়াছি।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।'

এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটীরে। প্রভুর দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী অমানুষিক তপস্যা—সাধন—সিদ্ধি—মহাশক্তি ও মহাভাবের অরুণোদয় সুরধুনী ভাগীরথীর বিমলতটে—বিশাল পঞ্চবটী ও নিভৃত বিল্বমূলে। পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরের উত্তরপার্শ্বে সরকারী বারুদখানার (Magazine) মুক্ত-তরবারি করে শিখপ্রহরিগণের ভাগ্যোদয়—লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রভুর বিবিধ সাধনপ্রণালী দর্শনে। ঐ শিখপ্রহরিগণের মুখেই প্রভুর প্রথম প্রচার বড়বাজার মাড়োয়ারী মহল্লে। ক্রমে প্রভুর আকর্ষণে মধুকরের ন্যায়, সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরে নর্মদা, ব্রজমণ্ডল, রাজপুতানা ও বঙ্গের বিবিধ মতাবলম্বী সিদ্ধ সাধু, সাধক ও সুধীগণের আগমন। প্রভুর বাল-সুলভ সরল ভাষায় সুগভীর তত্ত্বকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও প্রণত। ভারতেতর দেশীয় ভক্ত, সাধক এবং বিভিন্ন ভাবের সমবেত নরনারী প্রভুর চরিত্রে সর্বধর্ম ও ভাবসমন্বয়ের সমাধান দর্শনে সবিস্ময়ে চমকিত। প্রেমাবতার প্রভুর বিশ্বপ্রেম—অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। পঞ্চবটীর নিকটে বলীবর্দের পৃষ্ঠাঘাতে 'মেলে রে মেলে রে' রবে বালকের ন্যায় প্রভুর রোদন, তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠে স্ফীত রক্তিমাভ আঘাতের চিহ্ন এবং নবীন তৃণোপরি গুরুভার কাষ্ঠের আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ প্রভুর ভূমিতে পতন—ইহাই বিশ্বপ্রেমের পরাকাষ্ঠা অলৌকিক ত্যাগের মূর্ত-বিকাশ--ধাতুস্পর্শে প্রভুর হস্ত আড়ষ্ট--কুতূহলী ভক্তগণের পরীক্ষায় ইহা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন দেশীয় নরনারীর অবিরত আগমনে প্রভুর 'কে কোথায় আমার আছিস, আয় আয়' আহ্বানের সাড়া এবং ঐ আহ্বানের প্রভাব যে কেমন দূরপ্রসারী, তাহার অবশ্যম্ভাবিতা সহজেই অনুমেয়। প্রভুর ভূভারহারী নামের সার্থকতা এবার

ষোলোকলায় পূর্ণ। এরূপ আর কোন যুগে হয় নাই। মূর্তিমান বিশ্বপ্রেম—ভাবসমাধি-মগ্ন নগ্ন প্রভুর অন্তর্ধানের প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যবধানে বিগত মহাযুদ্ধের সংঘটন। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে দেশ কাল ও আধার বিবেচনায় তাঁহার অপূর্ব বিধান। প্রভুর 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' বাক্যের অদ্ভুত সমাধান। বঙ্গের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অপনয়ন এবং ত্যাগের ভাবে অনুপ্রাণন ও জাগরণ। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্বোধন ও দ্রুততর উন্নয়ন। ইহা অচিন্ত্য। প্রভুর বিধানে বঙ্গের আউস, আমন ও বোরো ধান্যের ক্ষেত্রে পেশোয়ারী আউস ধান উপ্ত হয় নাই। সুদূর ভারতেতর দেশে উপ্তবীজ হইতে ফলোদ্গম আজ প্রত্যক্ষ। ইহা কেহ বুঝে না, জানে না যে, কোথায় কি ভাবে এই নবযুগের অরুণালোকে জগৎ উদ্ভাসিত। মহিমার দীপ্তালোকে আলোকিত হইবার শুভদিন সম্মুখে। প্রভুর সর্ব-ধর্ম সমন্বয় ও কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও রাজযোগের অপূর্ব সমীকরণের প্রভাবে মানবজাতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছে। যখন জগতে এক এক সার্বভৌমিক শান্তি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুর আহ্বানে সকল প্রকার বাদ-বিসম্বাদ-বর্জিত, উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ আপামর জনসাধারণ সমস্বরে প্রভুর 'যত মত তত পথ' বাণীর জয়-ঘোষণায় তৎপর এবং নবযুগের পতাকামূলে সমবেত, তখনই প্রভুর আগমনের মাধ্যন্দিন প্রভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে।

আজ এই মহাশুভ-দিনে ধরাবাসী সকলে প্রভুর আগমনের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হউক, ইহাই আমার আকুল প্রার্থনা।

স্বস্তি। স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

দেবতা গুরু সখা মিত্র বন্ধু—আমাদের সর্বস্ব—যখন আসিয়াছ, তখন যুগান্তরে যেমন পার্থ-সারথি হইয়া এই মরধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তেমনি আমাদের বড় সাধের মনোরথে সমাসীন হইয়া পুনরায় উহাকে পরিচালিত কর দেবতা! তোমার অমৃত-বাণীতে আমরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিব—তোমার আশ্বাস পাইয়া আবার ধর্মক্ষেত্রে—এই ভারতক্ষেত্রে সমবেত হইব। দ্বাপরের শেষ ভাগে পার্থের রথ পরিচালনা করিয়াছিলে—আজ হে ব্রাহ্মণরূপী নরদেবতা, এই সমাজ-রথকেও তুমি অগ্রগামী করিয়া দাও। গো-ব্রাহ্মণের বড় দুর্দিন, বেদবাণী অজ্ঞাত, মহান তুমি অণু হইয়া মর্ত্যের মানবরূপে তোমার চির-আদরের ধর্মকে রক্ষা কর। তাই দয়াময়, আজ বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী তোমায় করজোড়ে আহ্বান করিতেছি।

তুমি যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের শ্রদ্ধার আসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। তুমি না রাখিলে আমাদের কে রাখিবে? তুমি পতিতের সংরক্ষণকারী—দুর্বলের বল। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী নরদেবতা—দয়া করিয়া যদি অবতীর্ণ হইয়াছ, তবে তোমার সাধের ভারতভূমিকে ম্লেচ্ছ-দুর্গতি হইতে মুক্ত কর। যে আবর্জনায় সমাজ-প্রাঙ্গণ অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে, যে মলিন ছায়ায় সমাজগৃহ অস্পৃশ্য—অব্যবহার্য হইয়া রহিয়াছে, আমরা সেই ছায়া অপসারিত করিতে বাঞ্ছা করি। বাঞ্ছাকল্পতরু, পূর্ণ কর আমাদের বাসনা। দেবতা তুমি, শক্তিময় তুমি—এমন শক্তি আমাদের দান কর, যাহাতে সমাজরূপী এই স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠাকে আমরা পরিশুদ্ধ করিতে পারি। আমাদের অঙ্গনে মায়ের চরণ-লেখামালা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সক্ষম হই।

ভাগীরথীতটে তুমি আসিয়াছ, গঙ্গার জলকল্লোল-গানে আমরা সে-কথা শুনিতে পাইয়াছি। মর্মে-মর্মে তোমার আগমনকে অনুভব

করিয়াছি! সর্বৈশ্বর্যময় নিঃস্ব বিরক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া তুমি আসিলেও তোমার চক্ষের ওই প্রসন্ন দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি কে? তুমি নিরক্ষরতার ছলনা করিলেও অনুভব করিয়াছি, তুমিই সেই বেদগোপ্তা। নহিলে কাহার বাক্যামৃতে বেদ ও বেদান্তবাণী এমন করিয়া নিঃসারিত হয়? তুমি চির-শঠ! এবার ছলনা করিলেও তোমার চাতুরি যে ধরিতে পারিয়াছি দেবতা! তুমি রামকৃষ্ণ,—একাধারে তুমিই কি রাম ও কৃষ্ণ নহ?

উঠ, উঠ বাঙালী! এই মাহেন্দ্রক্ষণে একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মী! তোমার শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিয়া--ধূলি-ধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ গ্রামের গ্রাম্য-দেবতাগণ! আর এস—বাঙালী ভাই-ভগ্নী পুত্র-কন্যা পিতা-মাতা বৃদ্ধ-যুবা বালক-বালিকা··আজ সকলে সম্মিলিত হইয়া এই অপূর্ব রামকৃষ্ণরূপী নরদেবতাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি—যুগপূর্বে আমাদের যিনি দুষ্কৃতি মোচন করিয়াছিলেন, ইনিই তিনি!

তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।

*

চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচারে কি উপকার হবে?

*

মানুষের শক্তি দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না…ছাপাছাপি করলে কি হবে? যে লোকশিক্ষা দেবে, তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।

*

কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বুঝায়, তার ঠিক নেই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, ঋতু, মানুষ, জীবজন্তু, জীবজন্তুদের খাবার উপায়, ফসলের জন্য বর্ষা, পালনের জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বুঝাবেন।

কলিকাতার ধর্মজীবনের আধুনিক গতির উপর যাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধেয় পরমহংস কি ভাবে হিন্দু ও নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যোগসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোকদের গৃহে বহু ধর্মালোচনা-বৈঠক বসিয়াছে। সর্বত্রই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এমনভাবে যোগদান করিয়াছেন, যাহাতে চিন্তা ও উপাসনার এবং বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল বৈঠকে পরমহংস ধর্মালোচনা করেন, গান করেন, জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দেন, শেষে উদ্দীপক কীর্তন হয়। উচ্চবংশের হিন্দু মহিলাগণ উপরের বারান্দায় পর্দার পিছনে সমবেত হইয়া পরম আগ্রহে এই আলোচনা শুনেন। দলে দলে পণ্ডিত, শিক্ষিত যুবক, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও যোগী—কেহ কৌতূহলবশতঃ, কেহ সাধুসঙ্গ করিবার জন্য, কেহ বা জ্ঞান সঞ্চয় বা কীর্তনানন্দে যোগ দিবার জন্য সমবেত হন। এই সকল ধর্মালোচনা-বৈঠকে দেখিয়াছি, জাগে এক জীবন্ত ধর্মভাব, দেখিয়াছি সেই ভাবের মহা-তরঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ প্লাবিত হইতেছে। ইহার ফল হয় অলৌকিক। ভাব ও প্রেমের গীতিতরঙ্গে যত মতভেদ ভাসিয়া যায়। পরিণামে এই ধর্মমিশ্রণ ও প্রীতি-সম্মেলনের ফল কি হইবে, কে তাহা বলিতে পারে? প্রভুর ইচ্ছা কি কেহ বলিতে পারে?

…গত ২১শে জুলাই দক্ষিণেশ্বরের মহা-সাধক পরমহংস ভক্তদের লইয়া 'লিলি কটেজে' আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া গিয়াছেন। পরমহংসের বয়স ৪২ বৎসরের বেশী হইবে না, কিন্তু গতবার অপেক্ষা এইবার যেন বেশী বয়সের মতন দেখাইতে লাগিল। তবু যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন তাঁহার সুষমা ফুটিতেছে। শিশুর মত সরল হইলেও তিনি বিবেকী ও বুদ্ধিমান, ভগবৎপ্রেমে টইটম্বুর। সর্ব-শ্রেণীর ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ খুব বেশী। যেখানে তিনি যান, সেখানেই ইহারা তাঁহার সঙ্গ পাইবার জন্য সমবেত হয়।

…সেদিন শ্রদ্ধেয় পরমহংস প্রসিদ্ধ দাতা ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কেন? এই সর্বত্যাগী উদাসী তাঁহাকে দেখিয়া—লৌকিক বা অলৌকিক কি সুবিধা পাইবেন আশা করেন? উদার ও মহৎপ্রাণদের দেখিবার আকাঙ্ক্ষা—পরমহংসের খুবই আছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেখিবার কৌতূহল তাঁহার খুবই বেশী। সর্বদাই তিনি ভক্তদের বড় বড় জিনিস দেখাইতে বলেন, কিন্তু সুযোগ-সুবিধা হইয়া উঠে না।

তিনি কখনও সিংহ দর্শন করিয়া আসেন। বাষ্পশক্তির বলে নদীতে স্টীমার কি করিয়া চলে, তাহা তিনি কখনও দেখিতে ব্যগ্র হন। সহস্র সহস্র ভক্ত গির্জায় উপাসনায় রত রহিয়াছে, ইহা দেখিতে-দেখিতে তিনি অধৈর্য হইয়া পড়েন। পশু ও জড় পদার্থের বিরাট কিছু দেখিলেই তিনি তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। মানুষের বেলাতেও তাহাই। আন্তরিক কৌতূহলবশতঃই দক্ষিণেশ্বরের সাধু কলিকাতায় বিদ্যাসাগরের ভবনে গিয়াছিলেন, কোনওপ্রকার লৌকিক মতলব তাঁহার ছিল না।

সাধু বলিলেন—'তুমি ঋষি। কাদা-ঘোলা জল গিয়ে ছোট নদী এইবার অনন্ত গভীর সাগরে এসে মিশল।' বিদ্যাসাগর উত্তরে বলিলেন—'কিন্তু মহাশয়, এ-কথা মনে রাখতে হয় যে, সাগর খালি নোনা জল; ভাল জলের নদী এতে মিশলে, ভালও নোনা হয়ে যায়, মিষ্টি স্বাদ আর থাকে না।'

জবাব আসিল—'তুমি ত অবিদ্যাসাগর নও, বিদ্যাসাগর।…তাই তুমি আমায় আকর্ষণ করেছ।'

বিদ্যাসাগর বলিলেন—'সাগরে বিপদ আছে, ভয় আছে, এর জলে হাজার হাজার রাক্ষুসে জানোয়ার আছে।'

পরমহংস উত্তর দিলেন—'সাগরের গভীর জলে মুক্তা পাওয়া যায়। সেই মুক্তা খুঁজতেই আমি এসেছি। গুপ্তধনের জন্য সাগর প্রসিদ্ধ। বিদ্যাসাগর, তোমার গুণ অনেক।'

'যং ব্রহ্মা বিষ্ণুর্গিরিশশ্চ দেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যম্।
তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য পরাবতারো,
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ॥'

শুভ শতবার্ষিকী জন্মোৎসবে যে মহাপুরুষের কথা আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি, অদ্য হইতে শতবর্ষ পূর্বে তিনি এ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই শতবর্ষের প্রবাহে জগতের মাঝে যে কত বড় এক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

উনবিংশ শতাব্দীর মহসন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্ত্য জড়বাদের বন্যা সারা ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, খৃষ্টানধর্মের প্রভাব সমগ্র হিন্দু-সমাজের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া সনাতন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা আনয়ন করিয়াছিল, তখনই ধর্মগ্লানি দূর করিয়া সনাতন ধারাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাগমন এ বিশ্বে হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের সুদূর এক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও নিরক্ষর সাধারণ মানুষের বেশে সনাতন অক্ষর-ব্রহ্মের অনুভূতির দ্বারা অসাধারণ মহামানবত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের তর্ক-প্রাবৃট্‌জাল তাঁহাব মধ্যে ছিল না, সামান্য বর্ণ-পরিচয়েই তাঁহার বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, কিন্তু এমনই ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ও দিব্য-অনুভূতি যে, সকল সমস্যার সমাধানই তিনি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আপনার অলৌকিক জীবনে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মানুষের রুচি কখনও এক হইতে পারে না, বৈচিত্র্যের মাঝে বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক, তাই সকলকে রক্ষা করিয়া, সকলের সমান পূজা দিয়া স্বীয় তপস্যাপ্রসূত সহানুভূতিতে তিনি প্রচার করিলেন—'যত মত তত পথ', সকল

ধর্মই সত্য। আচার্য শঙ্করের মতবাদ দিয়া তিনি রামানুজ বা মধ্বকে খণ্ডন করিলেন না, বুদ্ধকে দিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যকে, অথবা হিন্দুধর্মকে দিবা খৃষ্টান বা ইস্‌লামকে ও শাক্তকে দিয়া শৈবকে তিনি নিরস্ত করিলেন না, পরন্তু সকলকেই সত্য বলিয়া—মুক্তির এক-একটি পন্থা বা উপায়স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বৈচিত্র্যের মাঝে তিনি একত্বের মিলন-মন্ত্র বিতরণ করিয়া গেলেন।

আমরা দেখিতে পাই, কী মধুর মিলন-সামঞ্জস্যই না ছিল তাঁহার সাতক-জীবনে। সাধনকালের দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য ও মধুর প্রভৃতি ভাবে সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর মাঝে চিন্ময়ী মা'র জগন্মোহিনী-মূর্তি দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'মা! আমার বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, তুমি যা শিখাইবে আমি তাই শিখিব ইত্যাদি। তারপর শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজায় নিযুক্ত হইয়া, যখন শক্তি-সাধনায় আত্ম-বলিদান দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখনই দৈব-প্রেরিতা মহা-বিদুষী শক্তি-সাধিকা ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ঈশ্বরপ্রেম, মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি ও শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় মহাভাবের লক্ষণসকল দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং পরে আপন ইষ্টদেবতার সহিত ঠাকুরকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে পরম বিশ্বাসী হইলেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের সহিত সকল লক্ষণের সৌসাদৃশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাই সর্বসমক্ষে প্রচার করিলেন···'এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।' সাধিকা ব্রাহ্মণী পূর্ব হইতেই ঈশ্বরেচ্ছার নির্দেশ পাইয়া ও শ্রীঠাকুরের তন্ত্রের সাধন-প্রণালী শিক্ষা করিবার একান্ত বাসনা দেখিয়া, তাঁহাকে তন্ত্র-মার্গে অভিষিক্ত করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনে ইহাই তাঁহার প্রথম গুরুকরণ। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, ঐ ব্রাহ্মণী দ্বাদশবর্ষকালে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া, সর্বপ্রকার সাধনায়

তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রাহ্মণীর সাহায্যে প্রধান প্রধান চৌষট্টিখানি তন্ত্রের প্রত্যেকটি সাধনে সিদ্ধ হইয়া তখন অবধূত বা পরমহংস-পদে বৃত হইয়াছিলেন।

পুনরায় যখন বেদান্তোক্ত অদ্বৈতসাধন অনুষ্ঠান করিবার প্রবলেচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল, তখনই অদ্বৈতবাদী পরমহংস ন্যাংটা তোতাপুরী তাঁহার সাধন-মন্দির পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখনও মা ভবতারিণীর আদরের দুলাল, মা ব্যতীত তিনি কাহাকেও জানেন না। পরমহংস তোতাপুরী, যিনি তিনদিনের বেশী এক স্থানে বাস করিতেন না, তিনি একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ঠাকুরকে অদ্বৈতবেদান্তের উপদেশ প্রদান করিলেন। তখন তাঁহার বাহ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত "বিদ্বৎসন্ন্যাস" সাধিত হইল ও ভুবনমোহিনী মা'র জ্যোতির্ময় রূপ জ্ঞান-খড়্গে শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিগুণ নিরাকার অনন্তের কোলে মিশাইয়া গেল, গভীর নির্বিকল্প সমাধি-সাগরে মগ্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মানন্দ-রসে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

দ্বৈতাদ্বৈত রহস্যভেদ করিয়াও সকল ধর্মের সেই একই সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য সাধনেও তাঁহার মন ছুটিয়া চলিল। খৃষ্ট-ধর্মের সাধনা করিয়া তিনি ভগবান যিশুর দর্শন পাইলেন ও গোবিন্দ রায় নামক সুফীকে আচার্য-পদে বরণ করিয়া ইস্‌লামধর্মের রহস্যভেদে তিনি কৃতকার্য হইলেন। শুধু তাই নয়—

'সত্যবোধতয়া সাঙ্গান্ সর্বধর্মান্ সমাচরন্।
ধর্মমাত্রস্তু সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতম্॥'

প্রত্যেক ধর্মের সাধন করিয়া, সকলের মধ্যে সেই একই সত্যের সন্ধান পাইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রণালী বা সাধন-পদ্ধতি পৃথক হইলেও সকল ধর্ম-মার্গ দ্বারা সেই একই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। তাই সকল সঙ্কীর্ণতা ও অনৈক্যকে তিনি অখণ্ড মিলন-সূত্রে বন্ধন করিতে বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনাইলেন— 'যত মত তত পথ।' তরঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে সাগরের জল হইতে পৃথক হইলেও জ্ঞানীর চক্ষে যেমন "একই জলের বহু তরঙ্গ" বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাঁহার মতে সেইরূপ

খৃষ্টানের যিশু, বৌদ্ধের ভগবান বুদ্ধ, হিন্দুর রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, শাক্তের শক্তি, শৈবের শিব ও বৈষ্ণবের বিষ্ণু একই সচ্চিদানন্দ-সাগরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ মাত্র, অন্য কিছুই নয়। তাঁহারা একই ব্রহ্মাগ্নির বিভিন্ন স্ফুলিঙ্গ, অভিধা বা নাম মাত্র পৃথক, তত্ত্বতঃ একই বস্তু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইজন্য কোনো ধর্মকেই কটাক্ষ করিলেন না, সকলকেই শ্রদ্ধার্ঘ্য ও সমান মর্যাদা প্রদান করিলেন; তাহাতে ফল হইল এই যে, উদারতার প্রবাহে সারা বিশ্বের চিত্ত পরাজিত ও বশীভূত হইতে চলিল।

কী অদ্ভুত ও অলৌকিকই না ছিল তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যাময় জীবন। যে অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া মানুষ পার্থিব ভোগ-সুখের মাঝে আপনাকে বিলাইয়া দেয়, সে অর্থকে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন তুচ্ছ মাটির সহিত তুলনা করিয়া। আমরা দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের বাগানেও তাঁহাকে দেখিয়াছি, কোনো ধাতু-দ্রব্যই তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, স্পর্শমাত্রে অঙ্গুলি সকল বাঁকিয়া যাইত।

তারপর সর্বগুণযুক্তা স্বীয় পত্নীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, নারীমাত্রেই ছিল তাঁহার চক্ষে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। কামজিৎ হইয়া স্ত্রী মাত্রে জগদম্বার মূর্তি দর্শনের ও বিবাহিতা পত্নীকে ভোগ্যা না করিয়া পূজা করিয়া লইবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে পাই আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রেই। শ্রীরামচন্দ্র, গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি অবতারগণ বিবাহ করিয়াছিলেন ও পরে বিবাহিতা পত্নীর মায়া ও আসক্তি-বন্ধন কাটাইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, আচার্য শঙ্কর ও যিশুখৃষ্ট বিবাহ-পাশে বদ্ধ হন নাই। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রে পাই আমরা অতুলনীয় সংযম। স্বীয় পত্নীকে ভোগের পর ত্যাগ করিয়া নয়, কিম্বা সাধন-পথের কণ্টকরূপে দূরে রাখিয়া নয়, কিন্তু স্বীয় পার্শ্বে রাখিয়া বর্ষের পর বর্ষ কত দিবা ও রজনী তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত

করিয়াছেন, বিন্দুমাত্র আসক্তিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কাম-জয়ের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বাস্তবিকই দুর্লভ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—যিনি শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তিনিই ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে আগমন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—'মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আমার ছবি (Photo) দেখিয়ে বলেছিলেন, এই ছবি পরে ঘরে-ঘরে পূজা হবে।' বাস্তবিক, এত অল্পদিনের মধ্যে সে দৈববাণীর যাথার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। দক্ষিণেশ্বরের সে পুণ্য-স্মৃতি—আনন্দ-মেলার কথা এখনও হৃদয়ে জাগরূক আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহার পদতলে বসিয়া আমরা কত খেলা খেলিয়াছি, কত আনন্দ করিয়াছি! তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা ও ভালবাসা আমাদিগকে চির-বশীভূত করিয়াছিল, আমরা সকল ভুলিয়া তাঁহাকেই একমাত্র আপনার জন—পিতা-মাতা সবকিছু বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার মতো সন্তান ও ভক্তদের জন্য যথার্থ দরদ, স্নেহ ও করুণা আর কখনো কাহাতে দেখি নাই। তিনি এতই নিরভিমানী ছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে গুরু, স্বামী অথবা বাবা বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, সর্বদাই 'নাহং-নাহং তুঁহু-তুঁহু মা-মা' বলিয়া অহংবুদ্ধিকে তাঁহার মন হইতে তাড়াইয়া দিতেন। তাঁহার কথা মুখে বলিয়া বা লিখিয়া বাস্তবিকই কিছু ইতি করা যায় না, তিনি ছিলেন অতুলনীয়, অথবা বলা যায়, তাঁহার তুলনা তিনিই মাত্র।

পরিশেষে ইহাই বলিতে হয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়াছিলেন এবার ব্যষ্টির আবরণে পূর্ব-পূর্ব অবতারগণের ভাবসমষ্টির প্রতীক হইয়া সমন্বয়াবতাররূপে। তাই সকল ধর্মকে সমন্বয়-মাল্যে গ্রথিত করিয়া তিনি সনাতন ধর্মের মহিমা আরও উজ্জ্বল করিয়া গেলেন; আর সেই মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, অভিজাত ও পতিত ক্রমশঃ সেই মহান উদারতার দিকে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নির্বৈর শান্তিময় বাণীর পাদপীঠে হিন্দু মুসলমান

খৃষ্টান চণ্ডাল ও মেথর সকলে নির্বিবাদে আশ্রয়াধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য আসেন নাই, বা তাঁহার 'যত মত তত পথ' সার্বভৌমিক বাণী সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে কোনো দল-বিশেষের জন্য তিনি রাখিয়া যান নাই। তিনি আসিয়াছিলেন যেমন বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত ধারা ও উল্লাস লইয়া, সারা বিশ্ববাসীর কল্যাণের মুখ চাহিয়া, তাঁহার আদর্শ-বাণীও হইয়াছে সেইরূপ বিশ্ববরেণ্য। সকলকে সখ্যতা ও একতাসূত্রের মাঝে মঙ্গল ও শাস্তি বিবরণ করিয়া ইহা বহুকাল ধরণীবক্ষে বর্তমান থাকিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বংশানুক্রম
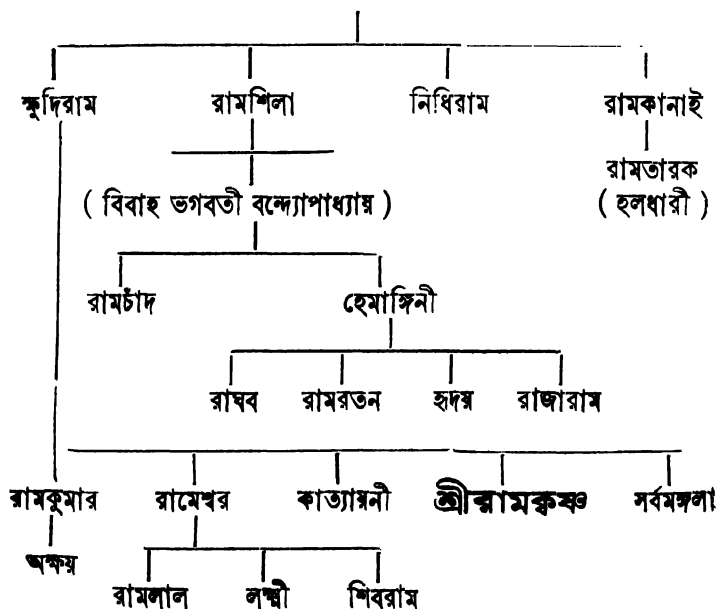
চল, চল আজ দক্ষিণেশ্বরে যাই! আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছ, চল আজ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া জড় ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবন-মনকে সার্থক করি! বড় ভাগ্য না হইলে মর্ত্যলোকে এমন অপূর্ব-রূপ এমন আবির্ভাব দেখা যায় না। চল, চল বাঙালী, আজ তোমার জাতীয় জীবনের নব জাগরণের শুভ মুহূর্তক্ষণে ঐ নরদেবতাকে দেখিয়া ধন্য হইয়া আসি! জানো কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কে?

রামকৃষ্ণকে চিনিতে হইলে হিন্দু-সাধনার গোড়ার কথা একটু বুঝিতে হয়। বিংশতি কোটি হিন্দু-সন্তান জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঈশ্বরভাবের ভাবুক। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণবদনকমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে, উহাই এই ঘোর কলিযুগে হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের আচার-ব্যবহার, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, আদান-প্রদান—সমস্তই কৃষ্ণপ্রচারিত নিবৃত্তিমার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। কত বিপদ-বিপ্লব—কত ঘাত-প্রতিঘাত—কিন্তু হিন্দুজাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-প্রভাবে হিন্দু অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বসুদেবনন্দন, কংস-কেশী-চানুরমর্দন যে অমৃততত্ত্ব প্রচার করেন, তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, হিন্দু জাতির জ্ঞান-ভক্তি ধর্ম-কর্ম ও সমাজকে নূতন তেজ নূতন শক্তি এবং নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্মান্দোলন হইয়াছে, সমস্তই সেই কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-নিঃসৃত জ্ঞান-গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগপ্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না।

পুরাতন যুগের অন্তিমকালে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হন। এই সনাতন সত্যটি শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে কলিযুগ-প্রারম্ভে আমাদের শুনাইয়াছিলেন:

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'

আজ যিনি রামকৃষ্ণরূপী, তিনিই সেই যুগসম্ভাবনা। যাহা আমরা আমাদের সাধনা ও শক্তিবলে পারি না তাহাই তিনি কৃপা করিয়া সিদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কি করিতে আসিয়াছেন? হিন্দুর জীবন্ত ও বহু ইতিহাস তাঁহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে পরিস্ফুট—বেগবন্ত করিতে আসিয়াছিলেন।

কথাটাকে মান্য করিতে ভুলিও না। তাই আমেরিকায় তোমার বেদান্তের ধ্বজা উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে তোমার শাস্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়াছে। তোমার সমাজের ছায়া অনুসরণ করিবার জন্য সেই ফিরিঙ্গি নরনারীগুলির কী প্রাণপণ আকিঞ্চন, তাহা জানো কি? কাহার কৃপায় ইহা হইয়াছে? তোমার গোলামখানার বিদ্যায় নহে। ঐ ব্রাহ্মণের কৃপায়। রামকৃষ্ণরূপী ব্রহ্মণ্য-শক্তিকে যদি আবার বরণ করিতে পার, তবে তোমার বিজয়-নিশান আবার জগৎ জুড়িয়া উড্ডীন হইবে ; তোমার স্বদেশী ও স্বদেশীয়ানা ধন্য হইবে।

আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে ভগবৎ-চরণ-বিনির্গত জাতীয় জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। এসো—এই জন্মোৎসবের দিনে হিন্দুর সেই ঐতিহাসিক পারম্পর্যকে অঙ্গীকার করি। মূল ভ্রষ্ট হইলে বিনাশ অপরিহার্য। এসো, আজ সমগ্র দেশের সহিত– অতীতের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত—স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদ প্রাণ-নৈবেদ্য উৎসর্গ করি। কোটি বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইবে, আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে।

এই জন্মোৎসব-দিনে রামকৃষ্ণকে সেই পারম্পর্যের সূত্র ধরিয়া পর্যবেক্ষণ কর—ধন্য হও

তিনি মানুষ, না অবতার, না দেবতা, না সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন, তাহা এখনও আমি নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাঁহাকে দেখিয়াছি সম্পূর্ণ আপন-ভোলা ত্যাগসিদ্ধ পুরুষ। দেখিয়াছি তিনি পরাবিদ্যার অধিকারী, প্রেমের অবতার। যতই দিন যাইতেছে, যতই আধ্যাত্মিক রাজ্যের সহিত পরিচয় হইতেছে, ততই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের অনন্ত বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুভব করিতেছি। ক্রমেই দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, সাধারণতঃ লোকে ভগবানের যে ভাবে অর্থ করিয়া থাকে, সেই ভাবে ভগবানের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার অসীম মহত্বের ক্ষুণ্ণ করা হইবে।

দেখিয়াছি, তিনি নর ও নারী, পণ্ডিত ও মূর্খ, পুণ্যবান ও পাপী সকলের উপর সমভাবে প্রেম বর্ষণ করিয়াছেন। দেখিয়াছি, অনেকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক নিত্য আগ্রহ; ভগবানকে পাইয়া তাহারা শান্তি লাভ করুক, ইহা তিনি একান্তভাবে চাহিতেন। অকুণ্ঠচিত্তে এই কথা আমি বলিব যে, বর্তমান যুগে তাঁহার মতন জনকল্যাণে আগ্রহশীল আর একটি পুরুষও অবতীর্ণ হন নাই।

নাম-যশকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার উদাহরণ দেখিয়া ও তাঁহার শিক্ষা পাইয়া আমরা গভীরভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভগবৎপ্রেমের নিকট বিষয়-সুখ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। তিনি দিবারাত্র চিদানন্দে রহিতেন। অনধিগম্য দুর্লভ সমাধি তাঁহার নিকট ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তৎসম্বন্ধে তিনি সকলকে উপদেশও দিতেন। সংসারে দুঃখের কথা নর-নারী তাঁহার নিকট আসিয়া নিবেদন করিলে সেই দুঃখ দূর করিতে তিনি ব্যাকুল হইতেন। যাহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট ভগবদ্ভাবে বিভোর এই মানুষটির আচরণ অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনে এইরূপ

ব্যাপার কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখনও হয়ত অনেক গৃহী ভক্ত জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহার অশেষ কৃপা—জন-দুঃখ লাঘব করিবার জন্য তাঁহার ব্যগ্র প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন।

ঠাকুরের নিকট সু ও কু বলিয়া কিছুই ছিল না। তিনি দেখিতেন, প্রতি ঘটে মা বিরাজ করিতেছেন—ভেদ মাত্র প্রকাশে। প্রতি নারীতে তিনি ব্রহ্মময়ী প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই, প্রত্যেক নারীকে তিনি 'মা' বলিয়া ডাকিতেন।

হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম-পদ্ধতিতে নিজে সাধন করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক ধর্মই সত্য। আপনার অনুভূতির সঙ্গে উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার মিল প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ঘোষণা করেন—সত্য এক। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম—এই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম রহিয়াছে মাত্র, এই সত্যের সাধনা হইয়াছে নানা পদ্ধতিতে। আমি দেখিয়াছি, বিভিন্ন ধর্মমতের বহু প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তি আপনাদের আধ্যাত্মিক সংশয় নিরসনের জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেন। তাই তাঁহাকে দেখিয়াই বুদ্ধ, যিশু ও মহম্মদাদি অবতার ও পয়গম্বর যে সত্য, তাহা আমি বিশ্বাস করি এবং তাঁহাদের অশেষ কৃপাও অনুভব করি। ঠাকুর কখনো কাহারও ধর্মভাব ও আদর্শের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, উচ্চ ও নীচ যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিত, তিনি প্রত্যেককে তাহার অধিকারভেদে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন।

বিশ্বের অসীম দুঃখের কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। যাহারা তাঁহার নিকট আসিত, তিনি যে তাহাদের মনোকষ্টেরই লাঘব করিয়াছেন, তাহা নহে, বহুবার তিনি ব্যাপক দুঃখও দূর করিয়াছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তকে উহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে অবস্থান করিতেন। কাজেই

তাঁহার পক্ষে দরিদ্রদের বৈষয়িক দুঃখ দূর করা সর্বদা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে অন্যায় হইবে যে, তিনি তাহাদের কথা ভাবিতেন না। তিনি নিজে যাহা আপন জীবনে অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি যাহা ভাবমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ অনুশীলন করিয়া কার্যে পরিণত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক উচ্চগ্রামে অবস্থান করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাই যাঁহাদিগকে তিনি অতি দ্রুত তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণ করিয়া জনহিতের জন্য আত্মনিয়োগ করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন, তাঁহাদেরই মধ্যে তিনি ভগবৎ-নির্দেশে আপন শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে এই শক্তিপ্রাপ্তদের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ, ইহা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, নিজেরাও অনুভব করিয়াছি। স্বামীজির কার্য বিশ্লেষণ করিলে তাই আমরা দেখিতে পাই যে, এক দিকে তিনি ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব বাণী যেমন প্রচার করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনই অভাবগ্রস্তকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অন্ন ও ঔষধাদি দান করিয়া এমনভাবে সেবা-ধর্মের তিনি প্রচার করিয়াছেন, যাহার ফলে সকলে ধীরে ধীরে ধর্মস্তরে উন্নীত হয়। স্বামীজি ছিলেন ঠাকুরের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা। গভীর ও উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর ভাবমুখে যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, স্বামীজি ছিলেন তাহার ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম অনুভূতির পূর্ণ নির্ণয় করিতে কেহ কখনও সমর্থ হইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ শতবার্ষিকী জন্মতিথির দিনে সমগ্র পৃথিবীর সকল মতাবলম্বী নর-নারীকে এই মহামানবের মহান পবিত্র জীবনের ও উপদেশের আলোচনায় আহ্বান করিতেছি।

জীবনের চরমসত্যের অনুসন্ধানে কঠোর তপস্যায় তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছে এবং এই সত্যলাভের জন্য তিনি জীবনের সর্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থচেষ্টা পরিহারে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই সত্যলাভের জন্য তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বী তৎকাল-প্রচলিত বহু সম্প্রদায়ের নিকট দীক্ষিত হইয়া, তাঁহাদের উপদিষ্ট বহুবিধ সাধনা নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়াছিলেন—এমন কি, মুসলমান খৃষ্টধর্ম সাধনায়ও কুণ্ঠিত হন নাই।

এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি সমগ্র জগতের সমক্ষে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সকল ধর্মেরই চরম উদ্দেশ্য এক সচ্চিদানন্দলাভ। যেমন জলকে কেহ বারি, কেহ পানি, কেহ য়্যাকোয়া, কেহ বা ওয়াটার নামে অভিহিত করিলেও জল বস্তু এক বৈ দুই নহে, তদ্রূপ চরমসত্যকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ সচ্চিদানন্দ, কেহ শিব, কেহ শক্তি, কেহ কৃষ্ণ, কেহ গড্, কেহ খোদা, কেহ আল্লা, অথবা কেহ অন্য নামে অভিহিত করিলেও সেই চরমসত্য এক বৈ দুই নহে।

আরও বলিতেন, যেমন ছাদে উঠিতে হইলে সিঁড়ি, মই, দড়ি অথবা অন্য যে-কোনো বস্তুর সাহায্যে তাহাতে উঠা যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন মতে, বিভিন্ন প্রকারে সাধনপ্রণালী প্রচলিত থাকিলেও যে কেহ ভাবের ঘরে চুরি ছাড়িয়া পরম ব্যাকুলতার সহিত মতবিশেষে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া সাধনা করিলে, চরমে সেই পরম সত্যে উপনীত হইবে।

তাই তিনি দৃঢ়স্বরে বলিয়া গিয়াছেন, তুমি সাকারবাদী হও,

নিরাকারবাদী হও, হিন্দু হও, ব্রাহ্ম হও, খৃষ্টান হও, মুসলমান হও, তুমি যে-কোনো মতাবলম্বী হও, তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি চরম সত্য-লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ মতে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া সাধন-পথে অগ্রসর হও, কেবল এইটুকু মনে রাখিও যে, অপরের মত মিথ্যা, কেবল আমার মতই একমাত্র সত্য, এ বুদ্ধি যেন তোমার কখনও না আসে। নিজ মতে সিদ্ধ হইলে তুমি বুঝিবে, এক সত্যেরই বিভিন্ন দিক আছে, সকল মতই সেই এক সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

তিনি নিজে হিন্দুধর্মে পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন, কিন্তু তিনি যাঁহারা অন্যভাবের ভাবুক, তাঁহাদের মধ্যে ভাল লোকদের সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে মিশিতে এবং তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে কখনও দ্বিধাবোধ করিতেন না।

তিনি স্বয়ং কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী পরমপবিত্র সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি সাধারণ গৃহস্থগণের কথা দূরে থাক,—মাতাল, বেশ্যা প্রভৃতিকেও কখনও ঘৃণা করিতেন না, বরং সকলের ভিতর শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখিয়া তাহাদের অধিকার অনুসারে তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া চরম উন্নতির পথে সহায়তা করিতে চেষ্টা করিতেন।

সকল নর-নারীর ভিতর শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখিয়া তিনি সকলের সেবার জন্য সতত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলিতেন, জগতের একটি জীবের কল্যাণের জন্য, তাহার সেবার জন্য আমায় যদি শত শত বার জন্মগ্রহণ করিয়া শত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। আমি নিজে মুক্ত হইয়া একলা সুখভোগ করিতে চাহি না।

তিনি জগতের তথাকথিত সভ্যতা ও বিদ্যার ধার ধারিতেন না, কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে শত শত বিদ্বান শিক্ষিত ও সভ্য-সমাজভুক্ত নরনারী তাঁহার চরিত্রে ও শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, যতই তাঁহার জীবন-আদর্শের ও শিক্ষার প্রসার হইতেছে, ততই সমগ্র জগতের মহা-মহা মনীষীবৃন্দ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন।

কোনো ধর্মই মিথ্যা নহে, সুতরাং কাহারও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। হিন্দুকে হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান বা মুসলমান হইতে হইবে না, অথবা মুসলমান খৃষ্টানকে নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না। শাক্তকে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবকে শাক্ত মতাবলম্বী করিবার চেষ্টার কোনো প্রয়োজন নাই। সকলেই নিজ নিজ ধর্মনিষ্ঠার সহিত সাধন করুন, অথচ শ্রদ্ধার সহিত অপর ধর্মসকলের আলোচনা করুন, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা।

তিনি বলিতেন, যেমন গৃহস্থের বধূ তাহার শ্বশুর ভাশুর দেবর সকলকেই যত্নের সহিত সেবা করে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাহার অন্যরূপ সম্বন্ধ, তদ্রূপ অপর ধর্মসকলকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ ও উহাদের আলোচনা কর, কিন্তু স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হইয়া দৃঢ়তার সহিত তাহার সাধন কর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইলেও তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তশিষ্যগণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-ভক্তি-সমুজ্জ্বল, ত্যাগপূর্ণ, পরমোদার আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তে জীবন ধন্য হইয়াছে। আজ এই শুভ মুহূর্তে শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমরাও দিন-দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব অলৌকিক আদর্শ চরিত্রের দিকে আরও অগ্রসর হইতে পারি,—বর্তমান অবস্থায় তৃপ্ত না থাকিয়া যেন তাঁহার 'এগিয়ে পড়' এই উপদেশের সার্থকতা জীবনে দেখাইতে পারি।

আর আমরা তাঁহার জীবনানুধ্যানে ও উপদেশানুসারে চলিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দলাভ করিয়াছি ও নিজেদের ধন্যজ্ঞান করিতেছি বলিয়াই এই শুভক্ষণ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীর সকল নর-নারীকেই আহ্বান করিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহার জীবন ও উপদেশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সকলেই নিজ নিজ জীবনকে উন্নত করুন, এবং উহাকে সমগ্র পৃথিবীর নর-নারীর সেবায় নিয়োগ করিয়া ধন্য হউন। দ্বেষ হিংসা সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়া সমগ্র জগতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হউক, সমগ্র জগৎ মধুময় হউক।

'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতিমধুর্মানস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।'

আজ বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, সমুদয় সমুদ্র মধুক্ষরণ করুক, ওষধিসকল আমাদের পক্ষে মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, আমাদের পিতাস্বরূপ স্বর্গলোক মধুময় হউন, আমাদের পক্ষে বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য মধুময় হউক, আমাদের গাভীসমূহ মধুময় হউক! ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!

খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।

*

কারু নিন্দা করো না, পোকাটিরও না।

*

অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

*

শুদ্ধ মনে যা উঠবে, সে তাঁরই বাণী।

*

ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায়, ততই ভাল।

*

আরোপ করলে ভাব বদলে যায়। প্রকৃতি-ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়।

*

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। সর্বদা সদ্‌সৎ বিচার করবে।

*

হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না।···ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হলেই হয়।

*

গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন, তিনিই জানিয়ে দেবেন।

*

তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়—বীরভাব সখীভাব দাসীভাব আর সন্তানভাব।

*

মাঝে-মাঝে একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামগুণকীর্তন করা খুব ভাল।

*

গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

*

একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরে ভক্তি হয়।

*

হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল বলে।

*

পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়।

*

ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁর দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়।...সত্য বলছি, দর্শন হয়।—একথা কারেই বা বলছি, কেই বা বিশ্বাস করে!

*

কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এসব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি, আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।

*

ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে-মাঝে যেতে হয়। মাঝে-মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার।

*

তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে, সাধনা করে, তার সেই রূপই হয়। যেমন ভাব, তেমনই লাভ। ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছ থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায়, তাই পায়।

*

মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানেই তাঁর আবির্ভাব হয়—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এসব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে।

*

বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।...ঈশ্বরে শরণাগত হও, সব পাবে। তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন, তিনি সব ভার ল'বেন। যখন একবার 'হরি' বা একবার 'রাম' নাম উচ্চারণ করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট দক্ষিণেশ্বরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (ক্যাপ্টেন) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুরের অনুরোধে নরেন্দ্র তানপুরা-সংযোগে গান আরম্ভ করিলেন। দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া মধুর কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল,—

'আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইতিমধ্যে আপনাকে ভুলিয়া "প্রেমানন্দে মগন" হইয়াছেন। সমস্ত দেহ স্থির—"চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" নরেন্দ্র গান শেষ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—তখনও সমাধি অবস্থার অন্তরের প্রসন্নতা বাহিরের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট। শ্রীবুদ্ধের ন্যায় ঠাকুরও তখন—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি,
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতিঃ।

আর একবার চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকে যেন সন্ধান করিলেন, এক ঘর লোক, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি কোথাও প্রতিহত হইল না। নরেন্দ্র নাই, তানপুরাটি পড়িয়া আছে। ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—

'আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল।'*

নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সে-দিন যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন,

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে পরমহংসদেবের সম্বন্ধেই সেই কথাগুলি আমাদের মনে উদিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান সামান্য বেতনভোগী কর্মচারীরূপে রানী রাসমণির ঘনবনাকীর্ণ দক্ষিণেশ্বরে দেবীর পূজারী হইয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত জীবন যাপন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার সে দিনের সেই ক্ষীণ দীপরেখা সমগ্র ভারতবর্ষে কি আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে—তাহা অনুভব করিবার দিন আজ আমাদের উপস্থিত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের এই দুর্দিনে আজ তাঁহার বাণী স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যে উদার ধর্মপ্রাণতা তাঁহাকে কোনো ধর্ম কখনও নিন্দা করিতে দেয় নাই, যিনি ধর্মমতকে কখনও ঈশ্বরের অধিক করিয়া দেখেন নাই, যিনি অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—যে কেহই হউক না কেন, আন্তরিক ভক্তি থাকিলে ভগবানকে পাইবেই, সেই সার্বজনীন বিশ্বপ্রেমের পুরোহিতকে ভাল করিয়া চিনিবার ও জানিবার প্রয়োজন স্বধর্মহীন, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে আজিকার মতো আর কোনও দিন হয় নাই। আমরা আগ্রহের সহিত নেপোলিয়নের জীবনচরিত পাঠ করি—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক জগতে এই অতি-মানুষের আবির্ভাব সত্য-সত্যই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অজ্ঞাত ও অখ্যাত আইন-ব্যবসায়ীর পুত্রের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শত সহস্র লোক আনন্দচিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, সমস্ত য়ুরোপ ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রীড়নকের ন্যায় রাজ্য ভাঙা-গড়া চলিতেছে, ইহা পিনাকপাণির প্রলয়-নাচনের ন্যায় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। কিন্তু নিঃসম্বল, নিরক্ষর, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, স্বজনহীন ও সহায়হীন হইয়াও কিরূপে ধীরে ধীরে আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সমগ্র জগৎকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করিয়াছেন, তাহা নেপোলিয়নের জীবন-কাহিনীর অপেক্ষাও শতগুণে আরও শিক্ষাপ্রদ ও বিস্ময়কর। ফরাসী-বিপ্লবের স্রোত নেপোলিয়নকে জোর করিয়া ভাসাইয়া লইয়া সিংহাসনের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে জগতে পরিচিত

করিবার জন্য কোনও বাহিরের অবস্থাই অনুকূল ছিল না, কোনও অদ্ভুত ঘটনাও সংঘটিত হয় নাই। তাই দেখিতে পাই যে, তাঁহার দেহত্যাগের পর আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও সেই আত্মার জ্যোতিঃর স্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া কোথাও দরিদ্র ছাত্রগণের সুশিক্ষার বিধান করিয়া প্রাণে ধর্মের শান্তি আনিয়া দিতেছে, কোথাও বা মাতৃ-পিতৃ-হীন শিশু-সন্তানগুলিকে জননীর ন্যায় লালনপালন করিতেছে, কোথাও বা শুদ্ধচিত্ত যুবগণকে আত্মোৎসর্গে নিয়োজিত করিয়া কাঙালের দুঃখ দূর করিয়া দেশে নূতন প্রাণের সৃষ্টি করিতেছে। ঠাকুরের সম্বন্ধে আজ বারংবার সেই কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে—

'আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল।'

ধর্মজীবনে মহীয়ান ঋষিগণের জীবন-কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কর্মজীবনে যাঁহারা মহান, বাহিরে তাঁহাদের জীবনের একটা প্রকাশ আছে, যাহার দ্বারা তাঁহাদের মহত্ব উপলব্ধি করা অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, এব্রাহাম লিনকন্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কর্মবীরগণের জীবন কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং জগতের ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সকলের সম্মুখে দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু ধর্মজীবনে যাঁহারা গরীয়ান, সেই মহাপুরুষগণের জীবন তাঁহাদের অন্তরের মধ্যেই প্রকাশিত এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে যে ভাগ্যবান ভক্তগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরের দীপ্তিতেই সেই জ্যোতিঃর উৎসের সম্যক পরিস্ফুরণ। অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শান্তি ও ভাস্বরতায় তাঁহাদের উপলব্ধি। সুতরাং জীবনচরিত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা আজ পর্যন্ত কোনও ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষের কেহই লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের কথাগুলি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে গেলে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই হয় না, নিজের জীবনে তাহাদের উপলব্ধি করিতে হয়। কর্মজীবনের সত্য অনুভূতিগুলি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু কর্ম-জীবনের অনুভূত সত্য কেবলমাত্র জীবন দিয়াই উপলব্ধি করিতে হয়,

নতুবা তাহারা প্রাণহীন অক্ষরসমষ্টিই থাকিয়া যায়, জ্বলন্ত সত্যরূপে কখনও প্রতিভাত হয় না। এই দুঃখেই একদিন সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে দেহত্যাগের ঠিক পাঁচ মাস পূর্বে কঠিন রোগভোগের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—'কারেই বা বলবো, কেই বা বুঝবে।' ঐহিক জীবনের সায়াহ্নে সেই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এই সহজ কথাগুলির মধ্যে কী গভীর আত্মবেদনা ও জগতের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ নিহিত ছিল, তাহা কোনো ভাষাই সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। সেইদিন নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি তাঁহার প্রাণকল্প শিষ্যগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তথাপি এই করুণ আক্ষেপ প্রকাশ।

কিন্তু যে ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ সেই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট তিনি নিজের অনুভূতিগুলি যেভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই বিবৃতি অনুধাবন করিলে বিস্ময় ও আনন্দরসে মন আপ্লুত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা ও তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তি ও উজ্জ্বলতার উৎস তাঁহার জগজ্জননীর দর্শন ও সেই জগন্মাতার বাণী শ্রবণ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল দেহত্যাগের প্রায় চারি মাস পূর্বে একদিন কাশীপুরের বাগানে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন, নরেন্দ্র পদসেবা করিতেছেন, মণি পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। হঠাৎ ঠাকুর মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন। স্থিরনেত্রে পাখাটির দিকে তাকাইয়া আছেন, যেন কিছু বলিবেন; ভক্তরা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ঠাকুর কি বলেন। তিনি বলিলেন,—

'এই পাখা যেমন দেখছি সামনে, প্রত্যক্ষ ঠিক অমনি আমি ঈশ্বরকে দেখছি!'

আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন,—

'কথা কয়েছে—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে।'

এরূপ বিস্ময়কর সত্য প্রত্যক্ষ এরূপ দৃঢ়ভাবে আর একবার এই ভারতের কোনো তপোবনে মেঘমন্দ্রস্বরে কত সহস্র বৎসর পূর্বে ঘোষিত হইয়াছিল,—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'

জগতের আর কোথাও কোনও মহাপুরুষ এই অমৃতময় বাণী এত সুস্পষ্ট ও হৃদয়স্পর্শীরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। উপনিষদকার যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'

এবং ইংরাজপণ্ডিত যাঁহাকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পাইতে যাইয়া তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) বলিয়া হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত কথা কহিবার সৌভাগ্য জগতে আজ পর্যন্ত অধিক-সংখ্যক মহাপুরুষের হয় নাই। সেই কথাই একদিন শ্রীভগবান অর্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,—

'নাহং বেদৈর্ন তপসা
ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং
দৃষ্টবানসি মাং যথা॥'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত শক্তি ও জ্ঞানের উৎস এই ভগবদ্দর্শনের পর হইতে আরম্ভ। এই ঈশ্বরদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং তাঁহার সমস্ত বাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অমোঘ ও অমৃতময়ী বাণী—

'এই পাখা যেমন দেখছি সামনে, প্রত্যক্ষ ঠিক অমনি আমি ঈশ্বরকে দেখছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতে গেলে সর্বাগ্রে রানী রাসমণির সেজো জামাতা মথুরবাবুর কথাই আমাদের মনে পড়ে। ইনিই ঠাকুরের প্রথম ভক্ত ও সেবক। যখন দক্ষিণেশ্বর নরেন্দ্র রাখাল ভবনাথ প্রভৃতি কাহাকেও চিনিত না, সেই সময় এই ভক্তচূড়ামণি স্বীয় অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি-প্রভাবে তাঁহার বেতনভোগী পুরোহিতের

বাহিরের দীনতা ভেদ করিয়া তাঁহার মহান আত্মার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের অগ্রে ইঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরের সহিত তাঁহার কি বিচিত্র সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলিবার পূর্বে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বের দুই-একটি ঘটনা আমরা ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করিব।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফাল্গুন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার কামারপুকুর নামে একটি গণ্ডগ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কুলদেবতা রঘুবীরের পূজার জন্য ফুল তুলিতে যত উৎসাহ দেখা যাইত, পড়াশুনায় তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না। ঠাকুর বলিতেন, বাল্যকালে শুভঙ্করী তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিত, কিন্তু পাঠশালার পড়াশুনার ভিতর কোন্ বিষয় যে তাঁহার ধাঁধাঁ লাগিত না, তাহা বলা বড় কঠিন। ইংরাজী শিখেন নাই, বাংলা সাহিত্যও জানিতেন না, অঙ্ক দেখিলে ভয় পাইতেন। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। মহাপ্রভু শাস্ত্রাম্বুধি পার হইয়া পণ্ডিতের চূড়ামণি বলিয়া জগতে পরিগণিত হইয়াছিলেন, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের দর্প তাঁহার নিজ অস্ত্র অধীত শাস্ত্রবিদ্যার দ্বারাই চূর্ণ করিয়াছিলেন, ন্যায়ের টীকা লিখিয়া মহামহিম পণ্ডিতাগ্রগণ্যকে ভীত ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরমহংসদেব প্রায়ই বলিতেন, 'আমি মুখ্যু', কখনও কখনও কৌতুক করিয়া শাস্ত্রাধ্যায়ী বিদ্বান্ শিষ্যমণ্ডলীকে বলিতেন, 'আমি মূর্খোত্তম'। কিন্তু উপনিষদের মৈত্রেয়ী যেমন শাস্ত্রজ্ঞান পরিহার করিয়াও একটি সরল কষ্টিপাথরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অসার বস্তু ত্যাগ করিয়া অমৃতকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরমহংসদেবও তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে 'অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্' উপলব্ধি করিয়া, শাস্ত্রের অমীমাংসিত, বহু জল্পনা-কল্পনা-ধূমায়িত, বক্র ও দীর্ঘ পথ ত্যাগ করিয়া জীবনের প্রভাতেই সহজ ও সরল ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়স যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় তিনি কলিকাতায় আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার তাঁহার পূর্বে

কলিকাতায় আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন। ঠাকুর কলিকাতায় ঝামাপুকুরে থাকিয়া দেবসেবা করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। এদিকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণি কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামকুমার এই মন্দিরের প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এদিকে কলিকাতার মরুভূমির মধ্যে ঠাকুর কোথাও প্রাণ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী জননীকে তখনও খুঁজিয়া পান নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসার কয়েকদিন পর হইতেই ঠাকুরকেও সেখানে আসিয়া বাস করিতে হইল। পুরোহিত রামকুমার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই ঠাকুর, মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশ-বিন্যাস করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার ও তৎপরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রানী রাসমণি মধ্যে-মধ্যে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। ভারতবর্ষে ধর্মজীবনের ইতিহাসে নারীর স্থান যত উচ্চে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের এই 'অশিক্ষিতা' মাতৃজাতি লোকচক্ষুর অন্তরালে ধর্মপ্রাণতার স্তন্যরস দিয়া কত মহাপুরুষের ধর্মজীবন গঠন ও পরিপোষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আমাদের দেশে আজিও অজ্ঞাত। রানী রাসমণি মন্দির স্থাপনের পর মাত্র ৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। রানী রাসমণি তখন কয়েকদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তিনি শুদ্ধাচারে আসনে উপবেশন করিয়া দেবীর চিন্তা করিতে-করিতে ঠাকুরকে শ্যামা-বিষয়ক গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনেকেই তখন চারিদিকে উপস্থিত। ঠাকুর গান গাহিতে-গাহিতে

রানীর মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাঁহাকে মৃদু আঘাত করিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর দেখিলেন, রানী ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মন বিক্ষিপ্ত, পার্থিব বস্তুর চিন্তায় নিরত। ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রভুস্থানীয়া সর্বজনমান্যা রানী রাসমণিকে সকলের সম্মুখেই আঘাত ও তিরস্কার করিলেন। উপস্থিত সকলেই যুবক পুরোহিতের ধৃষ্টতা দেখিয়া যুগপৎ বিরক্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী তিরস্কৃতা হইয়া কিশোরী বালিকার ন্যায় লজ্জিতা হইলেন, স্থির ও নম্রভাবে সেই আঘাত ও তিরস্কার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন এবং বুঝিলেন, জননী ভবতারিণীই ঠাকুরের মুখ দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কত বিশাল হৃদয় হইলে তবে নিজ বেতনভোগী পুরোহিতের নিকট হইতে এই তাচ্ছিল্য ও সর্বজনসমক্ষে অপমান অবিকৃতচিত্তে সহ্য করা যায়? যেমন পুরোহিত তেমনই তাঁহার নিয়োগকারিণী রানী রাসমণি! পূজারী ও মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার ভিতর এরূপ মধুর সম্বন্ধ বাংলাদেশের আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

এদিকে মন্দিরময় মহা-কোলাহল সমুত্থিত হইল। কর্মচারিবৃন্দ প্রভুভক্তিপ্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা করিয়া তুলিল। কিন্তু যিনি এই কোলাহলের সৃষ্টিকর্তা, সেই ঠাকুরের প্রশান্ত মূর্তি—অধরে মৃদু-মৃদু হাসি। কত লোক তো কতবার বিষয়চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু তিনি 'যাও মন্দির দেখ গে, এখানে বসে থেকে কি হবে' ইহার অধিক আর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু রানী রাসমণির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অন্যরূপ ছিল, সংসারচিন্তানিমগ্না এই মহীয়সী রমণীকে জাগ্রত করিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি ভাব হইতে তিনি সর্বজনসমাদৃতা বর্ষীয়সী এই রমণীর অঙ্গে আঘাত ও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বহু বর্ষ পরের একটি কথা হইতে উপলব্ধি করা যায়। সেদিন তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তাঁহার চিকিৎসার জন্য তখন উপস্থিত। কথায়-কথায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—সাধুসঙ্গ

সর্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা করতে হবে।

বৈদ্য তিন প্রকার: উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেয়ো হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য – রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়, মিষ্টি কথাতে বলে, 'ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে, লক্ষ্মীটি, খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও,' সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনোমতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

বৈদ্যের মতো আচার্য তিন প্রকার। যিনি ধর্ম উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোনো খবর লন না, তিনি অধম আচার্য। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনোমতে শুনছে না দেখে কোনো আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁকে বলি উত্তম আচার্য।

ধর্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে ঠাকুরের এই অভিমত হইতে রানী রাসমণির প্রতি তাঁহার সেই বহু বর্ষ পূর্বের অপূর্ব ব্যবহার থেকে আমরা বিশদভাবে বুঝিতে পারি,—

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।

এ আঘাত ও তিরস্কার কয়জনের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ?

দুর্গাপদ মিত্র

'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥'

সর্বদেশে সর্বকালে সকলধর্মের লোকই ঈশ্বর আছেন একথা বিশ্বাস করে, তবে তিনি কিরূপ, সে সম্বন্ধে নিজ নিজ ধর্মমত অনুযায়ী লোকে যে ধারণা করে, তাহা যেমনি অস্পষ্ট তেমনি ত্রিতাপের এই সংসারে তাহা সাধারণ মানুষকে শান্তিদানে অক্ষম। তাই দেশে দেশে সর্বযুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ ভগবানকে নিজেরই রূপে, স্বভাবে ও গুণে ভাবিতে চায় এবং এইরূপ একজনকে কল্পনা করিয়া লইয়া পূজা করিতে চায়। যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানের উপাসনায় নিযুক্ত করেন অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ-চিন্তায় সমস্ত শক্তি যাঁহাদের নিয়োজিত হয়, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সেই জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, বিরজ, অব্রণ, নিষ্কল ব্রহ্ম বা আত্মাকে অনুভূতিতে বোধ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ জ্ঞানীর সংখ্যা অতিশয় অল্প। উপনিষদ পুরাণাদি শাস্ত্রে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, সনৎকুমার, শুক, ব্যাস, দেবল প্রভৃতি কয়েকটি অতি অল্পসংখ্যক আত্মজ্ঞ পুরুষের নাম আমরা পাই বটে, কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব বলিলেই চলে। সকলেই মায়ামুগ্ধ। প্রত্যক্ষ যাহা দেহ ও মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাহাকেই সত্য মনে করা মানব-ধর্ম। মানুষ নিজের মতো সুখ-দুঃখ-শীতোষ্ণ-অনুভবশীল এক পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ মানুষকেই চায় পূজা করিতে, তাঁহার আশ্রয় লইতে। জলতৃষ্ণা পাইলে মানুষ প্রতি বারে কি সাগরের কাছে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যায়? নদী হ্রদ দীঘি—যেখানে জলের বেশী প্রকাশ, সেইখানেই গমন করে। অবতারে ঈশ্বরের প্রকাশ অধিক, এইজন্য ভক্তের নিকট অবতার অতীব প্রয়োজনীয়।

ঈশ্বরকে যে দেখা যায় না, একথা খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থেও আছে। যীশু বলিতেছেন—None hath seen God, and they have seen the Son. সেই Son-ই অবতার,—ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক।

অবতারকে মানুষের আবশ্যক ত্রিতাপ হইতে পরম শান্তি ও পরম আনন্দলাভের জন্য। কিন্তু অবতার এত সুলভ নহেন যে, যখন তখনই তাঁহাকে মিলিবে। ভাগবতে নানা অবতারের কথা আছে এবং পূর্ণাবতার, খণ্ডাবতার ও অংশাবতার ইত্যাদি অবতারের নানা বিভাগও করা হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাস-কথিত শ্রীকৃষ্ণকথামৃত—যাহা গীতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে অবতারের আগমন-কালেরও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে,—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।'

ধর্ম চিরকালই আছে এবং ধর্ম সনাতন, তবে তাহাতে গ্লানির অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিয়াছিলেন, মায়ার আবরণ; যেমন নির্মল সলিলবিশিষ্ট পুষ্করিণী দীঘিতে পানার আবরণ। তাহাতে সেই জল ঠিকই আছে, উপরে দেখা যাইতেছে না। অবতার আসিয়া সেই পানা অপসারিত করাইয়া ধর্মকে আবার স্পষ্ট উজ্জ্বল ও প্রকাশমান করিয়া দিয়া যান। গত শতাব্দীতে ও বিশেষতঃ বর্তমান শতাব্দীতে সারা পৃথিবীব্যাপী গ্লানি ধীরে-ধীরে বর্ধমান হইয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সে দেশে পিপাসু মানুষ গমন করুক না কেন, কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব ও নগ্নভোগের বাহুল্য ও প্রাবল্যের চিত্র সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। ধর্ম বলিয়া কোনো কিছু যে কোথাও ছিল বা আছে, তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। চিন্ময় প্রেমের ধর্ম এখন পশুবলে বা গোলা-বারুদের সাহায্যে পতিতোদ্ধারধর্মে পর্যবসিত। ইসলামের দান-ধর্ম আতিথ্য-ধর্ম উদারতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। হিন্দুধর্ম পরস্পর বিবদমান বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া আচার-অনুষ্ঠান মাত্রেই পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বৈরাচার স্বেচ্ছাচার হইয়াছিল তাহার আবরণ। সন্ন্যাসী-প্রবর যীশুর সে প্রেমধর্ম এখন কোথায়? এরূপ সময় ভগবানের পুনরাবির্ভাবের অতিশয় উপযুক্তকাল, একথা অন্ততঃ হিন্দু অস্বীকার করিতে

পারিবে না। এমনি ধর্মবিপ্লবের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ; সেই স্মরণীয় আবির্ভাবের দিন—আজ হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বে। এই প্রায়-নিরক্ষর ও সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ যে ঈশ্বর স্বয়ং, একথা তখন ভাবিতে গেলে মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মত্ততার বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারিত। কিন্তু প্রতিপদের বর্ধমান চন্দ্রের ন্যায় যখন দিনে-দিনে তাঁহার নাম ও উদার ধর্মমত পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে ও ভাবুক পণ্ডিত-সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তখন তাঁহাকে আর সামান্য পৌত্তলিক হিন্দু বা inspired idiot বলিয়া চাপিয়া রাখা সম্ভব নয়। Light বা আলোকে আর under a bushel বা ধামাচাপা দিয়া রাখা চলে না। তিনি কে ও কি, তাহা সকলেই এখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভাবিতেছেন। আমরাও আজ তাঁহার শুভ জন্মতিথিতে তাঁহার চরিত্রের বিষয় একটু চিন্তা করিয়া ধন্য হইব, আশা করিতেছি।

সাধারণ পাখি ও টিয়া পাখিতে প্রথমেই ঠোঁটের পার্থক্য। টিয়ার ঠোঁট বাঁকান। এই পল্লীবালকটিও তেমনি সাধারণ বালক হইতে আবাল্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ভুক্ত, ধৃতি ও উৎসাহসমন্বিত এবং অনপেক্ষ। ইঁহার জন্মকথাও কিছু অসাধারণ। ইঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্নে জানিতে পারেন যে, রঘুবীর শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহে জন্মিয়াছেন। এমনি করিয়া বুদ্ধের জননী মায়া দেবী জানিয়াছিলেন যে, ভগবান তথাগত তাঁহার গর্ভে আসিতেছেন। এমনি করিয়া মেরী মাতা জানিয়াছিলেন যে, ভগবান যীশুরূপে তাঁহার গর্ভে উদয় হইবেন। বাল্যে পণ্ডিতগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্রবিচার—সেও অনেকটা যীশু-জীবনের সঙ্গে মিলে। তারপর ১১ বৎসর বয়সে আনুড়ের পথে সমাধি—এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব অবস্থা, যাহা হইতে এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই মহামানবের জন্মাবধি Infinity-র সহিত বা অসীমের সহিত যোগ ছিল। পরিণত বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুমুহুঃ সমাধিস্থ হইতেন। তাঁহার মন শুষ্ক দেশলাইয়ের মতো সর্বদাই উদ্দীপনোন্মুখ ছিল, বাহির হইতে সামান্য একটু ঘা পাইলেই তাহা

জ্বলিয়া উঠিত অর্থাৎ সেই পরমব্রহ্মে ডুবিয়া যাইত। এ যেন পাঁড়-মাতালের বাহিরে 'ঠিক আছি' এই অভিনয়। বোধ হয় ঠাকুর চেষ্টা করিয়াই যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পতিতোদ্ধারকল্পে আসিয়াছেন, তাহা কিছুদিন চালাইবার জন্য অতি যত্নে, অতি চেষ্টায় নিজের মনকে এই মায়ার জগতে নামাইয়া রাখিতেন। এই যে বাইবেলোক্ত in the world but not of the word অবস্থা, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৈবী স্বভাবের অপর নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে অবতার -- তাহা প্রথমে প্রচার করেন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ঠাকুর তাহাতে সামান্য একটু-আধটু প্রতিবাদ করিতেন বটে, কিন্তু নরেন, মাষ্টার, রাম প্রভৃতি সকলকে গিরিশ ঘোষের কথা শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তাঁহাদের এ বিষয়ে নিজ নিজ মত কি? এবং যদি কেহ বা তাঁহাকে অবতার বলিতেন, তবে ওজন জিজ্ঞাসা করিতেন, অংশ না পূর্ণ? অবতার যে কি, তাহাই যাঁহাদের তখনও সম্যক্ বোধ ছিল না, তাঁহার ওজন সম্বন্ধে তাঁহারা আর কি বলিবেন, চুপ করিয়া থাকিতেন। ঠাকুর কখনো কখনো নিজেই তাহাদের অবগতির জন্য নিজে কে, তাহা বলিতেন। বলিতেন যে, তিনি পূর্ণাবতার, সত্যের ঐশ্বর্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে গোপনে আসিয়াছেন, যেমন জমিদার ছদ্মবেশে তালুক দেখিতে আসেন। এখন আর সে গোপনীয়তা নাই। তৎকালে তাঁহার অন্তরঙ্গগণ কেবল তাঁহার মাধুর্য মাত্র আস্বাদন করিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ই অতি সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে সমস্ত জগতের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত প্রচারিত—প্রসারিত। তাঁহার ঐশ্বর্য-সমন্বিত মাধুর্য পণ্ডিত মোক্ষমূলারকে আকৃষ্ট করে, তাঁহারই ঐশ্বর্য রোঁমা রোঁলাকে আকর্ষণ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জাতির নিকট তিনি এখন একজন সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যক্তিরূপে উদ্ভাসিত, অস্পষ্ট নাম বা সংজ্ঞারূপে নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জগতে এখন যে সকল problem বা সমস্যা অতিশয় জটিল, কঠিন ও অতি সত্বর সমাধানযোগ্য, তাহার মধ্যে

প্রধান হইতেছে ধর্ম-সমস্যা। স্বার্থেরই জন্য হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ, ফরাসী-জার্মানে বিরোধ, ইতালী ও হাবসীতে লড়াই। ধর্ম নাই, কোথাও ধর্ম নাই ;—সকলেই সেই অমৃতের পুত্র, এই বৈদিক ঘোষণা এখন আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত। সেকথা কেহ স্মরণ করে না, কেহ বিশ্বাস করে না। ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বলকে পীড়ন, পরের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এখন যুগধর্ম (?)। তাই এই যুগে ভারতবর্ষ সারা জগতে অমৃত বণ্টন করিতে দায়িত্ব লইবে, রামকৃষ্ণ দিন থাকিতে সমন্বয়ধর্ম এই ধর্ম-সমস্যার যুগে উপযুক্ত জানিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতায় দর্শন করিয়াছেন যে, ঠিক ঠিক হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানে ধর্মগত কোনো প্রভেদ নাই—স্বধর্ম আচরণে সকলেই সে অমৃতত্ব ও সচ্চিদানন্দ লাভের অধিকারী। যিনি হিন্দুর ভগবান, তিনিই মুসলমানের ও খ্রীষ্টানের ভগবান। "এক রাম তাঁর হাজার নাম।" এখন জাতিতে-জাতিতে আচারগত অনুষ্ঠানগত বৈষম্য আছে বটে ও সর্বকালেই থাকিবে কিন্তু ধর্মগত বৈষম্য বিরোধ কোথাও নাই। পরমহংসদেব মুসলমানের মসজিদে নেমাজ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার নেমাজ দেখিয়া তাহাদের ধর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান সাধনের সময় তিনি পাদ্রীদের বক্তৃতা ভাবে শ্রবণ করিতেন, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেন ; একবার তিনি গির্জাতেও গিয়েছিলেন এবং ভাবে দেখিতেন যে, ভারতবর্ষীয়গণ ব্যতীত তাঁহার অনেক ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় ভক্তও সমগ্র পৃথিবীতে ছড়ান রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহান্ত হইলে প্রথমে যে বীরভক্তকে তিনি পৃথিবীতে অমৃতবাণী বিতরণ করিতে পাঠাইলেন—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি যে বেদান্ত প্রচার করিলেন য়ুরোপে আমেরিকায়—সেই অমৃতবাণী—যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়—সবই হরেঃ শরীরম্। সেই অমৃত বণ্টন উপলক্ষে বিবেকানন্দ জগৎকে শুনাইলেন—সে অমৃতের খনি কোথায়—কে সেই গাভী, যাঁহার দুগ্ধামৃত অর্জুনরূপী বিবেকানন্দ জগতে বিতরণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"Time

was ripe for one to be born, who in one body would have the brilliant intellect of Sankara and the wonder fully expansive infinite heart of Chaitanya; one who would see in every sect, the same spirit working, the same God; one who would see God in everything, one whose heart would weep for the poor, for the weak, for the outcast, for the downtrodden, for every one in this world, inside India or outside India: and at the same time whose grand brilliant intellcet, would conceive of such noble thoughts as would harmonise all conflicting sects, not only in India but outside of India, and bring a marvellous harmony, the Universal Religion of head and heart, into existence. Such a man was born. The time was ripe and he came. He was a strange man this Ramkrishna Paramhansa. Sri Ramkrishna is the fulfilment of the Indian Sage—the Sage for the time, one whose teaching at the present time is most beneficial. And mark the Divine Power working behind the man. The son of a poor priest, today he is worshipped literally by thousands in Europe, America and to-morrow he will be worshipped by thousands more"

শত বৎসর পূর্বে এই ত্যাগ-প্রেম-জ্ঞান-কর্ম-দয়ার অবতার শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ ভাগবত-মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ অনন্যসাধারণ ছিল। বুদ্ধ সংসারত্যাগী হন, চৈতন্য সংসার ত্যাগ করেন, শঙ্করাচার্য ও যীশু সন্ন্যাসী ছিলেন সত্য। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে অপূর্ব কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আর কোথাও কেহই দেখান নাই;—তাহা অতুলনীয়, unique। তিনি টাকা অর্থাৎ ঐশ্বর্যকে মাটি বলিয়া ত্যাগ করেন—এমন ত্যাগ করেন যে, শেষে ভাঁড়ে জল খাইতেন—ভাঁড়ে শৌচ করিতেন, তৈজস স্পর্শ করিবার উপায় পর্যন্ত ছিল না;—ভুলিয়া যদি স্পর্শ করিতেন, তবে সিঙ্গি মাছের কাঁটা

বেঁধার যন্ত্রণা পাইতেন। টাকা স্পর্শ করিলে দম বন্ধ হইয়া যাইত। মথুরের বহু সহস্র টাকার তালুক দানের অঙ্গীকার প্রত্যাখ্যান ও লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর দশ হাজার টাকা দানের কথায় মায়ার বন্ধনের ভয়ে অচেতন হইয়া পড়া, তাঁহার আলোকসাধারণ ত্যাগের নিদর্শন। নিজের স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে পূজা, সব যোনিকে মাতৃ-যোনি জ্ঞান, তাঁহার কামিনী বা ভোগ ত্যাগের দ্বিতীয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আজীবন—এমন কি, স্বপ্নেও কখনও তাঁহার কামিনীসঙ্গ ঘটে নাই, ইহা তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন;—এইটাই তাঁহার অমানুষিক শুদ্ধতার প্রমাণ। ভগবতী নাম্নী জানবাজারের বাবুদের এক দাসী—যাহার যৌবনে কিছু-কিছু দোষ হইয়াছিল, একদা তাঁহাকে স্পর্শ করায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব হঠাৎ তড়িতাহত ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্পৃষ্টস্থানে গঙ্গাজল ঢালিয়া বারংবার ধৌত করিয়াছিলেন, তবে যন্ত্রণা গিয়াছিল··এই ত ছিল সে দেহের পবিত্রতা। অথচ সেই দেবদেহ পাপীর ও তাপীর স্পর্শে রোগ-জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল এবং যিশুর মত তিনি সেই দেহ দান করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিলে বলিতে হয় যে, অবতার পুরুষগণ all poor and unselfish; they struggled and gave up their lives for us, poor human beings. They all, each of them, bore vicarious atonement for everyone of us and also for all those that are to come hereafter.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। অতীতের কথা বলিতেন, ভবিষ্যতের কথা বলিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও জানিতেন, বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি···নিজে কি ছিলেন ও কি হইবেন, ভক্তদের নিকট প্রকাশ করিতেন। তিনি যুবক নরেন্দ্রকে প্রথম দর্শনের কিছু পরে বলিয়াছিলেন, 'আমি চৈতন্য'; তিনি শ্রীচৈতন্যের সাঙ্গপাঙ্গদের চিনিতেন—যাঁহাদের মধ্যে বলরাম ও মাষ্টার ছিলেন। তিনি যিশুখৃষ্টের দলের ভক্তদের চিনিতেন, যাঁহাদের মধ্যে ছিলেন শরৎ ও শশী। তিনি জানিতেন যে নরেন্দ্র সপ্তর্ষির কোন একটি ঋষির অবতার। তিনি বলিয়াছেন যে বায়ু-কোণে তিনি আবার অবতীর্ণ

হইবেন। তিনি ভক্তসমক্ষে বারংবার বলিয়াছেন, 'আমি সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।' তিনি বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি, যিশু ও চৈতন্য এক। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় তিনিই নরেন্দ্রের মনের কথা অন্তর্যামীরূপে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের বিচারের দিক দিয়ে কিন্তু নয়।' এই নিত্য আত্মস্থ পুরুষের এই বজ্র-নির্ঘোষে স্বরূপ প্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে এমন এক আঘাত দিয়াছিল যে তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অতঃপর সন্দেহ করিতে কখনও সাহস করেন নাই এবং সেই কথা অবলম্বন করিয়া দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার মনের ভাব পরিস্ফুট। শ্লোক দুইটি এইরূপ,—

'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধুঃ
ভক্ত্যাবৃতজ্ঞানবরবপুঃ সীতয়া যোহি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্বা প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা দূরং প্রকৃতি-সহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥'

ঠাকুরের অবস্থা ছিল বিজ্ঞানীর অবস্থা—ত্রিগুণাতীত ভক্তির অবস্থা। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের জ্ঞান উপদেশে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হয়, কিন্তু তিনিও পুত্রশোকে অজ্ঞান হইয়াছিলেন। সেই জন্য এই বৈপরীত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, যাঁর জ্ঞান থাকে, তাঁর অজ্ঞানও থাকে। জ্ঞানাজ্ঞানের পারে যে যায়, তাহাকেই বিজ্ঞানী বলে। ঠাকুরের এই অবস্থা ছিল। আর তিনি যে নাম-গুণগান করিতেন, ভক্তভাবে তাহা ত্রিগুণাতীত ভক্তি। এ ভক্তি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের অধিকারের বাহিরে থাকিয়া। এসব অবস্থা সিদ্ধের অবস্থা নহে, সিদ্ধের সিদ্ধের অবস্থা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষ নহেন, তাহার উপরে। সেই জন্যই তিনি কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—'এর ভিতর থেকেই যা কিছু।'

যিশু যেমন বলিতেন, 'I and my father are one' তেমনি ঠাকুরের মুখের কথা ছিল 'আমি ও মা এক'। শুধু ইহা কথায় বলেন নাই—কালীপূজার রাত্রে শ্যামপুকুর বাড়িতে যখন ভক্তেরা 'জয়কালী' বলিয়া তাঁহারই পূজা করিলেন, তখন ঠাকুর সেই শ্রীকালীর ভাবে ভাবিত হইয়া হস্তে বরাভয় ধারণ ও জিহ্বা প্রসারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ তখন দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই ত ধরা দেওয়া আবার কি চাই? ১৮৮৫, ৭ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—দেখলাম, (আমার) খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার।

ঠাকুর বলিতেন, ভগবান আসেন, জীবকে প্রেম ভক্তি শিখাইতে—সমস্ত অখণ্ড অব্যয় অনাদি অনন্ত ভগবানে জীবের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাঁহার ধারণা, শান্ত স্বল্পশক্তি মানুষ কিছুই করিতে পারে না। গরুর পা বা মুখ বা শিং বা দেহের খবর চাহে না, বৎস শুধু বাঁট খোঁজে, যেখান হইতে প্রেমদুগ্ধ আসে। অবতার সেই ভগবানের দুগ্ধবাহী বাঁট, যাঁকে পেলে 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই প্রেমদুগ্ধের গড়া তনু ভক্তগণকে পরমানন্দের আস্বাদ দিতে দেহ ধারণ করে এসেছিলেন। তাঁর গুণ ব্যাস, শুক, বাল্মীকি বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র জনের সে প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। যিশু-ভক্ত ও শিষ্য St. John তাঁহার Gospel-এর শেষে লিখিয়াছেন—And there are also many other things which Jesus did, the which if they would be written everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written; সেই জন্য আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এই শুভদিনে শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করিয়া ও সমগ্র বিশ্বের ভক্তের সুখ ও শান্তি কামনা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি—

'স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার-বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বেদান্তের পুনঃপ্রবর্তন করিলেন। নূতন মত নাই—কোনও ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতা নাই—ইঁহারা চাহেন এক সর্ববাদী ধর্ম। ভীতি ও অনুগ্রহ উপেক্ষা করিয়া ইহারা বিশ্বে ধর্মবিরোধের অবসান করিতে চাহেন। প্রত্যেক ধর্ম বলিতেছে, আমার মতই সত্য, আর মাত্র সত্য আমারই অবতার। ভারতের নব-বৈদান্তিক বলিতেছেন—অবতার সকলেই—ঈশা মুশা মহম্মদ বুদ্ধ সকলেই।

সপ্তসিন্ধুর বক্ষ চিরিয়া—যাত্রাকালে জাহাজ যেমন পশ্চাতে রাখিয়া যায় সফেন সতরঙ্গ বারিপথ—বাংলার ঈশ্বরজানিত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই—এই জ্যোতিঃপথ রাখিয়া গেলেন। চঞ্চল মায়াতরঙ্গ এই পথ মুছিয়া দিতে চাহে।

আজ বিশ্বব্যাপী জাগিয়াছে ব্যক্তিতন্ত্র। অন্যায় অবিচার অত্যাচার ও পীড়নের বিষবীজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, চারিদিকে জাগিয়াছে জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ, এক জাতির অন্য জাতিকে ধ্বংস করিবার আয়ুধসজ্জা। কোথায় বৈদান্তিক দল! শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সফল কর। তুলিয়া ধর তাঁহার জয়কেতন। বল—শ্রেণী নাই, ভেদ নাই, তুচ্ছ স্বার্থ অলীক। মাল্য-মুকুট-গৌরবে নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা আর চলিবে না, উঠ বৈদান্তিক! প্রচার কর নব সভ্যতা! সেই প্রচারের ফলে ধনিক-তন্ত্র গলিয়া ভাঙিয়া অদৃশ্য হইয়া যাউক, বিশ্বসাম্রাজ্য-গুলিতে প্রতিষ্ঠিত হোক মহা-সাম্য!

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে আশা করিয়াছিলেন, মার্কিন জাতির উপর, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি রুশিয়ার উপর নির্ভর করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও একবার ভাবমুখে যেন বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিমে একস্থানে, হয়ত বা রুশিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন।

নব-বেদান্ত ও নব রুশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ ও লেনিনের শিরায় রহিয়াছে একই সুপবিত্র তাতার-শোণিত।

বিবেকানন্দ বুর্জোয়াদের ঘৃণা করিতেন, ভালবাসিতেন দরিদ্র-নারায়ণকে। বুর্জোয়ারা অর্থলোভী, সুখবিলাসী, স্বার্থপর এবং বিশ্ব-প্রগতির পরিপন্থী। চাষী-মুচি-মেথরের কর্মশক্তি, তথাকথিত ঐ শিক্ষিত ঘৃণ্য মধ্যপন্থী মানুষগুলির অপেক্ষা অধিক। বহু যুগ ধরিয়া এই দরিদ্র দল নীরবে বিশ্বের বিত্ত উৎপাদন করিয়াছে। আজ ইহারা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়াছে। অর্থের ঐ মূলধন আজ নির্জীব, জাতির জীবন্ত বিত্ত হইল ব্যক্তিগত শ্রম। এই শ্রমে দেহ ও চিত্ত গড়িয়া তোলে।

নব-বেদান্ত গীতার কর্মযোগ প্রচার করিতেছে। আজি হৌক কালি হৌক, সক্ষম শ্রমিক সমাজের পরাঙ্গপুষ্ট মধ্যবিত্তদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। কর্মকুশলযোগী শ্রমিকদের হস্তে বিত্ত গিয়া পড়িবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইহার পূর্বাভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে শ্রীশ্রীজগন্মাতা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনন্তর সুকঠোর সাধনা ও ষোড়শী-পূজা শেষ করিয়া যখন তিনি লোককল্যাণ-ব্রতে আত্মনিয়োগ ও সাধারণে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন হইতে মাত্র সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আজ রামকৃষ্ণ-নাম জগৎপূজ্য। সুদূর সাগরপারে দেশ-দেশান্তরে সে নামের বিজয়-বিষাণ বাজিতেছে। নগণ্য পল্লী দক্ষিণেশ্বর আজ সর্বজন-বিদিত। কিন্তু যে কুহকীর অদ্ভুত অলৌকিক ইন্দ্রজালে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে সে যাদুকর আজ কোথায়? দক্ষিণেশ্বর দেবারাম তখনও যেমন দেখিয়াছি, আজও ত তেমনি দেখিতেছি। সকলই ত প্রায় তেমনি রহিয়াছে। সেই পথঘাট। তখনও যে ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হইত, আজও সেই বিশাল দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু ঢুকিতে গেলেই মনে হয়, উদ্যান যেন শূন্য। কিন্তু কেন? এখনও ত সেই উচ্চচূড় নবরত্ন দেউল আলো করিয়া কপালমালিনী ভবতারিণী বিরাজমানা! সনাতনী শিবরাণী শুভদায়িনী শ্যামা—সিদ্ধকামা! দুর্বল মানব-সন্তানকে কৃপাদানে ধন্য করিবার নিমিত্ত পতিতপাবনীর বরাভয় কর এখনও তেমনিভাবে প্রসারিত। দুর্জনের ত্রাসোৎপাদনের জন্য বামকরযুগলে অসিমুণ্ড বিরাজিত। কিন্তু যাঁহার কাতর ক্রন্দনে অচেতন পাষাণে প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল, তিনি আজ কোথায়? সেই বিষ্ণু-মন্দির—সেই শ্রীবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান! দ্বিভুজ মুরলীধর, পীতাম্বর; কপালে অলকা-তিলকা আঁকা, শিরে শিখীপাখা, গলে বিনোদ বনমালা, কটিবেড়া পীতধড়া; বামে রাধা দিব্যাম্বরা, হসিতাধরা! চাঁদনীর ঘাটের বামে দক্ষিণে উন্নতশির ঐ সেই শিব-মন্দির—অটল হিমাদ্রির ন্যায় দণ্ডায়মান। ঐ সেই দুই নহবৎখানা—যার নীচেকার একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রামণি দেবী গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন;

কিন্তু এ নহবৎ আর তেমন মধুস্বরে বাজে না। সবই ত তেমনি রহিয়াছে! ঐ সেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট, ঐ বাবুদের কুঠী, আর ঐ সেই পঞ্চবটী—প্রসিদ্ধ সিদ্ধস্থান ; ঐ সেই ঝাউতলা, আর ঐ সেই বেলতলা—যেখানে গভীর রাত্রে জপধ্যান চলিত। ঐ হাঁসপুকুর। সেই সব বৃক্ষবল্লী। শাখী-শাখে পাখি ডাকিতেছে, কিন্তু বিহঙ্গকণ্ঠে সে সুমিষ্ট স্বর আর নাই। বাতাস হা-হুতাশ করিয়া ফেরে, সঙ্গে-সঙ্গে তরুলতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে আনন্দ উচ্ছ্বাস আর নাই। যাঁহার পূতপ্রভাবে এই দেবারাম একদিন আনন্দধাম হইয়াছিল, তাঁহার দুঃসহবিরহে সমগ্র স্বভাব যেন শোকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই জাহ্নবী এখনও প্রবাহিতা ; কিন্তু আজ তার মুখে বিলাপগাঁথা ; যাঁহার কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে ভাগীরথী একদিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া কলতান তুলিতেন, যাঁহার অপূর্ব নৃত্যচ্ছন্দে মাতোয়ারা হইয়া ভাবাবেশে তরঙ্গ-ভঙ্গে তালে-তালে নাচিতেন, আজ তাঁর মুখে কেবল বিষাদ-গান—হায় হায় করিয়া কূলে মাথা কুটিতেছেন। সে মনোহর মূর্তি একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে কমনীয় কণ্ঠ যে একবার শুনিয়াছে, সে চিত্তহর নৃত্য-ভঙ্গী যে একবার দেখিয়াছে, সে অহেতুকী প্রীতিরাশি, অধর-বিলাসী হাসি, নয়নের সে অপূর্ব মাধুরী, প্রফুল্লিত, পুলকিত কদম্ব-কানন সদৃশ রোমাঞ্চিত কলেবর একবার যে দৃষ্টিগোচর করিয়াছে, সে আর জীবনে কখনো বিস্মৃত হইবে না। নহিলে—

আমি সাধে কি কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে না হেরে নয়নে
কেমনে প্রাণ বাঁধি॥
বিদায় দিছি পাষাণ-প্রাণে,
চায় কার মুখ পানে,
ফুল্ল ফুলহারে
সাজাইব কারে
পোড়া বিধি হ'ল বাদী॥

ভাবে তোরা মাতুয়ারা
দু'নয়নে বহে ধারা
ঢলে ঢলে ঢলে নাচ কুতূহলে ;
এস গুণনিধি সাধি ॥
চলে গেলে আর এলে না
জীব ত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে যদি দীন হীনে
কর পদে অপরাধী ॥

আজ কত কথাই মনে পড়ে। সেই ভাব-প্রাবল্যে অঙ্গ-বিকার ; ইচ্ছামাত্র অপরের মনে আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চার ; সেই নারী-সুলভ হাবভাবের অনুকরণ ; সেই নৃত্য করিতে করিতে সমাধি ; সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াই পুনঃ নৃত্য ; যাহার যে ভাব, সেই ভাব রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া ; সকলের উন্নতি হইতেছে কি না লক্ষ্য রাখা ; সহজ, সরল দৃষ্টিতে সাধকের মনে প্রতিপাদ্য বিষয় দৃঢ় অঙ্কিত করা ; ভাব-তন্ময়তায় সেই অস্ফুট, আধ আধ, স্খলিত ভাষা ; সেই চটিজুতা পায়ে, লালপাড় কোঁচার খুঁট কাঁধে ঘরে-বারাণ্ডায় ঘুরিয়া বেড়ান ; সর্বোপরি সেই ভালবাসা। সংসারে জনক, জননী, কন্যা, ভগিনী, রমণী সব ভালবাসাই স্বার্থতুষ্ট, মোহপুষ্ট, কিন্তু এ অহেতুকী ভালবাসা বিরল।

কত উপায়েই তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ধর্মপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন। যদি না বুঝিতে পারিয়া কেহ মনমরা হইয়া থাকিত, শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎসাহ দিতেন, ওরে, সাধন-পথে আর একটু অগ্রসর হলেই বুঝ্‌তে পারবি। লেগে থাক, ছাড়িস্‌নি। হলেই হবে। তবে আপনাকে আপনি ফাঁকি দিস্‌নি। একটা গল্প শোন।

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে অনেক খরচ ক'রে একখানি বাগান করেছিল। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে লোক সেখানে হাওয়া খেতে আস্‌ত। গ্রামের ভিতর দিয়ে যারা দূরান্তরে যেত, তারাও দেখে যেত। এমনি হতে হতে ব্রাহ্মণের বাগানের খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র

হয়ে পড়্‌ল। ব্রাহ্মণ সারাদিন প্রায় বাগানেই থাকে। দেশ-বিদেশের পাঁচটা লোকের সঙ্গে আলাপও হয়, আর প্রতিষ্ঠাও বাড়ে। দর্শক বিদায় নিতে চাইলে ব্রাহ্মণ জেদ ক'রে বলে, ও-দিক্‌টা দেখবেন চলুন, ও-ধারে আরও ভাল বিলিতি ফুলের গাছ আছে। একটা গাছে চার রকম রঙ্গের ফুল ফুটেছে—নীল, লাল, শাদা, জরদা—চার রকমের গোলাপ।

চলুন, চলুন মশাই, দেখি! আপনি একজন যাত্নকর!

কি বলেন! তবে যত্ন ক'রে শেখা, ঐ গাছের আর ফুলের সঙ্গে, বল্‌তে গেলে, এক রকম আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি।

এমনি প্রায় প্রত্যহই ঘটে। একদিন ব্রাহ্মণ এসে দেখে, একদিককার ফটক খোলা পেয়ে একটা গরু ঢুকে ব্রাহ্মণের একটা সখের গাছ প্রায় মুড়িয়ে খেয়েছে। ব্রাহ্মণ রেগে অগ্নিশর্মা। হাতে লাঠি ছিল। লাঠির আঘাত কেমন বে-ঠক্করে লেগে গরুটা মরে গেল। ব্রাহ্মণ ভীত হয়ে চারিদিক চাইতে লাগ্‌ল। তাই ত! হিন্দু হয়ে গোহত্যা করলুম! তাই ত! কি হবে! ওতে যে ইহকালে সামাজিক দণ্ড, পরকালে নরক!

ব্রাহ্মণের মন তখন তাকে বোঝালে, তুই কেন গোহত্যা করবি? পণ্ডিতরা বলে শুনিস্‌নি? ইন্দ্রের শক্তিতে হাত কাজ করে। এমনি এক এক দেবতার শক্তিতে এক একটি কর্মেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান্‌। মনের ফাঁকি শুনে ব্রাহ্মণ পাকা করলে যে, গোহত্যা কার্য ইন্দ্রের, আমি করিনি। পাপ আসতেই বললে, কে তুমি?

আমি গোহত্যা-পাপ। তুমি গো-হত্যা করেছ, তোমার দেহ আমি দখল করব।

মূর্খ, তুমি জান না। পণ্ডিতদের কাছে শোন গে, হাত কাজ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে। ইন্দ্র বল না দিলে আমার সাধ্য কি গো-হত্যা করি? যাও, ইন্দ্রকে ধর গে।

পাপ যথাসময়ে স্বর্গে উপস্থিত হল। ইন্দ্র ভাবলেন, এ ত ভারি বিপদ হল দেখছি। খামকা এ কি বিভ্রাট! বললেন, বাপু,

একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে আসি।

সরাসরি বাগানে উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—অবশ্য মানবরূপ হয়ে। বাঃ, এ কার বাগান মশাই, এমন বাগান ত কখনো দেখিনি।

আজ্ঞে বাগানখানি আমার।

চমৎকার মশাই! আপনার রুচি, পছন্দের প্রশংসা করতে হয়।

চলুন না, ও-দিকে আরও ভাল ভাল ফল-ফুলের সব গাছ আছে।

বটে! চলুন, চলুন। এখানে এ কুঞ্জটি তৈরি করলে কে?

আজ্ঞে, ওটি আমারই হাতে তৈরি।

এমন নিখুঁত ক'রে গোলাকার ঐ পুকুরটি?

ও-ও আমি মশাই, অনেক যত্নে করেছি।

বটে, বটে! একি, হেথা গো-হত্যা করলে কে?

এ কাজটি মশায়, ইন্দ্র করেছেন।

ইন্দ্র!

নইলে আর কে! হাত ত ইন্দ্রের শক্তিতে চালিত হয়।

বটে, ভাল কাজের বেলা হাত তোমার দ্বারা চালিত হয়েছে, আর গো-হত্যার বেলা ইন্দ্র! নে তোর গো-হত্যার পাপ, ধর এ ভণ্ডকে।

পাপ তখন ব্রাহ্মণকে ধরল।

একদিন সাধনা করে ঈশ্বর লাভ না হলে ছেড়ে দিতে নেই। যে খানদানী চাষা, সে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টিতেও চাষ করতে ছাড়ে না। বড় মাছ ধরবে—চার কর। চার করেও ছিপ হাতে ক'রে বসে থাকতে হয়। প্রথম প্রথম হয়তো মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। তারপর একদিন একটা বড় মাছ ঘাই দিলে। তখন বিশ্বাস হল, পুকুরে মাছ আছে। কিছু পরে হাতটা কাঁপল। তখন জানতে পারলে, চারে মাছ এসেছে। তারপর হয়তো মাছটা টোপ খেয়ে পালাল। খুব সাবধানে ছিপ হাতে করে বসে রইলে। ক্রমে যেমন মাছ টোপ গিললে, অমনি আড়ায় টেনে তুললে।

বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসের কত জোর! রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, তাঁকে সাগর পার হতে সেতু বাঁধতে হয়েছিল। হনুমান তাঁর নামে বিশ্বাস করে অনায়াসে ডিঙিয়ে গেলেন।

কেবল শাস্ত্র পড়াতে বড় কিছু হয় না। তেরে কেটে তাক্ মুখে বলা সহজ, হাতে আনা শক্ত। পাঁজিতে লেখে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

কিছু সাধনা করা চাই। মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বললে কি হবে? সিদ্ধি খেলে তবে নেশা হয়, তবে আনন্দ হয়।

সাধনের নানা পথ আছে। যত মত, তত পথ। এই কালীবাড়িতে আসতে কেউ হেঁটে আসে, কেউ গাড়ি, কেউ নৌকা করে আসে।

ঈশ্বরে কি করে মন হবে? কলিতে ভক্তিযোগ। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাক, তাঁর নামগুণগান কর, সৎসঙ্গ কর। ভাব সব সংক্রামক, তাই সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু যাই কর, ঈশ্বরের অনুগ্রহ না হলে কিছুই হবে না। ঈশ্বরের কৃপা হলে হাজার জন্মের মহাপাতক এক মুহূর্তে নষ্ট হয়। হাজার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একবার একটা দেশলাই জ্বালালেই আলো হয়ে পড়ে।

যাঁকে চাও, তিনি কাছেই রয়েছেন। অথচ লোকে ঘুরে বেড়ায়। একজন তামাক খাবে বলে প্রতিবাসীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেল। একজন লোক বেরিয়ে এসে বল্‌লে, কি হে, কি চাও? সে বললে, তামাক খাব বলে টিকে ধরাতে এসেছি। প্রতিবাসী বললে, তুমি তো আচ্ছা লোক! এই এত দোর ঠেলাঠেলি, তোমার হাতেই ত লণ্ঠন রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, আগে ঈশ্বর, পরে সংসার।

ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। যেমন বিষয়ীর বিষয়ের ওপর অনুরাগ, সতীর যেমন পতির ওপর ভালবাসা, মায়ের যেমন ছেলের ওপর টান, তেমনি ভালবাসা। এই তিন টান এক হলে ঈশ্বর-দর্শন হয়।

এক হাতে কর্ম কর, এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। অভ্যাসযোগ জানো। ও দেশে ছুতোরদের মেয়েরা চিড়ে কোটে। তাদের কত দিক

সামলে কাজ করতে হয়, শোন—ঢেঁকির পাট পড়ছে, এক হাতে ধান ঠেলে দিচ্ছে, আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দের এসেছে, তার সঙ্গে হিসেব করছে। দেখ, একসঙ্গে কত কাজ করছে—ছেলেকে মাই দেওয়া, ধান ঠেলে দেওয়া, কাঁড়া ধান তোলা। কিন্তু তার বারো আনা মন সেই ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়।

ভূত কেমন করে ছাড়বে বল ? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তাই ভূতে পাওয়া। যে মন দিয়ে সাধন-ভজন করবে, তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সাধন-ভজন কি ক'রে হবে ? ছেঁদা মালায় জল ধরে না। জলে নৌকা থাকে, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু নৌকায় না জল ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে।

সাধনার আর এক বিঘ্ন সিদ্ধাই। এক সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল। তার অনেক তপস্যা ছিল। ভগবান তাই একদিন সাধুর বেশে তার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, শুনেছি না কি আপনার খুব সিদ্ধাই হয়েছে ? সেই সময় সেখান দিয়ে একটা হাতী যাচ্ছিল। ভগবান্ আবার বললেন, মহারাজ, আপনি ইচ্ছা করলে এই হাতীটাকে মেরে ফেলতে পারেন ?

সাধু বললেন, হাঁ, তা হতে পারে—বলে বললেন, হাতী, মর। হাতী তৎক্ষণাৎ ম'রে গেল।

ভগবান্ সাধুর খুব প্রশংসা করলেন আর বললেন, উঃ, আপনার কী শক্তি, হাতীটা ম'রে গেল ! সাধু হাসতে লাগলেন।

তারপর ভগবান্ বললেন, আচ্ছা মহারাজ ! হাতীটাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারেন ?

সাধু বললেন, হাঁ, তাও হতে পারি। হাতী বাঁচ, বলতেই হাতীটা উঠে দাঁড়াল। দেখে ভগবান্ চুপ করে রইলেন।

সাধু তখন জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখলেন ?

ভগবান্ বললেন, দেখলুম হাতী মোলো, হাতী বাঁচলো। কিন্তু এতে তোমার কি হ'ল ? ভগবান্ লাভ হ'ল কি ?

সংসারী জীবের চৈতন্য হয় না। উট কাঁটাঘাস খেতে খুব ভালবাসে। দু' কষ দিয়ে দর-দর ক'রে রক্ত পড়ে, তবুও সেই কাঁটা-ঘাস খাবে। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, আবার যেমন তেমনি।

তাও বটে! তাও বটে! আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে! ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং আর যদি কিছু থাকে, তাও। সাকার রূপ মানো আর না-মানো, এসে যায় না, ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হ'ল, যে ব্যক্তি অনন্ত-শক্তি, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শোনেন। ঈশ্বরকে কে ঠিক জানবে? যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু জানলেই হ'ল। একটা পিঁপড়ে চিনির এক দানা খেলে, এক দানা মুখে ক'রে ভাবতে ভাবতে গেল, পাহাড়টা কাল নিয়ে যাবো।

তোমাদের কেন ত্যাগ করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতে হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা ভাল। ক্ষিদে-তেষ্টা এ সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই করা ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ। হয়তো খেতেই পেল না। তখন ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। এক ব্যক্তি বলেছিল, আমি আর সংসারে থাকব না। তার পরিবার বললে, পেটের দায়ে দশ দোরে না ঘুরতে হয়, যাও। আর তা যদি যেতে হয়, তাহলে এক ঘরই ভাল।

ভেলকি বাজী করে। অনেক গাঁট দেওয়া দড়ি, একদিকে বেঁধে একটা ধার ধরে নাড়া দেয়, অমনি সব গেরোগুলো খুলে যায়। ঈশ্বরের কৃপা হলে সব পাশ এক মুহূর্তে খুলে যাবে।

অহংকার ত্যাগ না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। নাবালকেরই অছি হয়। বৈকুণ্ঠে নারায়ণ একদিন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সুদর্শন হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মী বললেন, কোথা যাও? আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, রক্ষা করতে। প্রভুকে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এরই মধ্যেই ফিরলে যে? দেখ্‌লুম, সে ভক্তটি নিজে হাতে ইঁট তুলেছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের সূত্রপাত হইল। রোগ

ক্যান্সার (cancer)—বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকে রোহিণী বলে। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এই ব্যাধির আর একটি নাম Clergy-man's sore throat অর্থাৎ ধর্ম-পিপাসুদিগকে ক্রমাগত ধর্মোপদেশ দিয়া বাক্‌যন্ত্রের অপরিমিত ব্যবহারে গলায় ক্ষত হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হয়। ব্যাধি অসাধ্য জ্ঞাত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, দেহ জানে আর রোগ জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো। মহা যন্ত্রণাদায়ক এই করাল ব্যাধির ইতিহাসে মন একদিনের জন্যও তাঁহার অনুজ্ঞান অন্যথাচরণ করে নাই। এদিকে ব্যাধির সমানুপাতে লোকসমাগমও বাড়িতে লাগিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত কয়েকজন গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া তদ্বির করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন, ইহারা আর সংসারে ফিরিবে না। চিকিৎসকের বিধি-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালিত হইতেছে। কোন সম্বন্ধেই ত্রুটি নাই। কেবল এক বিষয়ে ভক্তগণ কোন উপায় করিতে পারিতেছে না। ভগবৎ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে ঠাকুর বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন। ডাক্তার সরকার বলিতেন, ভাব-সমাধি তোমার পক্ষে এখন সাংঘাতিক।

ডাক্তার প্রবল উৎসাহ, যত্ন এবং অধ্যবসায় সহকারে দেখিতে লাগিলেন। ব্যাধির সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধিতে ডাক্তার কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং একটা সিদ্ধান্ত না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না।

এক সময় পীড়ার ঈষৎ বৃদ্ধি দেখিয়া ডাক্তার সরকার বলিলেন, নিশ্চয় পথ্যের কোন গোলমাল ঘটছে। আজ কি খেয়েছ বল দিকি?

রোজ যা খাই। ভাতের মণ্ড, ঝোল, দুধ, সন্ধ্যার পরে দুধ, যবের মণ্ড—

আজ ঝোল হয়েছিল কি কি আনাজ দিয়ে?

আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দু' এক টুকরো ফুলকপিও ছিল।

অ্যাঁ, ফুলকপি খেয়েছ?

ফুলকপি খাইনি। তবে ঝোলে ছিল, দেখেছি।

খাও আর নাই খাও। ঝোলে ওর সত্বটা ছিল।

সেকি গো! কপি খেলুম না, কেবল ঝোলে একটু রস ছিল ব'লে অসুখ বেড়ে গেল!

ওগো! ঐ অল্পটুকুতে যে কতটা অপকার হয় তা কি তোমরা ভাব? শোন তবে। আমার একবার ভারি অসুখ হল। কোন কারণ ধরতে পারছিনি। একদিন দেখি, আমি যে গরুটার দুধ খাই, সেটাকে মাষকলাই খাওয়াচ্ছে। তারপর গরুটাকে কলাই খাওয়ানো বন্ধ করলুম। তাতেও হল না, লক্ষ্ণৌ যেতে হল। শেষে বারো হাজার টাকা খরচ করে বাড়ি ফিরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, কি বল গো! তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে!

ডাক্তার বলিলেন, জাহাজের কাপ্তানের বড় মাথা ধরেছিল, তাই ডাক্তাররা পরামর্শ করে জাহাজের গায় বেলেস্তারা দিলে।

এই শ্যামপুকুর বাসাতে একদিন একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন তিনি দেখিলেন, তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর তাঁহার ঘাড় ও গলার সংযোগস্থলে অনেকগুলি ঘা হইয়াছে। কেন এরূপ হইল, ভাবিতে ভাবিতে মা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, অনেকে অনেক দুষ্কর্ম করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে আর পবিত্র হয়, তাহাদের পাপরাশি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়া তাঁহার শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ শরীরে ঐরূপ ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে। খৃষ্টধর্মে ইহার নাম দিয়াছে Atonement. যাহা হউক, ভক্তেরা সাবধানতা অবলম্বন করিলেন, বিশেষ-জানা-শোনা না হইলে আর কাহাকেও সহসা স্পর্শ করিতে দিবেন না। একমাত্র গিরিশচন্দ্র বলিলেন, চেষ্টা করতে হয়, কর। কিন্তু সম্ভবপর নয়। উনি যে ঐ জন্যে দেহধারণ করেছেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধি ও তাহার অপরিসীম যন্ত্রণা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তার সরকারের উপদেশে অগ্রহায়ণ মাসের একদিবস পূর্বে তাঁহাকে কাশীপুরের একখানি উদ্যান-বাটীতে

দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত করা হইল। উদ্যান-দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন।

এই বাগানে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণকে লোকশিক্ষাদান এবং সন্ন্যাস-জীবন অবলম্বনের জন্য গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রকমে কোনরূপে তিন-চারি মাস কাটিয়া গেল। এখন নবীন পাল চিকিৎসা করিতেছেন। এই সময় হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর রক্তমোক্ষণ হইল। নরেন্দ্রনাথ পাত্র ধরিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটু হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিলেন—জীব, তোর জন্যে যে আমি পাত্র পাত্র রক্ত ঢাললুম, তুই আমার কি করলি!

নরেন্দ্রনাথ রক্তপাত্র ধরিয়া আছেন, এই সময় তাঁহার মনে উদয় হইল, এই তো দুর্বলতার চরম অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছ। চোখের পাতা ফেলবার পর্যন্ত শক্তি নেই। এখন যদি বলতে পার যে, তুমি ঈশ্বর, তাহলে মানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিকে ঈষৎ মুখ তুলিয়া বলিলেন, এখনও সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব হইতে বলিতেছেন, মন নিয়ত অখণ্ডে লয় হইয়া থাকিতে চাহিতেছে। অতঃপর শ্রাবণের শেষভাগে একদিন যোগীন্দ্রনাথকে পঞ্জিকা পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। ৩১শে শ্রাবণ শেষ করিয়া ১লা ভাদ্র আরম্ভ করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চাৎ ফিরিলেন, আর শুনিলেন না।

ক্রমে শ্রাবণ-সংক্রান্তি সমাগত হইল। আজ রবিবার। বাগানে বহু ভক্ত আসিয়াছে। ডাক্তার আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, আজ আমার ভারি গা জ্বলছে। শিরায়-শিরায় গরম জলের পিচকারি চলছে। ডাক্তার নতমুখ, নিরুত্তর।

রাত্রি প্রায় প্রহরান্তে তাঁহার ক্ষুদ্‌বোধ হইল। তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে মুখে সুজীর পাত্র ধরা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে-ধীরে আহার

করিলেন—অন্যদিন হইতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে। ইহাই ইহসংসারে তাঁহার শেষ আহার। তার পর বলিলেন, দেখ্, আমার হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হায়, কে বুঝিয়াছিল, তিনি তাঁহারই মহোৎসবের ব্যবস্থা করিতেছেন!

সহসা স্তব্ধ কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া, তিনবার কালীনাম ধ্বনিত হইল—কালী—কালী—কালী! ভক্তগণ চকিত হইয়া উঠিলেন—একমাত্র ঠাকুরের কণ্ঠেই এমন সু-উচ্চ, সুস্পষ্ট, সুমধুর, বুকভরা, মন-মাতানো কালীনাম বাহির হইত। কিন্তু সে কণ্ঠ তো বহুদিন রবহীন। রামকৃষ্ণের মুখে কালীনাম শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত, ভীত, চমকিত হইলেন। পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুরের অধরযুগল অনৈসর্গিক হাস্যরঞ্জিত, মুখে দিব্যদীপ্ত; কলেবর রোমাঞ্চিত, নয়ন নাসাগ্রে! চোখে প্রেমধারা! শরীর রুগ্নশয্যায় পতিত, আত্মা কোন্ লোকে কে বলিবে! কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ সমাধি এবং ইহাই মহাসমাধি।

সহসা মনে হইল, কক্ষমধ্যে কে যেন গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতেছে। তখন কেহ বুঝিতে পারেন নাই, সে ক্রন্দন তাঁহাদেরই মর্মস্থল হইতে উত্থিত হইতেছে।' প্রভু এই ছিলেন, কোথায় গেলেন? একযোগে সকলেরই দৃষ্টি যেন বহির্জগতে পতিত হইল। আকাশে চাঁদ, অজস্র তারাহার, তবু যেন ধরণী অন্ধকার, বৃক্ষ-বল্লী শ্বাসহীন!

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-দিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে-দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার, ১৮৩৬, আজ ১১ই আগষ্ট, ১৮৮৬।

ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, সীতাদেবী বলিতেন, রাবণ পূর্ণিমার চাঁদ। আমার রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্র। গদাধরের জন্ম, শুক্লা দ্বিতীয়ায়—ক্রমবর্ধনশীল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ইংরেজ অধিকার শতবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব হিন্দুর জাতীয় স্বভাব কলুষিত করিয়াছে। আমাদের জ্ঞান সন্ধানহারা,

বুদ্ধি সংশয়াচ্ছন্ন, ভক্তি অনুরক্তিহীন, কর্ম কুপ্রবৃত্তিহীন। এই শ্রদ্ধাহীন যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন—সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়—যত মত—তত পথ। সর্বপ্রকার সাধনায় সিদ্ধ হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে। তবে কলিতে ভক্তিপথই প্রশস্ত।

ধর্মের গ্লানি হইলে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-যুগে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগে তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাণিজ্যজীবী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমশঃ শক্তি-সঞ্চয়ের পর এক দিন দিবাবসানে ভাগীরথীতীরস্থ পলাশীর মাঠে রাজমুকুট কুড়াইয়া পাইয়া, রাজ্যশাসনে মনোযোগী হইলে এ দেশে শাসননীতির যে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল, শিক্ষার পরিবর্তন তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল। এ দেশের যুবকগণ কোম্পানীর সেরেস্তায় চাকরি করিবার জন্য অল্প-বিস্তর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই শিক্ষায় হিন্দু সন্তানের স্বধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয় নাই ; বরং কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীরা তাঁহাদের ধর্মানুরাগে সাধারণতঃ উৎসাহই প্রদান করিতেন। কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হইবার এক শতাব্দী পরে সিপাহী-বিপ্লবের অবসানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারত-শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, সেই সময় এ দেশের রাজ-কার্যে বিস্তৃতভাবে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এ দেশের অধিবাসিগণকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং তাহাতে ধর্মহীন শিক্ষা আরম্ভ হইল। ইহার উপর মার্সম্যান, কেরী প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণ নানাভাবে হিন্দু-সন্তানদের আজন্মের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করিতে লাগিলেন। যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার চাকচিক্যে তাঁহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, এবং হিন্দুধর্মটা কুসংস্কারের অচলায়তন বলিয়াই তাঁহাদের অনেকের ধারণা হইল। ইহার উপর মেকলে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এ দেশের শিক্ষিত সমাজকে বুঝাইতে লাগিলেন, সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন ও

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ আছে—য়ুরোপের যে কোন লাইব্রেরীর একটিমাত্র আলমারিতে তাহাদের স্থান হইতে পারে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণার পর আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, পুরুষ-পরম্পরায় আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা ভ্রম ও কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত; বেদ চাষার গান মাত্র, হিন্দুর মহাকাব্য রামায়ণ হোমর-বিচরিত ইলিয়াডের অনুকরণে রচিত অর্থাৎ আমাদের কিছুই ছিল না; যদি আমরা মানুষ হইতে চাই—তাহা হইলে আমাদিগকে ঐ সকল প্রাচীন কুসংস্কার মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায়।

সুতরাং এই যুগে এ দেশের শিক্ষিত যুবকগণের রুচি ও প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হওয়ায় তাঁহারা খৃষ্টান পাদরীদের কুহকে মুগ্ধ হইয়া, খৃষ্টধর্ম আলিঙ্গন করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে এবং খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারমাহাত্ম্যে এ দেশের যুবক-সমাজ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া, দলে দলে খৃষ্টান হইতেছে দেখিয়া, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, খৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে কিঞ্চিৎ বাধা ঘটিলেও পরবর্তী যুগে স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, প্রতিভাময়ী কবি তরু দত্তের পিতা গোবিন্দচন্দ্র, শশিচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি শিক্ষিত হিন্দু-সন্তান হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই যুগে হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধির অভাবে এবং বিকৃত-রুচির প্রভাবে, বিশেষতঃ, ডিরোজিও প্রভৃতি ছাত্র-হিতৈষী, প্রতিভাবান বিধর্মী শিক্ষকগণের প্রদত্ত শিক্ষায় কুসংস্কারবর্জিত হইয়াও যে সকল হিন্দু-সন্তান পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদেরও রুচি-প্রবৃত্তি এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান বিদ্বেষী জগাই মাধাই প্রভৃতির কদাচারের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন; তাঁহারা মদ্যপানকে সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, এবং প্রকাশ্য-স্থলে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া, অস্থিরাশি হিন্দুগৃহে নিক্ষেপ করা

নৈতিক সাহসের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন। এই কার্যে তাঁহারা আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের রচনা হইতেই আমরা সে কালের শিক্ষিত সমাজের এই প্রকার কদর্য রুচির ও অনাচারের বিবরণ জানিতে পারি। যে ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে এক দিন একেশ্বরবাদের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্ম সমাজও অবশেষে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দান করিল। এই সময় বহু ব্রাহ্মণ-সন্তান যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া, পৌরুষের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মরা হিন্দুদের পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। অনেক শিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলাও হিন্দুর শুদ্ধান্তবাসিনিগণকে লক্ষ্য করিয়া 'ওরা হিঁদুর মেয়ে', 'ওরা পুতুল পুজো করে' বলিয়া অবজ্ঞাভরে নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন, ইহা বাল্যকালে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অথচ তাহা অর্ধশতাব্দীর অধিক পূর্বের কথা নহে; এবং এই সময়েও সলোমন বিশ্বাস, ডানিয়াল রাহা প্রভৃতি নেটিভ 'রেভারেণ্ডের' দল পল্লীগ্রামের হাটে, বাজারে এবং রথতলায় সমাগত হইয়া, যিশু-মহিমা-কীর্তন উপলক্ষে হিন্দু দেব-দেবীর গ্লানিকর যে সকল অশ্রাব্য মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহা এতকাল পরেও আমাদের স্মরণ আছে।

এই সকল কারণে বাঙালীর সমাজ-জীবনের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল এবং যে ধর্মভাব পুরুষানুক্রমে হিন্দুর সদাচার, নিষ্ঠা, পবিত্রতা এবং শাস্ত্রাদির অনুশাসনের প্রতি প্রবল অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহার ভিত্তি ধর্মহীন শিক্ষার প্রবল প্লাবনে কম্পিত হইয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এ দেশে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রচলনের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সুসিদ্ধ হইল। এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বেও আমরা পরাধীন ছিলাম, পরেও আমাদের ভাগ্যে ঘাস দড়ি অক্ষুণ্ণ রহিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভ্যুদয়ের পূর্বে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতার যে গৌরব ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া সমগ্র জাতির হৃদয়ে দাসমনোভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আরও ক্ষোভের বিষয়, আমরা

মনেপ্রাণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গোলাম হইয়া তাহাকেই আমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির নিদর্শন বোধে নবজীবন লাভের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। তখন আমরা যাহা কিছু পাশ্চাত্ত্য ও আপাতমনোহর, তাহারই পক্ষপাতী হইয়া আমাদের সনাতন ধর্ম, রীতি-নীতি, ক্রিয়া-কর্ম, এ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইলাম। পাশ্চাত্ত্য ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির প্রবাহে হিন্দুর বৈশিষ্ট্য, হিন্দুর জাতীয়তা পর্যন্ত ভাসিয়া গেল, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান-শাসনে আমাদের ধর্ম-জীবনের যে শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন ছিল, দেড় শতাব্দীর ইংরেজ-শাসনেই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। সুতরাং সাধুতা রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতি বিনাশের জন্য, ধর্মসংস্থাপনের জন্য, পুনর্বার শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হইবার যুগ উপস্থিত হইল। কিন্তু শতাব্দী পূর্বে কেহ কি কল্পনাও করিয়াছিল, সকল অন্ধকার, সকল সন্দেহ, সকল মতবিরোধ বিধ্বস্ত করিয়া, যে অখণ্ড সত্যের আলোক আজ প্রভাতসূর্যের কনককান্তির ন্যায় সমগ্র সভ্যজগৎ জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিতেছে, শত দুর্গতি-লাঞ্ছিত এই বাংলার এক মণিমঞ্জুষা হইতে সেই শাশ্বত সত্যের প্রথম রশ্মিজাত বিকীর্ণ হইয়া, অচিরে নিখিল বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে, এবং নিশাশেষে বিহঙ্গের প্রথম কাকলীর ন্যায় বাঙালীর কলকণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি সেই মহাপুরুষের আত্মপ্রকাশবার্তা দিগন্তে বিঘোষিত করিয়া বিশ্ববাসীর নিদ্রাভঙ্গের উপলক্ষ হইবে ?

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, শৈশবে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া ভাগ্যবানের আদরের দুলালের ন্যায় সোনা-রূপার ঝিনুকে দুগ্ধ পান করিয়া পরম সুখে বর্ধিত হইবার ভাগ্য লইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলি, তাহা লাভ করা দূরের কথা, পল্লীর পাঠশালায় সাধারণ লেখাপড়া শিখিবার সকল সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নাই। পল্লীর সুশীল সুবোধ গোপালের মত মনোনিবেশসহকারে বিদ্যার্জনের প্রবৃত্তি বা আগ্রহও হয় তো তাঁহার ছিল না। জননী বাগ্দেবী যাঁহার কণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক দিন লক্ষ লক্ষ

সংসারতাপদগ্ধ মুমূর্ষু মানবের শ্রবণপথে সন্তোষ ও শান্তির বাণী, শোক-দুঃখ-পীড়িত নরনারীর হতাশ হৃদয়ে আনন্দ ও কল্যাণের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন, ভাষা ও ভাব আয়ত্ত করিবার জন্য তাঁহার কেতাবী বিদ্যার্জনের কি প্রয়োজন ছিল? যে কালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কালে অর্থকরী বিদ্যার আদরের সীমা ছিল না, কিন্তু কমলার কৃপার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বর্ণ-রৌপ্যমুষ্টিকে যিনি মুষ্টিমেয় মৃত্তিকার ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া নির্বিকার চিত্তে ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করাকেই জীবনের অন্যতম সাধনার সোপান বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, এবং সুকৃতিবলে স্বভাবতঃই সকল রিপুকে ক্রীতদাসের ন্যায় পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি কোন্ প্রলোভনে কমলার কনকাঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? দক্ষিণেশ্বরে জগজ্জননী ভবতারিণীর শ্রীচরণচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে দুর্লভ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইহসর্বস্ব, ভোগসুখবিমুগ্ধ জড়বাদীর নিকট তাহা তুচ্ছ ও অসার প্রতীয়মান হইতে পারিত, কিন্তু এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে রাজরাজেন্দ্রবৃন্দের হীরকরত্নখচিত মহার্ঘ মুকুট চিরদিনই সেই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষোত্তমের চরণধূলা স্পর্শে ধন্য হইয়া আসিয়াছে। দিব্য-বিভূতির অধিকারী যে মহাপুরুষের কঠোর সাধনার অপূর্ব ইতিহাস আজ অর্ধ-জগতের লক্ষ লক্ষ ভক্তের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠনিঃসৃত সুপবিত্র স্তোত্রগাথায় ঝঙ্কারিত হইয়া ত্রিতাপজর্জরিত তৃষ্ণার্ত জনমণ্ডলীর শ্রবণবিবরে মধু বর্ষণ করিতেছে, জীবনের প্রান্তোপনীত, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বৃদ্ধের কম্পিত হস্তের দুর্বল লেখনী সেই বিরাট পুরুষের মহিমাকীর্তনের যোগ্য নহে, এবং সেই চেষ্টাও তাহার পক্ষে শোভন নহে। তথাপি তাহার হৃদয়নিহিত অনাবিল ভক্তির এই তুচ্ছ অর্ঘ্য তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইবে না—ভক্তের যিনি ভগবান বলিয়া আজ জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবর্গের ভক্তির মন্দাকিনীধারায় সিঞ্চিত হইতেছেন।

শুনিতে পাই, পরমহংসত্ব লাভ করিতে হইলে সন্ন্যাসিগণকে কতকগুলি বিধিনিষেধের বাঁধা পথে অগ্রসর হইতে হয়। যাঁহারা সাধনার সেই নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ না করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন,

তাঁহাদিগকে সেই মার্গাবলম্বী সাধকগণ খাঁটি পরমহংস বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন না, এজন্য কেহ কেহ না কি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমহংসত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত। কিন্তু যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া পরমহংস নামে প্রকীর্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কয়জন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় নিখিলের ভক্তি-চন্দনে চর্চিত হইয়া, ভ্রান্ত মানবকে শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানবঞ্চিত অকিঞ্চন জনের তাহা অজ্ঞাত। যে মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এই কর্মক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব, সেই ব্রত সংসাধিত করিয়া তিনি নিত্য-ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন, এজন্য যে চারপাশের প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিবার শক্তি বা যোগ্যতা কোন মানবের ছিল না। মানুষ কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি সংযোগ করিয়া মনে করিতে পারে 'আমি আগুন জ্বালিলাম' কিন্তু সেই অগ্নির দাহিকাশক্তি তাহার নিজস্ব। পরমহংসদেব সেই অগ্নি ; তাই যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাকেই অগ্নিময় হইতে হইয়াছিল, এবং সেই অগ্নিতে ইন্ধনের যাহা কিছু নশ্বর, তাহা ভস্মীভূত হইয়া যাহা অপার্থিব তাহার গৌরবজ্যোতিঃ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় অজ্ঞান-তিমিরে দিব্যপ্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল। পরমহংসদেব পুনঃ পুনঃ যে কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সংসারবিরাগী কোন সাধু-সন্ন্যাসী, সংসারনির্লিপ্ত কোন তপস্বীকে তাঁহার ন্যায় সেই পরীক্ষানলে প্রবেশ করিতে বা তাঁহার ন্যায় মহিমাপ্রদীপ্ত অক্ষতদেহে বহির্গত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এই জন্যই আজ সমগ্র সভ্যজগৎ সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-সংরক্ষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে ; সকল ধর্মের চিন্তাশীল ও উদার মতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই স্মরণীয় দিনে তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছেন, ইহা কি অহেতুক সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র ? যে যুগে তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই যুগে কেবল বাংলার নহে, ভারতের নহে, তাঁহার আবির্ভাবের ফলে ধর্মজগতের সর্বত্র শান্তি ও কল্যাণের সূচনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী বা যোগী-তপস্বী লোকলোচনের অন্তরালে জীবনব্যাপী সাধনায় সিদ্ধি

লাভ করেন, তাঁহারা স্ব-স্ব মোক্ষচিন্তাতেই বিভোর থাকেন, এবং কদাচিৎ মানব-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ হইবার সুযোগ দান করেন। কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয় দ্বারা সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য, সন্দিগ্ধবাদীর হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস ও জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়া মানব-জাতিকে উন্নতির পথে, ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগের পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে, অজ্ঞানান্ধকারসমাচ্ছন্ন হৃদয়ে আর্যমনীষার জ্যোতির্বিকাশের এবং ভারতের বিলুপ্তপ্রায় গৌরব-রশ্মি পুনঃপ্রকাশের অভিপ্রায়ে নবকলেবরে—পরিশুদ্ধ দেহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মপ্রকাশ জগতের ইতিহাসে কি অলৌকিক অপূর্ব ব্যাপার, মানব-জাতি তাঁহারই আশীর্বাদে ক্রমশঃ তাহা উপলব্ধি করিতেছে।

বিশ্বের মানব-জাতিকে তিনি যে জ্ঞানামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য যাঁহারা অশান্ত হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করিতেন, তাঁহারা জানিতেন না, কোথায় কিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে; পথের সন্ধান কোথায় মিলিবে—তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা অন্ধকারে অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হৃদয় ব্যাকুল করিতেছিলেন; কিন্তু দুর্গম অরণ্যে নিবিড় পত্ররাশির অন্তরালে সুরভিপূর্ণ বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন মধুপবৃন্দ তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সন্নিকটবর্তী হইয়া থাকে, এবং পুষ্প-পরিমল আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ তৃষিত-চিত্ত ভক্তবৃন্দ তাঁহার উপদেশ-সুধায় পরিতৃপ্ত ও ধন্য হইবার আশায় তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছিল না; শাস্ত্রের কূট গবেষণা ছিল না; ন্যায়, দর্শন ও ধর্মনীতির শুষ্ক বিচার-কৌশল ছিল না; তাহা সরল, সুন্দর, হৃদয়-স্পর্শী, সহজবোধ্য সাধারণ দৃষ্টান্তে পূর্ণ; তাঁহার প্রত্যেক বাণী যে শক্তিতে অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা অমোঘ এবং অসীম; নিস্তরঙ্গ সুনীল সমুদ্র-বক্ষে শরতের পূর্ণ শশধরের শুভ্র কৌমুদী-সম্পাতের ন্যায় তাহা সুস্নিগ্ধ মাধুর্যের বিকাশ

করিত। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান এবং পঠিত বিদ্যার গভীর অভিজ্ঞতা দ্বারা, হৃদয়কে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিবার সেই শক্তি কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহা ভগবৎকণ্ঠোচ্চারিত দৈববাণীর ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং চিরন্তন। যাঁহারা তাহা শ্রবণে ধন্য হইতেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিতেন, তাহা যুক্তি-তর্কের অতীত। তাঁহার সহজবোধ্য অকাট্য সিদ্ধান্তের নিকট তার্কিকের সকল যুক্তি মূক হইয়া সঙ্কীর্ণচেতা কূটবুদ্ধি সাংসারিক ব্যক্তি, কত শোক-দুঃখ জর্জরিত জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ, ভগবানের প্রতি আস্থাবিহীন নর-নারী তাঁহার মধুর উপদেশে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা নির্দেশ করি—সে শক্তি আমাদের নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর অবসান-কালে বঙ্গদেশে যাঁহারা শিক্ষায়, জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে সমাজের অলঙ্কার ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আসন নরলোকের অধিষ্ঠানভূমির বহু ঊর্ধ্বে কোন দিব্যলোকে অধিষ্ঠিত; সেখানে কেবল আনন্দ ও জ্যোতির দিগন্তব্যাপী বিকাশ। নববিধান সমাজের প্রবর্তক বাগ্মিশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, চিকিৎসক-সমাজের শিরোমণি সুধীর ডাক্তার, মহেন্দ্রলাল সরকার, বঙ্গসাহিত্যে নবপ্রাণের প্রতিষ্ঠাতা, চিন্তাশীল সমালোচক, নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ—যাঁহারা সেই যুগে বাঙালী সমাজের চিন্তার ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাঁহারা এই অনাসক্ত, স্পষ্টবাদী, সরল, নির্ভীক ব্রাহ্মণের অব্যর্থ উক্তি শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাঁহার হৃদয়-রহস্য বিশ্লেষণে অসমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ, সাধারণ মানবীয় জ্ঞান এবং মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণের শক্তি লইয়া তাঁহার হৃদয়-রহস্য বিশ্লেষণ মানবের সাধ্যাতীত।

পরমহংসদেবের যুক্তি কিরূপ অমোঘ ছিল, কিভাবে তাহা হৃদয়ের অন্তর্দেশ আলোড়িত করিত এবং নত মস্তকে তাহা শিরোধার্য করিতে হইত, তাহার বহু দৃষ্টান্ত তাঁহার কথামৃতে ও উপদেশ-সংগ্রহে সংরক্ষিত হইয়াছে। আজ তাহা পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া জগতের

জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতেছেন। তাহা তাঁহার পরমজ্ঞান ও পারমার্থিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজিত। তিনি অল্প কথায় সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা গভীর পরমার্থতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংশয়জাল ছিন্ন করিতেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আজ আর জনসমাজের অগোচর নহে ; তথাপি আজ একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত স্মরণ হওয়ায় এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

লৌহ যেমন চুম্বক কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ নববিধানাচার্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রবীণ বয়সে পরমহংসদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইতেন, এবং তাঁহার নিকট তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া বহু জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতেন।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন প্রভাতে পরমহংসদেবের দর্শনাশায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব সেই প্রভাতকালে নিবিষ্টচিত্তে ভবতারিণী-মন্দিরে মহাদেবীর চরণ বন্দনা করিতেছিলেন ; কেশবচন্দ্র মন্দিরদ্বারে তাঁহার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নবোদিত অরুণের কিরণচ্ছটায় তখন চরাচর উদ্ভাসিত, যেন তাহা জগজ্জননীরই সমুজ্জ্বল মহিমালোক। পরমহংসদেব অর্চনা-শেষে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবদ্ভক্ত কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। কেশবচন্দ্র সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া পরমহংসদেবকে বলিলেন, "দেখিলাম, আপনি তন্ময় হইয়া দেবীর অর্চনা করিতেছিলেন, কিন্তু দেবী-প্রতিমার আপনি যে বন্দনা করিলেন, আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি দেবীকে 'ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী', 'বিশ্বপ্রসবিনী', 'জগজ্জননী' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ; কিন্তু এই পাষাণ-প্রতিমা কি সত্যই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী বিশ্বপ্রসবিনী ?"

পরমহংসদেব বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র তাঁহাকে পৌত্তলিক জ্ঞানে এই ইঙ্গিত করিলেন, তিনি প্রসন্নহাস্যে বলিলেন, "এ বিষয়ে তোমার সন্দেহের কারণ কি ?"

কেশবচন্দ্র বলিলেন, "মন্দিরমধ্যবর্তিনী এই প্রতিমার মূর্তি মানবদেহ অপেক্ষা বৃহদাকার নহে, তবে উনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,

জগৎপ্রসবিনী হইলেন কিরূপে? সেই ব্রহ্মাণ্ডটাই বা কত বড়, আর জগৎটাই বা কিরূপ?”

কোন সাধারণ ভক্ত, কোন সাধারণ সাধক ব্রাহ্মধর্মপ্রচারকের এই প্রশ্নের কি উত্তর দান করিতেন, তাহা আমাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই; কিন্তু পরমহংসদেবকে ভক্তিতে পরাজিত করিবেন, এরূপ দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়াও আমাদের জানা নাই। তিনি দ্বিধাহীন-চিত্তে বলিলেন, “ঐ সূর্য উঠিয়াছে দেখিয়াছ?”

কেশবচন্দ্র পূর্বাকাশ-সংস্থিত সূর্যমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন।

পরমহংসদেব বলিলেন, “সূর্যটা কত বড়?”

কেশবচন্দ্র বলিলেন, “পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দগুণ বড়।”

“কত বড় দেখিতেছ?”

“ক্ষুদ্র; গরুর গাড়ির চাকার মত।”

“কেন? যে সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অতগুণ বড়, তাহাকে অত ছোট দেখিতেছ কেন?”

কেশব বলিলেন, “বহু—বহু দূরে আছে বলিয়া দূরের বস্তু ছোট দেখায়।”

পরমহংসদেব বলিলেন, “সত্য কথাই বলিয়াছ। তুমি আমার মায়ের অনেক দূরে আছ বলিয়া মাকে অত ছোট দেখিতেছ।”

সম্ভবতঃ তাঁহাদের আলোচনার ভাষা অন্য প্রকার ছিল, কিন্তু তাহার মর্ম এইরূপই। কেশবচন্দ্র নিরুত্তর হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার পার্থক্য কোথায়। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুক্তির এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানবের কল্পনার ঊর্ধ্বে বিরাজিত থাকিয়া জ্ঞান, ভক্তি ও যুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছে।

মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধি-বিবেচনায়, যুক্তি-তর্কে সেকালের কোন প্রতিভাবান শিক্ষিত যুবক অপেক্ষা হীন ছিলেন না; মানব-হৃদয়রহস্য-বিশ্লেষণ-শক্তি তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রখর ছিল; বাগ্মিতায় তিনি বিশ্ব জয় করিতে পারিলেন; কিন্তু পরমহংসদেব কিরূপে তাঁহার

সংশয়তিমিরাচ্ছন্ন তরুণ হৃদয় জয় করিয়া তাঁহাকে বিশ্বহিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টায় মানবের প্রতিভা ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং এই একটি দৃষ্টান্তে আমরা অন্ধ সংসার-মায়াবদ্ধ জীব তাঁহার ঐশী শক্তির লীলাবিকাশ সুস্পষ্ট-রূপে অনুভব করিতে পারি।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইয়াছিল, সমগ্র বিশ্বে সনাতন ধর্মের মহিমা পরিব্যাপ্ত হউক, এই জন্য তাঁহারই গুহ্য প্রেরণায় চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। স্বামী বিবেকানন্দের তূর্যনাদে সেই মহাসভায় সর্বধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ মন্ত্র-বিমুগ্ধ নতশির ভুজঙ্গের ন্যায় বিমোহিত হইয়া, তাঁহার জলদ-গম্ভীর কণ্ঠের যে মহাবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা দৈববাণীর ন্যায় অমোঘ। স্বামীজীর গুণগ্রাহী বন্ধু বিজ্ঞান-জগতের তদানীন্তন সম্রাট স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের ভাষায় বলিতে হয়, সারমেয় যেভাবে ইঁদুর লইয়া খেলা করে, তিনি বহুদর্শী বিজ্ঞ ধর্মপ্রচারকদের লইয়া সেইভাবে খেলাইয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যতই তাঁহাকে অপদস্থ অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার গৌরব-জ্যোতিঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পাদরীদের এই প্রকার শোচনীয় পরাজয়ে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ ভবিষ্যতে এই প্রকার সম্মেলনের অধিবেশন রহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিজয়-নিশান আটলান্টিকের অপর প্রান্ত হইতে সভ্যজগতের সর্বত্র সগৌরবে উড্ডীন হইয়া, তাঁহার উদার বিশ্বজনীন ধর্মমতের মহিমা বিঘোষিত করিয়াছিল, এবং প্রতি বৎসর তাহা দেশ হইতে দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। আজ তাঁহার শতবার্ষিকী জন্মোৎসবে সভ্য-জগতের সকল জাতির মনীষিবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় সমবেত কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছেন। আজ মহামানবের মহাতীর্থে যে হর্ষকল্লোল সমুত্থিত হইতেছে, তাহা অনাগত ভবিষ্যতে একদিন সর্বধর্মের মিলনবার্তা বিঘোষিত করিবে, সেইদিন যে সুদূর নহে—তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ এই শতবার্ষিকী উৎসব। আজ সকলে সমবেত কণ্ঠে গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহারই জয়ধ্বনি করি,—"জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়।"

পরমহংস তাঁহার বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া দৈনন্দিন ও লৌকিক জীবনের ঊর্ধ্বে উড়িয়া যাইতেন। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী পৃথিবীর সহিত মোটেই সম্পর্ক রাখেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহা করেন নাই—শ্রীরাম-কৃষ্ণ যে বিশ্বের ব্যথা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ বিশ্বপ্রেম। পৃথিবীময় দুঃখের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেন—'জীব-শিব!' তিনি প্রত্যক্ষ করেন, ভগবানকে যে ভালবাসে, তাহার দুঃখ, কষ্ট, ভ্রম, ত্রুটি এবং আতিশয্যের মধ্যেও ভগবানকে ত্যাগ করা চলিবে না।

পৃথিবীর ধর্মবাদগুলি আজ যে দুর্বল ও নষ্ট হইতেছে, তাহা এই উপদেশ বিস্মৃত হইবার জন্য। উহারা আজ মানুষকে ভুলিয়া গিয়াছে। আর মানুষও তাই ধর্ম ভুলিয়াছে। মানুষ আজ ভগবৎশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া আত্মশক্তি গড়িতে চাহিতেছে। আমাদের ধর্মপ্রাণ য়ুরোপীয় শিল্পী বিথোভেন ভগবানের উপর নির্ভরশীলদের আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন —"হে মানব, নির্ভর কর আপনাতে।..." লৌকিক বুদ্ধি আজ ভগবান আর মন্দিরকে এক করিয়াছে। মানুষ আজ আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ভগবৎ-বিদ্বেষী হইতেছে। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম শক্তিমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায় নিয়মই করিয়াছে যে, যদি কোনও বিজয়ী রাষ্ট্র এই ধর্ম সম্প্রদায়ের সুযোগে হস্তার্পণ না করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে, তবে সেই রাষ্ট্র অত্যাচারী হইলেও তাহাকেই সমর্থন করিবে। এইভাবে ইহারা পাশব শক্তি ও অন্যায়ের সমর্থন করিতেছে। ফলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই যে, নির্যাতিত জনসাধারণ—অন্যায় ও পাশব শক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত হইবার সময় এই ধর্মকেও অত্যাচারীর শয়তানসহোদর বলিয়া মনে করিতেছে। এই অগণিত নরনারী—ভগবানে বিশ্বাস না করুক, শত্রুরূপেই ভগবানকে জ্ঞান করুক—তবু, তবু যখন চাহে তাহারা ন্যায় ও সুবিচার, যখন চাহে তাহারা আলোক, তখনই মনে হয় ইহারা 'শিব'! তখনই ঠাকুরের কথা মনে হয়—'জীব-শিব'!...এই সত্য আজ অনুভব করিতে হইবে।

দুনিয়ার ওলট-পালট হইয়াছে। এই দুনিয়াতেই আজ আমাদের

বাস। জনসাধারণ আজ পদবিমর্দিত, বার্তাবিনিময়ের আধুনিক নব আয়োজন ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের ফলে যে বিশ্বব্যাপী নির্যাতনের কাহিনী প্রত্যহ প্রকাশ পাইতেছে, এই বিমর্দিত নরনারী আজও সম্পূর্ণভাবে তাহা চিত্তগত করিতে পারে নাই। আপনাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, সমাজে ন্যায় ও মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা জীবনমরণ চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে আর নিরপেক্ষ হইয়া থাকা চলিতেছে না। পাশ্চাত্ত্যে আমাদের পক্ষে ইহা আর সম্ভবপর নহে। আমরা ত তোমাদের মতন পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নহি। তবু যুগধর্ম আমাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে। মানবদুঃখের প্লাবন-তরঙ্গে আমরাও নিমজ্জিত হইতেছি। উহাদিগকে গিয়া সাহায্য করিতে হইবে। অনন্ত পুনর্জন্ম আছে কি না, জানি না, তবু ইহা তো সত্য যে, প্রত্যেকটি প্রাণ জীবন্ত? ইহা তো সত্য যে, ইহলোকে প্রত্যেকটিরই বিধিকর্তব্য রহিয়াছে? প্রত্যেকটি মানুষ যতটা সৎকার্য করিতে পারে, তাহা তো তাহাকে করিতেই হইবে, বর্তমানে তো তাহাকে যথাশক্তি সংগ্রাম করিতেই হইবে!

পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের রামকৃষ্ণভক্ত আমি। নির্যাতিতের আর্তনাদ ও সহায়-ভিক্ষা উপেক্ষা করিয়া, আপনার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য বিশ্বের কর্তব্য ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। উহাদের সাহায্য করাই আজ প্রথম কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামীজীর সেই ক্রোধোক্তি আমার মনে আছে। এক গুরুভাই যখন বর্তমান জগতের দুঃখ-কষ্টে বিজড়িত হইতে না চাহিয়া ভগবচ্চিন্তায় বিভোর রহিবার প্রস্তাব করেন, তখন স্বামীজী বলেন—"বেদান্তচর্চা আর ধ্যানধারণা পরজন্মের জন্য রেখে দে। এই দেহকে লাগিয়ে দে মানুষের সেবায়।"

আজ তাঁহার সেই চিরস্মরণীয় প্রার্থনা—"বার বার জন্ম লইব, সহস্র দুঃখ সইব, যদি আমি সেবা করতে পারি ঐ বাস্তব ভগবানকে, সর্ব আত্মার ঐ অখণ্ডরূপকে—যদি সেবা করতে পারি সর্ব জাতির ঐ পাপী নারায়ণ, ঐ দুঃখী নারায়ণ, ঐ দরিদ্র নারায়ণকে।"

ভগবৎ-প্রেমিকদের কি ভুলই আজ হইতেছে। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, মানুষের সঙ্গে মিশিলে প্রেমভক্তি কমিয়া যায়, মন কমিয়া যায়, মন নামিয়া যায়। কিন্তু এই কথা ত তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, লক্ষ কোটি অগণিতরূপে ভগবান নিত্যকাল গঙ্গা-প্রবাহের মতন চলিয়াছেন। এই ধারণা হইলে চিত্ত নমিত হয় না, প্রসারিত হয়—নব সঞ্জীবিত হয়।

প্রত্যেকটি জীবন্ত ভগবানের সেবা কর। আবার এ কথাও মনে রাখিও যে, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম সদা প্রকাশ ও সর্বত্র বিদ্যমান। ব্রহ্মে গিয়া এই সব লক্ষ কোটি রূপ এক হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টির আদিতে অবিচল শান্তিরূপে যে ভগবান ব্যাপ্ত ছিলেন, আজিকার বিশ্বঝঙ্কার বিপন্নদের সাহায্যার্থ হস্ত প্রসারিত করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বিবেকানন্দ তাই সর্বদা সন্ন্যাসীদের স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাঁহাদের সঙ্কল্প দুই—সত্যলাভ ও জীবসেবা। স্বামীজী বলিতেন, মানুষকে আপনার পায়ের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিতে হইবে।

সহায়শূন্য ঐ নিঃসঙ্গ নিঃস্বদের তবে সাহায্য কর। ঐ যাহারা ঋজু হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, উহাদের কর সাহায্য! তাহাদের চেষ্টায় দাও যোগ। এইভাবেই ত পরে বিশ্ব-গ্লানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাগ্রত শক্তির সমবায়ের সহিত আমরা সহযোগিতা করিতে সমর্থ হইব।

এই বুদ্ধি জাগে না, তাই ত বিশ্বের যত দুর্ভাগ্য। দাও বুদ্ধি জাগাইয়া—জ্ঞান দিয়া উহাদের অপকার-প্রবৃত্তি দূর করিয়া দাও! বুঝাইয়া দাও যে, প্রতিবেশীর অপকার করার অর্থ আপনারই অ-হিত করা। একজন ক্ষতি করিতে আসিলে য়ুরোপের অন্যতম মহাপুরুষ ভিক্টর হুগো বলেন—"ওরে মূর্খ, বুঝিতেছ না যে, তুমিই আমি?"

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত যাদুপ্রভাব এই যে তাঁহার মনে 'তুমি' 'আমি' ও সমগ্র পৃথিবীই যে মানবচিত্তে প্রতিবিম্বিত, তাহা নহে; তাঁহার মতে মানবচিত্তে বিশ্বের হয় অবতরণ। ভগবান পৃথিবীতেই প্রকাশিত, তাঁহার অনন্ত রূপ বহুরূপে বিশ্বে পরিব্যক্ত: জীব—শিব!